ব্রাহ্ম ও খ্রীষ্টান অনুরাগীদের চোখে শ্রীরামকৃষ্ণ

ব্রাহ্ম ও খ্রীষ্টান অনুরাগীদের চোখে শ্রীরামকৃষ্ণ

সম্পাদনা
নন্দ মুখোপাধ্যায়

॥ পরিবেশক ॥
নাথ ব্রাদার্স, ৯ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০০৭৩

আমার বাবা

৺ধীরেন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায়-এর

স্মৃতির উদ্দেশ্যে

সূচীপত্র

সম্পাদকের কথা

বর্তমান গ্রন্থটি বিশিষ্ট ব্রাহ্ম ও খ্রীষ্টানগণের শ্রীরামকৃষ্ণ সম্পর্কে লিখিত প্রবন্ধের সংকলন। সমস্ত ধর্মীয় ও ভৌগোলিক সীমানা অতিক্রম ক'রে তাঁর উপদেশ ও শিক্ষা আজ লক্ষ লক্ষ মানুষের হৃদয়ে কি ভাবে স্থান করে নিয়েছে তারই প্রমাণ পাওয়া যায় এই রচনাগুলিতে।

শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন ও শিক্ষার উপর এমন কয়েকটি গবেষণামূলক রচনা বর্তমান গ্রন্থে স্থান পেয়েছে যা বর্তমানে দুষ্প্রাপ্য বহু পত্র-পত্রিকায় পূর্বে প্রকাশিত হয়েছে। পাঠকবর্গের সুবিধার্থে এই প্রয়াস এবং তাঁরাই বিচার করবেন এর প্রয়োজনীয়তা।

এ কথা বলাই বাহুল্য যে এ ধরনের সংকলন সকলের সহযোগীতা ছাড়া প্রকাশ করা সম্ভব নয়। প্রবুদ্ধ ভারত, উদ্বোধন, তত্ত্বকৌমুদী ও সুলভ সমাচার পত্রিকার কর্তৃপক্ষের নিকট সম্পাদক বিশেষভাবে ঋণী। জেনারেল প্রিণ্টার্স এ্যাণ্ড পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, প্রদীপ পাবলিশার্স, অদ্বৈত আশ্রম ও ফার্মা কে. এল. এম প্রকাশক সংস্থাগুলির নিকটও সম্পাদক কৃতজ্ঞ।

এই গ্রন্থটির ইংরেজী সংস্করণের প্রকাশনায় সম্পাদক বিশেষ অনুপ্রেরণা লাভ করেন তাঁর কাকা ৺প্রভাস চন্দ্র মুখোপাধ্যায় এবং তাঁর দুই অগ্রজ শ্রীসৌরেন মুখোপাধ্যায় ও প্রয়াত সংগীত-শিল্পী ও সুরকার শৈলেন মুখোপাধ্যায়ের নিকট। সামান্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে সে ঋণ পরিশোধ করা সম্ভব নয়। গবেষণামূলক কাজে সম্পাদককে বিশেষভাবে উৎসাহিত করেন তার কাকা ৺সুধন্য মোহন গঙ্গোপাধ্যায়। এ ঋণ-ও অপরিশোধনীয়।

গ্রন্থটি প্রকাশের দায়িত্ব গ্রহণ করায় সম্পাদক শ্রীসুভাষ নাথকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছেন।

নানা উপদেশ ও পরামর্শ দিয়ে সম্পাদককে সাহায্য করেছেন রামকৃষ্ণ মিশনের রথীন মহারাজ, বরুণ মহারাজ, বিভুতী মহারাজ,

বিশ্বনাথ মহারাজ, অমিতাভ মহারাজ, শংকর মহারাজ, ধ্রুব মহারাজ, তরুণ মহারাজ, সুব্রত মহারাজ ও মন্মথ মহারাজ। তাঁদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ অকৃতজ্ঞতারই নামান্তর।

নানাভাবে সম্পাদককে যাঁরা উৎসাহিত ও সাহায্য করেছেন তাঁদের মধ্যে আছেন শ্রীমতী সিগ্‌লিন্ডে মুখোপাধ্যায় (ভিলবার্জ), শ্রীমতী অনিন্দিতা মুখোপাধ্যায়, শ্রীমতী রেণুকা গঙ্গোপাধ্যায়, শ্রীমতী গীতা আচার্য, শ্রীমতী রেণুকা গুপ্তা ও শ্রীমতী বীণা সেনগুপ্তা। আর যাঁরা সাহায্য করেছেন তাঁদের মধ্যে উল্লেখ্য ডঃ সুকুমার আচার্য, ডঃ সুব্রত গুপ্ত, সর্বশ্রী অমল সেনগুপ্ত, তপন চট্টোপাধ্যায়, দেবেন চট্টোপাধ্যায়, সুপ্রিয় বন্দোপাধ্যায়, ডি. এন. বক্সী, হিমাদ্রি সরকার ও অসীম রঞ্জন কর। সম্পাদক এঁদের সবাইকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছেন।

সম্পাদক সমস্ত তথ্যের উৎসের উল্লেখ করার চেষ্টা করেছেন। তা সত্বেও যদি অনবধানতবশতঃ কোন উৎসের উল্লেখ না করা হ'য়ে থাকে তার জন্য সম্পাদক ক্ষমা প্রার্থী এবং প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন পরবর্তী সংস্করণে সে ভুল সংশোধনের।

এ ধরনের গ্রন্থে লেখকের রচনার মূল্য অধিকতর মনে হওয়ায় লেখকদের পরিচিতি দিয়ে বই-এর আকার ও মূল্য বৃদ্ধির দায় থেকে সম্পাদক মুক্তি পেতে চেয়েছেন। আশা করা যায় যে পাঠকগণ এ-বিষয়ে একমত হবেন।

সম্পাদক বিশেষভাবে ঋণী প্রয়াত গৃহী-সাধক ও সুলেখক সুধীর সেনগুপ্ত-র নিকট কারণ তিনি স্বেচ্ছায় কয়েকটি ইংরেজী প্রবন্ধের বাংলা অনুবাদ করে সম্পাদককে বিশেষভাবে সাহায্য করেছেন।

বিশেষ সাবধানতা সত্বেও কয়েকটি ভুল-ত্রুটি রয়ে গেছে। সম্পাদক এর জন্য আন্তরিক দুঃখিত।

শ্রদ্ধার্ঘ্য

গীতায় শ্রীকৃষ্ণ বলেন—"যে যে সময়ে ধর্মের গ্লানি ও অধর্মের প্রাদুর্ভাব হয়, সেই সেই সময়ে আমি আপনাকে সৃজন করি। সাধুদিগের পরিত্রাণের জন্য দুষ্কৃতকারীদিগের বিনাশের জন্য এবং ধর্ম সংস্থাপনের জন্য আমি যুগে যুগে অবতীর্ণ হই।"

এই আশ্বাস ব্যক্তি মানুষের দিক থেকে যে কোন সৎ-প্রচেষ্টাকে দুর্বল করে দিতে পারে, এই সম্ভাবনার কথা স্মরণ করে তিনি আরও বলেন "মানুষ আপন চেষ্টায় নিজের উন্নতি সাধন করবে, সুতরাং আপন সত্বাকে দুর্বল করা চলবে না। এই সত্বাই একাধারে ব্যক্তির বন্ধু ও শত্রু।" মানুষের আত্মোন্নতির পথ নির্দেশ করে তিনি আরও বলেন—"আসক্তি, ভয় ও ক্রোধশূন্য, আমাতে একাগ্রচিত্ত এবং আমারই আশ্রিত বহু ব্যক্তি জ্ঞান ও তপস্যার দ্বারা পবিত্র হইয়া আমার স্বরূপ লাভ করিয়াছে।"

শ্রীরামকৃষ্ণ অবতার ছিলেন কি না এ বিতর্কের মধ্যে না গিয়েও বলা যায় যে তিনি আপন প্রচেষ্টায় পবিত্র হয়ে তাঁর "স্বরূপ লাভ" করেছিলেন এবং জগত ও দেশের কল্যাণে নিজেকে সম্পূর্ণভাবে নিয়োজিত করেছিলেন।

মানব-সমাজের হিত সাধনে শ্রীরামকৃষ্ণের অবদান সম্পর্কে সঠিক মূল্যায়ন করতে হ'লে যে সময়ে ও যে সমাজে তিনি জন্মগ্রহণ করেন সে ধারণা থাকা একান্ত প্রয়োজন।

অষ্টাদশ শতাব্দীতে মুঘল সাম্রাজ্যের ভাঙনের সঙ্গে সঙ্গে ইউরোপীয়-গণ ভারতীয় রাজনীতিতে প্রত্যক্ষ হস্তক্ষেপ শুরু করে এবং উনবিংশ শতাব্দীর শুরুতে বৃটিশ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি প্রকৃতপক্ষে তার ইউরোপীয় প্রতিদ্বন্দ্বীদের উৎখাত করে এবং ভারতীয় শাসকবর্গকে ছলে বলে কৌশলে বশীভূত ক'রে প্রায় সমগ্র ভারত উপমহাদেশের উপর প্রভুত্ব স্থাপন করে। তুলনামূলক ভাবে যে স্বাচ্ছন্দ্যের সঙ্গে বৃটিশ তার সর্বময় কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা

করে তা তৎকালীন ভারতের রাজনৈতিক ও সামাজিক অবক্ষয়ের পরিচয় দেয়। এই নতুন শক্তিশালী শাসকবর্গ হিন্দুদের কাছে মুসলমানদের থেকে অনেক বেশী বিদেশী এবং সঙ্গে নিয়ে আসে এক আগ্রাসী সংস্কৃতি এবং উন্নততর কারিগরী দক্ষতা।

শক্তিমান বিজেতার আপাত উন্নততর সভ্যতা ও সংস্কৃতির সামনে হতবাক হয়ে পড়ে ভারত। বৃটিশ শাসনের প্রতি প্রাথমিক প্রতিক্রিয়ায় হিন্দু সমাজ তার অতীত ঐতিহ্যের মোড়কে নিজেকে গুটিয়ে ফেলে এবং অতীতের সঙ্গে সম্পর্ক ছেদের ব্যাপারে তেমন কোন লক্ষণ দেখতে পাওয়া যায় না। কিন্তু ক্রমে ক্রমে খৃষ্টান মিশনারীদের কাজকর্মের মধ্যে দিয়ে পশ্চিমী প্রভাবের উপস্থিতি বিশেষভাবে অনুভূত হতে থাকে। সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ শহর এবং স্থানগুলিতে মিশন এবং মিশনারী বিদ্যালয় গড়ে ওঠে। ইতিমধ্যে কোম্পানী নিম্নপদ মর্যাদা সম্পন্ন ও করণিক পদের জন্য ইংরেজী শিক্ষায় শিক্ষণ প্রাপ্ত ভারতীয়দের নিযুক্ত করার প্রয়োজন বোধ করে এবং এইভাবে সরকারী চাকরীলাভে আগ্রহী ব্যক্তিরা ইংরেজী ভাষা শিক্ষা করতে বাধ্য হয়। মধ্যবিত্ত হিন্দু পিতারা শুরু করেন তাঁদের পুত্রদের ইউরোপীয় বিদ্যালয়ে পাঠাতে এবং এইভাবে প্রতীচ্যের ধ্যান ধারণা অবস্থাপন্ন ভারতীয়দের মনে প্রবেশ করতে এবং তাকে প্রভাবিত করতে শুরু করে।

পশ্চিমী শিক্ষায় শিক্ষিত যুবকেরা রুচি ও মানসিকতায় পশ্চিমী ভাবভঙ্গীর অনুসারী হ'য়ে ওঠে। তারা তাদের নিজস্ব রুচি পরিত্যাগ করে এবং তাদের অনেকেই লজ্জা বোধ করতে থাকে নিজেদের হিন্দু ঐতিহ্যের কথা ভেবে।

পশ্চিমী সংস্কৃতির প্রভাবে ভারতীয়রা যখন একদিকে পর্যুদস্ত তখন নৈরাজ্যবাদী চিন্তা পশ্চিমী শিক্ষার মাধ্যমে হিন্দু বিশ্বাসের মূলে কুঠারাঘাত করে। পার্থিব ভোগসুখে গা ভাসিয়ে দেন শত শত বুদ্ধিজীবী।

পার্থিব ভোগ-লালসায় ভেসে গেলেন না যাঁরা তাঁদের আরো এক ধ্বংসাত্মক প্রভাব এড়ানোর প্রয়োজন ছিল। ইংরেজী শিক্ষার প্রবর্তন

সমস্ত অ-খৃষ্টীয় মতবাদের উপর খৃষ্টান মিশনারীদের ঘৃণার বিষ ছড়িয়ে দেওয়ার পথ প্রশস্ত করেছিল। তাদের ক্ষমতা এবং প্রভাব তাদের দাবী এবং প্রচারের প্রতি যথেষ্ট সমর্থন যুগিয়েছিল। ধর্মান্তরিতকরণের মানসিকতা সম্পন্ন এইসব খৃষ্টধর্মের প্রবক্তাগণ স্পষ্টতই ধ্বংসোন্মুখ হিন্দু সমাজের প্রভূত ক্ষতি সাধন করেছিল।

উগ্র নিরীশ্বরবাদীরা যখন একদিকে জড়বাদের প্রশংসায় মুখর তখন অন্যদিকে গোঁড়া হিন্দুগণ জনগণের মধ্যে ধর্মের নামে অর্থহীন কুসংস্কারাচ্ছন্ন বিধি-নিষেধ কার্যকরী করতে ব্যস্ত হ'য়ে ওঠে। ধর্মীয় সমর্থনহীন এই সব বর্বর প্রথাগুলির সর্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট ও নির্দয় শীকার হলেন হিন্দু নারী সমাজ।

খৃষ্টান দেশগুলির শ্রেষ্ঠত্ব, খৃষ্টান ধর্মাবলম্বীদের জন্য উন্নত জীবনের প্রতিশ্রুতি এবং খৃষ্টধর্মীদের উপভোগ করা সামাজিক স্বাধীনতা, বিশৃঙ্খলা ও দ্বিধা-দ্বন্দ্বের জালে বন্দী বহু হিন্দুকে খৃষ্টধর্ম গ্রহণে উৎসাহিত করে ছিল। বিপর্যস্ত হিন্দু সমাজের সম্পূর্ণ ধ্বংস প্রায় অবশ্যম্ভাবী হয়ে ওঠে।

কিন্তু যা অনিবার্য ছিল তা শেষ-পর্যন্ত ঘটল না। আধ্যাত্মিক এবং পার্থিব নববিন্যাসের তরঙ্গ ধর্মীয় ও সামাজিক বিপর্যয়কে রোধ করতে সক্ষম হ'ল এবং শুরু হ'ল সুদূর প্রসারী পরিবর্তন।

সে সময় ছিল ফরাসী নব-জন্মের যুগ যখন যুক্তিবাদ ও ব্যক্তি স্বাতন্ত্রবাদ ইউরোপীয় চিন্তা জগতকে প্রভাবিত করে চলেছিল। এই মানসিকতা বিশ্বাসের উর্ধে যুক্তিকে এবং ব্যক্তি-চেতনাকে বাইরের কর্তৃত্বের উপর স্থান দিয়েছিল এবং জন্ম দিয়েছিল সামাজিক ন্যায় বিচার এবং রাজনৈতিক অধিকারের এক নতুন ধারণার। এই নতুন চিন্তাধারা প্রাচীন ধর্মীয় এবং সামাজিক ধারণাগুলির প্রতি সমালোচনামূলক দৃষ্টিভঙ্গী গ'ড়ে তুলতে উৎসাহিত ক'রে এক চমৎকার ফল লাভের সুযোগ সৃষ্টি করেছিল। ধর্ম এবং সমাজ সম্পর্কে যে সব স্থবির চিন্তা হিন্দুদের জীবন ধারা নিয়ন্ত্রণ করতো এবং ধর্মের প্রতি তাদের আচরণকে নির্ধারণ করতো, পাশ্চাত্য সংস্কৃতি ও চিন্তাধারার প্রভাবে সেগুলি এক কঠিন আঘাতের

সম্মুখীন হ'ল। এই সংস্কৃতির উদ্দেশ্য ছিল ধর্ম এবং সমাজ সম্পর্কে মধ্যযুগীয় চিন্তা সমূহের স্থানে যুক্তিবাদের মানসিকতাকে প্রতিষ্ঠা করা।

ভারতে মধ্যযুগীয় চিন্তাধারার পরিসমাপ্তি ঘটিয়ে বর্তমান যুগোপযোগী চিন্তাধারার প্রবর্তনে পথিকৃৎ ছিলেন রাজা রামমোহন রায়, যিনি এক অত্যন্ত গোঁড়া হিন্দু পরিবারে জন্মগ্রহণ করেও হিন্দু চিন্তাধারা, হিন্দু রীতি এবং আচার অনুষ্ঠানের কার্যকারিতা সম্পর্কে প্রশ্ন তোলেন। তাঁর যুক্তির ভিত্তি ছিল হিন্দুরা যে বেদকে তাদের ধর্মের মূল উৎস বলে মনে করে সেই বেদ অনুমোদন করে না হিন্দুদের অনুসৃত বহু আচার-আচরণ। হিন্দু শাস্ত্র এবং ধর্মীয় গ্রন্থগুলির প্রকৃত অর্থ এবং উদ্দেশ্য নিরূপণের প্রশ্নে রাজা রামমোহন ব্যক্তিগত বিচার বিবেচনাকে সর্বোচ্চ স্থান দেওয়ার দাবী জানিয়ে ছিলেন। তাঁর যুক্তিবাদী চিন্তা সাকার ঈশ্বরের ধারণাকে মেনে নিতে পারে নি। হিন্দুশাস্ত্র সমূহ থেকে তথ্য সংগ্রহ করে তিনি গ'ড়ে তুলেছিলেন নিরাকার ঈশ্বর উপাসনার ধারণাকে। এই মহিমান্বিত একেশ্বরবাদী ধর্মমত কেবল বিদেশী ধর্মমতের আক্রমণ প্রতিহত করতেই সমর্থ ছিল না, সক্ষম ছিল কার্যকরীভাবে তাদের সঙ্গে প্রতিযোগীতা চালাতে।

নতুন ধর্মমত প্রচারের জন্য ১৮২৮ সালে রামমোহন ব্রাহ্মসমাজ নামে এক অসাম্প্রদায়িক সংগঠন স্থাপন করেন। জাতি, বর্ণ, সমাজ নির্বিশেষে সকলের জন্য এর দ্বার উন্মুক্ত করে দিয়েছিলেন—সর্ত ছিল এই সমাজে যোগদানে ইচ্ছুক ব্যক্তিকে বহু ঈশ্বরের ধারণা ও মূর্তিপূজাকে ত্যাগ করতে হবে। সতীদাহ প্রভৃতি বর্বর সামাজিক প্রথাকে তিনি তীব্র নিন্দা করেন এবং সকল ঘৃণ্য আচারের বিরুদ্ধে শক্তিশালী জনমত গ'ড়ে তোলায় ব্রতী হন। কিন্তু তিনি প্রাচীন শাস্ত্র সমূহের প্রাধান্য অস্বীকার করেন নি এবং পবিত্র উপবীতও ত্যাগ করেন নি। তিনি প্রকৃত পক্ষে ব্যক্তিগত যুক্তির সঙ্গে প্রাচীন শাস্ত্র সমূহ এবং ব্যক্তিচেতনার সঙ্গে সামাজিক কর্তৃত্বের সমন্বয় সাধনের চেষ্টা করেছিলেন।

রামমোহনের যোগ্য উত্তর সাধক মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর বেদসমূহের অভ্রান্ততা অস্বীকার করেন এবং ঘোষণা করেন যে ধর্মের চূড়ান্ত উৎস কোন

অতি প্রাকৃত শাস্ত্রীয় রচনা নয়—মানব মনের মৌলিক উপলব্ধিতে এর উৎপত্তি। সমস্ত বাহ্যিক শাসনের বাঁধন ভেঙে ফেলা সত্ত্বেও দেবেন্দ্রনাথের অধীনে ব্রাহ্ম সমাজ হিন্দু শাস্ত্রসমূহের প্রতি যথাসম্ভব শ্রদ্ধা অক্ষুণ্ণ রেখেছিলেন।

দেবেন্দ্রনাথের সঙ্গে বেশ কয়েক বছর ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করার পর কেশবচন্দ্র তাঁর অল্প সংখ্যক অনুগামীসহ পুরনো ব্রাহ্মসমাজ ত্যাগ করেন এবং গঠন করেন এক নতুন ব্রাহ্মসমাজ। তাঁরা ধর্মীয় ও সামাজিক সংস্কারের ক্ষেত্রে যুক্তিকে একমাত্র নিয়ন্ত্রণী শক্তি বলে গ্রহণ করেন এবং সংকীর্ণ ঐতিহ্য, বিশ্বাস এবং অর্থহীন সামাজিক রীতিনীতির সঙ্গে সমঝোতা করতে অস্বীকার করেন কেশবচন্দ্র ব্রাহ্ম সমাজকে এক সামাজিক এবং ধর্মীয় শক্তি হিসাবে প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হন এবং এর প্রভাব বাংলার বাইরে বিস্তৃত করেন। ধর্ম বিশ্বাস এবং সামাজিক সংস্কার সম্পর্কে তাঁর ধারণার উপর পাশ্চাত্যের খ্রীষ্টধর্ম মতের সুস্পষ্ট প্রভাব পরিলক্ষিত হয় এবং এর ফলে এই সমাজ হিন্দু সমাজ থেকে বেশ দূরে সরে গেছিল।

ব্রাহ্মসমাজ আন্দোলন সৃষ্টি করেছিল সামাজিক সংস্কারের ঢেউ। সামাজিক সংস্কারের প্রয়োজনের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব আরোপ ক'রে এই আন্দোলন হিন্দু সমাজের পরিবর্তনের গতিকে ত্বরান্বিত করে। বাল্য বিবাহ, বাধ্যতামূলক বৈধব্যের বিরোধিতা করে এবং আধুনিক পন্থায় নারী শিক্ষাকে উৎসাহিত করে এই আন্দোলন সমস্ত রকম সামাজিক বন্ধন এবং অবিচার থেকে নারী জাতির মুক্তি ত্বরান্বিত করে তুলেছিল। ব্রাহ্ম সমাজ দেখিয়েছিল যে আপন ধর্মের যুক্তিসম্মত ভিত্তি খোঁজার জন্য শিক্ষিত ভারতীয়গণের খৃষ্টধর্ম গ্রহণ করার কোন প্রয়োজন নেই।

যদিও ব্রাহ্মসমাজ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল তবু এই আন্দোলন জনসমর্থন লাভ করতে পারে নি। ধর্ম এবং সামাজিক পরিবর্তন সম্পর্কে বৃহত্তর হিন্দু জনসমাজে এই আন্দোলন বিশেষ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করতে সক্ষম হয় নি। এর প্রধান কারণ ছিল ধর্ম বিষয়ে ব্রাহ্মদের অত্যাধিক জ্ঞানগর্ভ ও তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা। সর্বজনীন ধর্ম

সম্পর্কে কেশবচন্দ্রের প্রশংসনীয় প্রচেষ্টা জনমনে যথার্থ অনুরণন সৃষ্টি করতে ব্যর্থ হয়েছিল। ব্রাহ্মসমাজপন্থীদের সূত্রপাত করা সামাজিক সংস্কারগুলিকে অনেকেই অসময়োচিত, অবিবেচনা প্রসূত এবং মানসিকতার দৃষ্টিকোণ থেকে পাশ্চাত্য প্রভাবান্বিত বলে মনে করেছিলেন। এই কারণে ব্রাহ্মসমাজের প্রভাব ছিল সীমিত এবং ব্যাপকভাবে জনসাধারণকে তার অধীনে আনতে পারে নি।

কেশবচন্দ্রের গতিশীল নেতৃত্বে ব্রাহ্মসমাজ একদিকে যেমন গত শতাব্দীর সত্তরের দশকে বেদকে পরিত্যাগ করেছিল তেমন বেদকে ঊর্ধে তুলে ধরার উদ্দেশ্যে এবং পাশ্চাত্যের জড়বাদী ও ধর্মীয় মতবাদের প্রসারকে রোধ করার জন্য স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী ১৮৭৫ সালে পশ্চিম ভারতে আর্য সমাজ আন্দোলন শুরু করেন। তিনি সর্বশক্তি দিয়ে খ্রীষ্টধর্মের বিরোধীতা করেন এবং ইসলামের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ান। তিনি তাঁর আপন ধারণা অনুসারে বেদের অনুবাদ ও ব্যাখ্যা করেছিলেন এবং বেদ সম্পর্কে তাঁর ধারণার কেউ কোন রকম বিকৃতির চেষ্টা করেছেন বলে মনে হ'লে তিনি তাঁর নির্মম সমালোচনা করতেন।

ব্রাহ্মসমাজের ন্যায় এই ধর্মীয় আন্দোলন যে সব সমাজিক সংস্কারের কাজ শুরু করে তার ফল ছিল সুদূরপ্রসারী। জাতিভেদ প্রথার বিলোপ ঘটানো হয়; বেদের উপর ব্রাহ্মণগণের একাধিপত্য অস্বীকার করা হয় এবং বহু সামাজিক নিষেধাজ্ঞা থেকে মুক্ত করা হয় নারীজাতিকে। আন্দোলনের অনুগামীদের মধ্যে মূর্তি পূজা নিষিদ্ধ করা হয়। শিক্ষার প্রসারকে অন্যতম প্রধান লক্ষ্য হিসাবে গ্রহণ করা হয়। মূর্তিপূজার রীতি পরিত্যাগ করা এবং যুগোপযোগী বহু প্রগতিশীল সংস্কার প্রবর্তনের ফলে বেদ সম্পর্কে এর রক্ষণশীল দৃষ্টিভঙ্গী সত্ত্বেও আর্যসমাজ বহু বুদ্ধিজীবীকে তার শিবিরে আকর্ষণ করতে সমর্থ হয়েছিল। যাই হোক এই আন্দোলনের প্রভাব সাধারণভাবে সীমাবদ্ধ ছিল কেবল ভারতের উত্তরাংশে। এ কথা অস্বীকার করা যায় না যে পাশ্চাত্যের ধ্যান ধারণা ও সংস্কৃতির বিরুদ্ধে অত্যন্ত সাফল্যের এবং বীরত্বের সঙ্গে লড়াই চালিয়েছিল এই আন্দোলন।

খৃষ্টধর্মের এবং সমসাময়িক জড়বাদী চিন্তার প্রভাবের বিরুদ্ধে আরো যে এক ধর্মীয় আন্দোলন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল তা হ'ল থিওসফি আন্দোলন। অতীন্দ্রিয়বাদ, যুক্তিবাদী দর্শন এবং বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারার আকর্ষণীয় সংমিশ্রণ এই থিওসফিকাল সোসাইটি নিউইয়র্কে ১৮৭৫ সালে স্থাপিত হয়।

তিব্বতীয় বৌদ্ধধর্মের গুপ্ত ও রহস্যবিদ্যার উপাদান যথেচ্ছভাবে সংগ্রহ ক'রে এবং হিন্দুদের ও আধুনিক অধ্যাত্মবাদীদের রীতির অনুকরণে তাকে মার্জিত ক'রে এই আন্দোলনের প্রবক্তাগণ একদল শিক্ষিত ভারতবাসীর উপরও এক যাদুকরী প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হয়েছিলেন। থিওসফিস্টরা অবশ্য বেপরোয়াভাবে সমাজ ব্যবস্থার পরিবর্তন সাধনে উদ্যোগী হন নি। শিক্ষিত হিন্দু সম্প্রদায়ের হৃদয়ে আপন ধর্মে শ্রদ্ধা পুনরুজ্জীবিত করার কাজে এই আন্দোলনের অবদান যথেষ্ট ছিল। নাস্তিকতা ও খ্রীষ্টান ধর্মের আক্রমণ থেকে হিন্দুদের বিশেষ করে দাক্ষিণাত্যবাসীদের সে রক্ষা করেছিল।

গোঁড়া হিন্দুরা যখন ধর্ম ও সামাজিক বিশ্বাস সম্পর্কে তাঁদের প্রাচীন মনোভাবকে আঁকড়ে ধরে রাখার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছিলেন, বিভিন্ন সংস্কারবাদী আন্দোলনের প্রবক্তাগণ তখন বৈপ্লবিক সংস্কারের সাহায্যে হিন্দুধর্মকে আধুনিকরূপ দিতে চেয়ে ছিলেন। হিন্দুধর্মকে পুনরুজ্জীবিত করার প্রচেষ্টায় এই সকল সংস্কারকগণ তাঁদের দৃষ্টিতে অর্থহীন ও অনাবশ্যক আচার ও প্রথা থেকে হিন্দুধর্মকে মুক্ত করতে চেয়েছিলেন। এই প্রচেষ্টার ফলে তাঁরা হিন্দুধর্মের কিছু প্রয়োজনীয় উপাদানকেও বাতিল করে দিয়েছিলেন। বিশিষ্ট আরাধনা পদ্ধতি ও সামাজিক বিধান নিয়ে বিভিন্ন গোষ্ঠী ও মতের অস্তিত্বকে সংস্কারকগণ বিভেদ ও অবক্ষয়ের লক্ষণ বলে মনে করেছিলেন এবং হিন্দুধর্মকে ঐক্যবদ্ধ করার নিজস্ব প্রয়াস চালিয়ে ছিলেন। এইভাবে হিন্দু সমাজ যেন নিজেদের মধ্যেই বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিল। একদিকে দাঁড়িয়ে ছিলেন সেই সব গোঁড়া হিন্দুরা যাঁরা প্রত্যেকটি গ্রাম্য সংস্কারকেই শাস্ত্রের অন্তর্নিহিত উপাদান বলে মনে করতেন এবং সম্পূর্ণ অপরপ্রান্তে ছিলেন

সেই সব অত্যুৎসাহী সংস্কারক যাঁরা প্রস্তুত ছিলেন ধর্ম ও দর্শনের আমাদের এই প্রাচীনভূমির সমস্ত আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতা ও বিধানকে সমূলে ধ্বংস করতে। সংক্ষেপে, বিশৃঙ্খলা আর বিভ্রান্তির প্রান্ত সীমায় দাঁড়িয়ে ছিল হিন্দু সমাজ। সমাজের ভাঙন যেন অনিবার্য ও অবশ্যম্ভাবী হ'য়ে উঠলো।

এই সমাজিক ও ধর্মীয় পটভূমিকায় আবির্ভূত হলেন শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর অনন্য সাধারণ জীবন ও বাণী নিয়ে। তাঁর মহান আধ্যাত্মিক জীবন এবং সুগভীর ধর্মীয় চিন্তা সম্পর্কে তাঁর সহজ ও সরল ব্যাখ্যা সে যুগের প্রয়োজন মেটাতে অত্যন্ত সফল হয়েছিল এবং হিন্দুধর্মে এক নব-জোয়ার এনেছিল প্রায় একশো বছর আগে শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর নশ্বর দেহ ত্যাগ করেন কিন্তু তাঁর জীবন ও বাণী আজও আধুনিক ভারতকে সঠিক পথের নির্দেশ দিয়ে চলেছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ এমন কোন উপদেশ দেন নি যা তিনি নিজের জীবনে কার্যকরী করেন নি। তাঁর বাণীসমূহ কেবল বিদ্বান পণ্ডিতের বাক্য নয়—সেগুলি জীবন গ্রন্থ থেকে নেওয়া শিক্ষা।

তিনি, ম্যাক্স ম্যুলারের ভাষায়, "একজন মৌলিক চিন্তার মানুষ" ছিলেন কারণ অপরের চিন্তাভাবনার সাহায্যে নিজের জ্ঞান বৃদ্ধির জন্য তিনি কখনও বিশ্ববিদ্যালয়ে যান নি। তিনি তাঁর সময়কার সামাজিক ও ধর্মীয় অবস্থার বিচার করেছিলেন সম্পূর্ণ খোলা মন নিয়ে—গভীরভাবে চিন্তা করেছিলেন এবং হিন্দুমনকে আলোড়িত করা বিভিন্ন সমস্যার অপূর্ব সমাধান খুঁজে পেয়েছিলেন।

অপরকে ঈশ্বরে বিশ্বাসী হ'তে উপদেশ দেবার আগে শ্রীরামকৃষ্ণ নিজেই পরীক্ষা করে দেখতে চেয়েছিলেন ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্পর্কে। প্রার্থনা, ত্যাগ এবং একাগ্র সাধনার মাধ্যমে তিনি ঈশ্বরের মাতৃরূপ দর্শন করেছিলেন। ঈশ্বর দর্শন করেছেন কিনা স্বামী বিবেকানন্দের এই প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেছিলেন—"হ্যাঁ দেখেছি। তোকে যেমন দেখছি তার চেয়েও প্রত্যক্ষ দেখেছি। শুধু তাই নয়, তোকেও দেখাতে পারি যদি আমার কথামত চলিস।" তিনি সর্বশক্তি দিয়ে ঘোষণা

করেছিলেন যে পার্থিব সুখভোগ পরিত্যাগ করতে প্রস্তুত থাকলে যে কেউ ঈশ্বরের দর্শন পেতে পারে। পার্থিব ভোগ-সুখ এবং ঈশ্বর লাভের আনন্দ একত্রে সম্ভব নয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ ভারতে বিভিন্ন ধর্মীয় সম্প্রদায়কে যুদ্ধরত অবস্থায় দেখতে পান। তাই তিনি সমস্ত ধর্মের অপরিহার্য ঐক্যের সূত্রটির সন্ধানে এবং তার প্রতিষ্ঠায় অগ্রসর হন।

শৈব্য, বৈষ্ণব ও শাক্ত—হিন্দুধর্মের এই তিন বিবদমান সম্প্রদায়ের মধ্যে শ্রীরামকৃষ্ণ ঐক্য স্থাপন করেছিলেন পরীক্ষিত অভিজ্ঞতা ও তথ্যের সাহায্যে। রাণী-রাসমণি প্রতিষ্ঠিত দক্ষিণেশ্বরের মন্দিরে হিন্দুধর্মের ঐ তিন যুদ্ধরত গোষ্ঠীর দেবতাদের আরাধনা করেছিলেন তিনি। এই মহান সাধক ঘোষণা করেছিলেন শিব, বিষ্ণু এবং শক্তি একই পরমাত্মার বিভিন্ন প্রকাশ। ঈশ্বর তাঁর ভক্তদের ইচ্ছানুসারে নিজেকে বিভিন্নরূপে প্রকাশ করেন। এইভাবে স্থানীয় ভিত্তিতে তিনি বৈজ্ঞানিক ভাবে উপাসনার ঐক্যসূত্র প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।

বিষয়টিকে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে শ্রীরামকৃষ্ণ বলেন "ঈশ্বর এক কিন্তু তার নানা ভাব। যেমন বাড়ির কর্তা এক ব্যক্তি কারো তিনি বাবা, কারো ভাই, আবার কারুর স্বামী। ভাব ভিন্ন কিন্তু ব্যক্তি এক। তেমনি হলেন ঈশ্বর, যে যেরকমভাবে তাঁকে দেখতে চান সে সেইভাবে তাঁকে পাবে।"

শ্রীরামকৃষ্ণ দৃঢ়তার সঙ্গে ঘোষণা করেছিলেন যে বিশ্বের ধর্মসমূহ পরস্পরের বিরোধী কিংবা প্রতিদ্বন্দ্বী নয়। তারা এক চিরন্তন ধর্মের বিভিন্ন রূপ। এ প্রসঙ্গে তাঁর উক্তি বিশেষ লক্ষণীয়—"এক সচ্চিদানন্দকে ভিন্ন ভিন্ন দেশে কেউ আল্লা বলে, কেউ হরি বলে, কেউ ব্রহ্ম বলে। কেউ গড্ বলে।" তিনি আরও বলেন—"ঈশ্বর সাকার ও নিরাকার। আবার তিনি সাকার ও নিরাকার উভয়েরই ঊর্ধে। কেবল তিনিই বলতে পারেন তিনি আর কি?" তাঁর মতে উপাসনার এক বিশেষ স্তরে ভক্তগণ সাকার ঈশ্বরে তৃপ্তিলাভ করে। আর একস্তরে নিরাকার ঈশ্বরে। বিনা দ্বিধায় তিনি বহুবার ব্রাহ্মসমাজের প্রার্থনায় যোগ দেন এবং কেশবচন্দ্র ও

বিজয় কৃষ্ণ গোস্বামীর সঙ্গে আধ্যাত্মিক ঘনিষ্ঠতা গড়ে তোলেন। আধুনিক ব্রাহ্ম মতবাদ ও হিন্দুধর্মমতের প্রভেদ কি? এর উত্তরে তিনি বলেন—"পোঁ বাজান ও সুর বার করা। ব্রাহ্ম ধর্ম এক ব্রহ্মের পোঁ ধরিয়া আছে। হিন্দুধর্ম তাহার উপরে নানা রকম সুর তান লয় বাহির করিতেছে।" তিনি ইসলাম ও খৃষ্ট ধর্মমতে সাধনা করে মহম্মদ ও যীশুর মাধ্যমে ঈশ্বর দর্শন করেছিলেন। এইসব দিব্যদর্শন ও বিভিন্ন ধর্ম সম্পর্কে তাঁর উপলব্ধি লাভের পর তিনি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে সকল ধর্মই সত্য এবং তিনি মন্তব্য করেন—"যেমন কালীঘাটে মায়ের বাড়ী যাবার অনেক পথ আছে, সেইরকম ভগবানের ঘরেও নানা পথ দিয়ে যেতে পারা যায়। প্রত্যেক ধর্মই এক এক পথ দেখাইয়া দিতেছে।" আবার "যেমন এক সোনাতে নানা রকম গহনা তৈয়ারী হয়। গহনা ভিন্ন ভিন্ন প্রকার হ'লেও যেমন সকলেই এক সোনা, সেই রকম ঈশ্বর ভিন্ন ভিন্ন রকমে ভিন্ন ভিন্ন দেশে পূজিত হন এবং বিভিন্ন নামে ও ভাবে পূজিত হ'লেও সকলকার ভেতর সেই এক ঈশ্বর।" এইভাবেই তিনি সর্বধর্ম সমন্বয়ের মতবাদ প্রচার করেছিলেন এবং বিভিন্ন সম্প্রদায় ও বিভিন্ন দেশের মানুষের মধ্যে মিলন সেতু রচনায় ব্রতী হন।

শ্রীরামকৃষ্ণের মতে প্রত্যেক মানুষকে তাঁর আপন ধর্ম আচরণ করতে দেওয়া উচিত। ধর্মীয় স্বাধীনতার কথা দৃঢ় কণ্ঠে তিনি ঘোষণা করেন।

বৈদান্তিক ধর্মে দ্বৈতবাদী, বিশিষ্ট অদ্বৈতবাদী এবং অদ্বৈতবাদীদের বিবাদের মীমাংসাও শ্রীরামকৃষ্ণ করেন। তাঁর মতে ঈশ্বর সসীম ও অসীম, সাকার ও নিরাকার, সগুণ ও নির্গুণ। শ্রীরামকৃষ্ণ দেখিয়েছিলেন দ্বৈতবাদ, বিশিষ্ট অদ্বৈতবাদ ও অদ্বৈতবাদ পরস্পর বিরোধী নয় বরং ক্রমপর্যায়ে উন্নতির বিভিন্ন স্তর মাত্র।

শ্রীরামকৃষ্ণের মতে—"পৃথিবীর যে কোন বস্তুর তুলনায় ধর্মকে আরো বাস্তব সম্মত এবং সত্যরূপে দেওয়া কিংবা গ্রহণ করা যায়।" সুতরাং প্রথমে ধার্মিক হও; দেবার জন্য কিছু অর্জন কর, তারপর বিশ্বের মুখোমুখি দাঁড়াও এবং সেটি দান কর। গুরুর দৃষ্টিভঙ্গীর

ব্যাখ্যা করে স্বামী বিবেকানন্দ বলেন যে ধর্ম কেবল কতগুলি কথা, মতবাদ কিংবা তত্ত্ব নয়—এটা সাম্প্রদায়িকতা নয়। ধর্ম সম্প্রদায় আর সমাজ সমূহের মধ্যে বেঁচে থাকতে পারে না। এটি আত্মা ও ঈশ্বরের মধ্যে সম্পর্ক—এটিকে কি করে একটি সমাজে পরিণত করা যায়? এটি তাহ'লে বাণিজ্যে পরিণত হবে এবং যেখানে বাণিজ্য ও ধর্মে বাণিজ্যিক নীতির প্রয়োগ সেখানেই আধ্যাত্মিকতার মৃত্যু। মন্দির নির্মাণ, গীর্জা তৈরী কিংবা পূজা-পার্বণে উপস্থিত হওয়ার মধ্যে ধর্ম নেই। ধর্ম গ্রন্থে নেই। শব্দে নেই। ভাষণে নেই অথবা নেই সংগঠন সমূহে। ধর্ম আছে উপলব্ধির মধ্যে।

শ্রীরামকৃষ্ণ সকল ঈশ্বর সন্ধানী মানুষের মধ্যে নম্রতা প্রচার করেছেন কারণ প্রত্যেকটি ধর্মের মধ্যে তিনি লক্ষ্য করেছেন একটিই ভাব "আমি নই তুমি।"

শ্রীরামকৃষ্ণ কোন ধর্মের নিন্দা কিংবা সমালোচনা করেন নি। সহনশীলতার কথা প্রচার করে তিনি বলেন—"বিরোধ নয়। তুমি যেমন দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে থাক তোমার বিশ্বাসকে, অপরকেও তার বিশ্বাসে অটল থাকার স্বাধীনতা দাও।" আমাদের বিরোধ-বিক্ষুব্ধ জগতের জন্য তিনি রেখে গেছেন কি অপূর্ব সহনশীলতার বাণী!

অর্থের লোভও কামনা সম্পূর্ণ জয় করার জ্বলন্ত উদাহরণ হলেন শ্রীরামকৃষ্ণ। তিনি উপলব্ধি করেছিলেন যে সম্পদ ইন্দ্রিয়ের এবং খ্যাতির প্রতি আসক্তি একজন মানুষকে নিশ্চিতভাবে স্বার্থপর করে তোলে এবং তার নৈতিক অধঃপতন ঘটায়। তাই তিনি কামিনী-কাঞ্চনের মোহ ত্যাগ করার উপদেশ দেন।

শ্রীরামকৃষ্ণের মতে প্রতিটি নারীর মুখ মহামায়ার মুখচ্ছবি। তিনি বলতেন—"প্রত্যেক নারী মহামায়ারই রূপ; আমি কেমন করে কেবল যৌন-সংসর্গের মধ্যে নারীর কথা ভাবতে পারি?" গার্হস্থ্য জীবনের গুণাবলীর প্রকাশ এবং একটি আদর্শ প্রচারের জন্য তিনি বিয়ে করেন। এটা স্মরণ করা যেতে পারে যে সে সময় ভারতীয় নারীর অবস্থা ছিল অত্যন্ত অমর্যাদাকর। একজন পরিচারিকা এবং ভোগ-লালসার বস্তু

হিসাবে দেখা হত নারীকে। কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণ বহুভাবে শিক্ষিত করে তুলেছিলেন তাঁর স্ত্রীকে এবং খাঁটি হিন্দু ঐতিহ্য অনুসারে তিনি তাঁর প্রকৃত গুরুর ভূমিকা পালন করেছিলেন। তিনি তাঁকে মহামায়ার প্রতীকরূপে পূজো করেছিলেন। এইভাবে তিনি প্রমাণ করেছিলেন যে সন্তানের জন্মদান ছাড়া স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে প্রেম সম্ভব এবং যৌন ক্ষুধা নিবৃত্ত করা যায়। কামনা-লালসার বিরুদ্ধে প্রচার করলেও শ্রীরামকৃষ্ণ কখনও নারী বিদ্বেষী ছিলেন না। নারীজাতির প্রতি তিনি কতখানি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করতেন তা স্বামী বিবেকানন্দের কথা থেকে বোঝা যায়—"আমি নিজে এই মানুষটিকে সেই সব নারীদের সম্মুখে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছি সমাজ যাদের স্পর্শ করবে না এবং দেখেছি চোখের জলে ভিজে তাদের পায়ের নিচে লুটিয়ে বলতে, 'মা, একরূপে তুমি রয়েছো পথে, অপররূপে তুমিই জগৎ। আমি তোমাকে প্রণাম করি মা, আমি তোমাকে প্রণাম করি।'"

জাতিভেদ প্রথা সম্পর্কে উদ্বিগ্ন ছিলেন না তিনি। তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে ঈশ্বরের প্রতি ভক্তি এবং মানুষের প্রতি ভালবাসা আপনা থেকেই সমস্ত জাতিগত বিভেদ মুছে দেবে।

শ্রীরামকৃষ্ণ চাইতেন না অলৌকিক ক্ষমতা প্রদর্শন ক'রে নিজেকে অবতাররূপে প্রচার করা। অলৌকিক ক্ষমতা প্রদর্শনকারী ব্যক্তিদের নিন্দা করে তিনি বলতেন—"অলৌকিক কার্যকলাপ যারা দেখায় তাদের কাছে যেও না। তারা সত্যের পথ থেকে ভ্রষ্ট হয়েছে।"

শ্রীরামকৃষ্ণের মতে আধ্যাত্মিক উন্নতির সঙ্গে পার্থিব জীবনকে মানিয়ে নেওয়া সম্ভব যদি ঈশ্বরকে সর্বদা স্মরণে রাখা যায়। তিনি চেয়েছিলেন আমাদের চিন্তা সর্বদা ঈশ্বরমুখী হোক। তিনি এইভাবের ব্যাখ্যা করে বলেন—"অসতী স্ত্রীলোক বাপ মা ও সমস্ত পরিবারের ভিতর থেকে সংসারের কাজ কর্ম করে। কিন্তু তার মন থাকে সেই উপপতির প্রতি। হে সংসারী জীব! মন ঈশ্বরে রেখে তুমিও বাপ মা ও পরিবারের কাজ করিও।"

মানবজাতির প্রতি গভীর ভালবাসা ও সহানুভূতি ছিল শ্রীরামকৃষ্ণের।

জগতের দুঃখ-যন্ত্রণা তাঁকে সর্বদা পীড়ন করতো। তিনি সর্বাপেক্ষা দুর্বল মানুষটিকেও সর্বদা সাহায্য করতে প্রস্তুত ছিলেন। তিনি বলতেন—একজন মানুষকে সাহায্য করার জন্য তিনি এমন কুড়ি হাজার শরীর বিসর্জন দিতে প্রস্তুত। একজন মানুষকেও সাহায্য করা গৌরবের।

১৮৬৮ সালে কোন একসময়ে শ্রীরামকৃষ্ণ যখন রাণী রাসমণির জামাই মথুরবাবুর সঙ্গে তীর্থভ্রমণে যান তখন বৈদ্যনাথদেবের মন্দির দর্শন করার জন্য বিহারের এক সহর দেওঘরে তিনি কয়েক দিন কাটান। একদিন নিকটবর্তী এক গ্রামের ভিতর দিয়ে যাওয়ার সময় সেখানকার গ্রামবাসীদের দুর্দশা লক্ষ্য করে তিনি অত্যন্ত ব্যথিত হন। তাদের না ছিল খাদ্য, ছিল না দেহ আবৃত রাখার মত বস্ত্র। তিনি মথুরবাবুকে বলেন—"তুমি মহামায়ার ভাণ্ডারী। এইসব মানুষদের খাওয়াও এবং প্রত্যেককে একখানা করে বস্ত্র দাও।" যেহেতু অনেক অর্থের প্রয়োজন ছিল, মথুরবাবু তাই বাকী যাত্রার জন্য খরচের প্রশ্ন তোলেন। কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণকে বোঝান গেল না, মর্মভেদী হ'য়ে উঠলো তাঁর কান্না এবং তিক্ত বেদনায় তিনি বলে উঠলেন—"ধিক্ তোমাকে। আমি বারাণসী যাব না। আমি এই অসহায় মানুষদের সঙ্গে থাকবো"। শ্রীরামকৃষ্ণের মহৎ ইচ্ছার কাছে মথুরবাবুকে নতি স্বীকার করতে হ'ল।

জীবিত প্রাণীদের মধ্যে ঐশ্বরিক শক্তি উপলব্ধি করার জন্য, তাদের মধ্যে ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষ করা এবং তাদের ঈশ্বর জ্ঞানে সেবা করার জন্য এক নতুন কার্যকরী দর্শন প্রচার করেছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণ। "তুমি ঈশ্বরকে খুঁজছো?" তিনি বলেন, "তবে মানুষের মধ্যে তাঁকে সন্ধান করো। অন্য যে কোন বস্তুর তুলনায় তারই মধ্যে ঈশ্বরের সর্বাধিক প্রকাশ।" তিনি তাঁর আধ্যাত্মিক জগতে বাস করলেও মানবজাতির অপরিসীম দুঃখ-বেদনার প্রতি তিনি কখনও উদাসীন থাকেন নি। মানুষের দুঃখ-কষ্ট এড়াবার জন্য যেমন অনেকে নিজের মুক্তির জন্য সাধনা করে তিনি তেমন করেন নি। দীন-দুখীর প্রতি তাঁর গভীর ভালবাসা প্রকাশ পেয়ে ছিল তাঁর সুন্দর দু'টি কথার ভিতর দিয়ে—

"জীবই শিব"। শিবজ্ঞানে জীব সেবার আদর্শ তিনি প্রচার করেছিলেন। নরেন (স্বামী বিবেকানন্দ) যখন শ্রীরামকৃষ্ণের নিকট "শুকদেবের মত সর্বদা নির্বিকল্প সমাধিযোগে সচ্চিদানন্দ সাগরে ডুবিয়া থাকিবার" ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁকে ভৎর্সনা করে বলেছিলেন—"বার বার একথা বলতে তোর লজ্জা করে না? কোথায় কালে বটগাছের মত বর্ধিত হয়ে শত শত লোককে শান্তি ছায়া দিবি তানা তুই নিজের মুক্তির জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠেছিস, এত ক্ষুদ্র আদর্শ তোর।"

পরবর্তীকালে স্বামী বিবেকানন্দ মানব-কল্যাণে নিজেকে সম্পূর্ণ উৎসর্গ করেছিলেন তাঁর গুরুর নির্দেশে। শ্রীরামকৃষ্ণ তার প্রিয়তম শিষ্যকে বলেন—"আমি তোকে আমার সর্বস্ব দিয়েছি এই শক্তির সাহায্যে তুই পৃথিবীর অনেক কল্যাণ করবি এবং তারপরই কেবল ফিরে যাবি।"

স্বামী বিবেকানন্দ ঠিকই বলেছিলেন—"আগে লোকেরা আমায় বুঝুক, তারপর তারা রামকৃষ্ণকে বুঝবে।" মানুষের দুঃখ-দুর্দশার প্রতি উদাসীন হয়ে, পার্থিব ভোগ-সুখে ডুবে থেকে আমাদের শ্রীরামকৃষ্ণকে বোঝার চেষ্টা এবং কেবল মূর্তি পুজা ও ধর্মীয় বক্তৃতা এবং শাস্ত্র পাঠের মাধ্যমে ঈশ্বর উপলব্ধির প্রয়াসকে স্বামী বিবেকানন্দ বিদ্রূপ করেছিলেন।

মানব সেবাই শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন ও বাণীর মূল সত্য এবং তাঁর উপদেশই ছিল মানবসেবার মাধ্যমে ঈশ্বরের উপাসনা। কারণ—"ঈশ্বর নিঃসন্দেহে সকলের মধ্যেই বাস করেন। কিন্তু অন্য কোন প্রাণীর তুলনায় মানুষের মধ্যে দিয়ে তিনি আপনাকে প্রকাশ করেন বেশী।"

দক্ষিণেশ্বরের শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস

পাঠকগণ, উপরিউক্ত মহাপুরুষের নাম অনেকবার শুনিয়াছেন। ইনি কলিকাতা হইতে প্রায় তিন ক্রোশ উত্তরে দক্ষিণেশ্বর গ্রামে রাণী রাসমণির কালীবাড়ীতে অবস্থিত করেন। আমরা এই মহাত্মাকে যতবার দেখিতেছি, ততবার তাঁহার উচ্চ জীবন ও ভাব দেখিয়া অবাক হইতেছি। আমরা দেখিতেছি, তিনি একজন সিদ্ধপুরুষ, তাঁহার মতন লোক আর এদেশে আছেন কিনা সন্দেহ। যোগবলে তাঁহার মন সর্বদাই ভগবানেতেই সংযুক্ত থাকে, আমরা যেমন ঘর, বাড়ী, ধন, মানের কথা কহি ও সর্বদাই সেই সমস্ত চিন্তা করি, তিনি পরমেশ্বরকে লইয়া সেইরূপে করেন। তিনি ছেলের মতন সরল এবং ঈশ্বর প্রেমে মত্ত হইয়া পাগলের মতন হন। তিনি কখন হরি বলিয়া ভক্তিতে মত্ত হইয়া শ্রীচৈতন্যের প্রায় নৃত্য করেন, কখন মা কালী বলিয়া অত্যন্ত প্রেমে ভগবানকে ডাকিয়া শাক্ত ধর্মের আদর্শ কি তাহা দেখান। আবার কখন কখন পুরাতন যোগীদের মতন নিরাকার ব্রহ্মেতে নিমগ্ন হইয়া যান। যখন যে ভাব তাঁহার মনে প্রবল হয়, তখন তিনি মুগ্ধ হইয়া বাহ্যজ্ঞান আর রাখিতে পারেন না। একখানি তক্তার মতন তাঁহার সমস্ত শরীর শক্ত হইয়া তাঁহার বাহ্যজ্ঞান চলিয়া যায় কিন্তু তাঁহার আত্মা ভাব-সমুদ্রে লীন হইয়া যায়। তিনি নিরাকারবাদী ও সাকারবাদী দুই-ই। কিন্তু তিনি সর্বদা বলিয়া থাকেন, মাটির হস্তপদ বিশিষ্ট কালী অথবা কৃষ্ণেতে তিনি মত্ত হন না। তাঁহার কালী কৃষ্ণ নিরাকার, চিন্ময়, কেবল আত্মাতেই উদয় হন। তিনি আরও বলেন, নিরাকার ঈশ্বর সমুদ্রবৎ, কিন্তু সেই চিন্ময় সমুদ্রের এক একটি চিন্ময় রূপলহরী হয়, সেই লহরী সাকার ঈশ্বর। সম্প্রতি তিনি কলিকাতার একজন সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোকের বাটিতে আসিয়া ভক্তিতে মত্ত হইয়া উপস্থিত প্রায় সকলকেই হরিনামে নৃত্য করাইয়া দিলেন। সেদিন আমাদিগের সহিত একখানি স্টীমারে বেড়াইতে

গিয়া তাঁহার সাধন অবস্থায় জীবনের কয়েকটি পরীক্ষার কথা বলিয়া সকলকে অবাক করিয়া দিলেন। তিনি বলিলেন যে, আগে আগে রাত্রিতে তিনি আপনাকে কাল বিড়ালের বাচ্চা মনে করিয়া ভাবিতেন যে তিনি মার কোল ঘেঁষিয়া শুইয়া আছেন এবং মার কাছে মিউ মিউ করিয়া ডাকিতেন, তাঁহার মা-ও প্রসন্ন হইয়া তাঁহার গা চাটিতেন ও স্নেহভাবে তাঁহার সহিত কথা কহিতেন, সে সময়ে তিনি অত্যন্ত সুখে রাত্রি কাটাইতেন। কখন কখন আপনাকে স্ত্রীলোক মনে করিতেন এবং স্ত্রী-ভাবে অত্যন্ত প্রেমে সেই পতির সহিত কথাবার্তা কহিয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইতেন। কখন কখন দেখিতেন, ব্রহ্মরূপ সমুদ্র আসিয়া তাঁহাকে ডুবাইল, তিনি মনে করিতেন যেন তিনি সচ্চিদানন্দ রূপ জলে ডুবিয়া রহিয়াছেন, যখন এই ভাবে থাকিতেন, তখন তাঁহার আহারাদি বাহ্য ক্রিয়া দূরে যাইত, একটু এই ভাব কমিলে তিনি আপন পরিবারকে বলিতেন, এই বেলা আমাকে আহার দেও সে ভাব এখন আমার কমিয়াছে। কিন্তু বলিতে বলিতে বানের জলে পড়িলে নিরাশ্রয় মানুষের যেরূপ হয়, তাঁহারও অবস্থা সেইরূপ হইত। অমনি ব্রহ্মরূপ সমুদ্রে যেন বান ডাকিত এবং তাঁহার নিরাশ্রয় আত্মাকে ভাসাইয়া লইয়া যাইত। তিনি আবার বাহ্যজ্ঞানশূন্য হইয়া পড়িয়া থাকিতেন। এইরূপে ভগবান তাঁহাকে লইয়া নানাভাবে ক্রীড়া করিতেন। তিনি সেদিন একবার স্টীমারে বসিয়াছিলেন, একজন একটি দূরবীণ আনিয়া তাহার ভিতর দিয়া তাঁহাকে দেখিতে বলিলেন, তিনি বিরক্তি প্রকাশ করিয়া বলিয়া উঠিলেন, এখন আমার মন ব্রহ্মের ভিতর ডুবিয়া আনন্দ অনুভব করিতেছে, তোমার ও এমনই কি জিনিস যে, তাহার ভিতর হইতে মন উঠাইয়া লইয়া উহার ভিতর দিব। পরমহংস মহাশয়ের নিকট আমরা এত উচ্চ উচ্চ এবং নূতন নূতন কথা শুনিতে ও ভাব দেখিতে পাই যে তাহার সকল লিখিতে গেলে তাহাতেই 'সুলভ' পরিপূর্ণ হয়।....

*১৮৬৪ সালে শ্রীরামকৃষ্ণ আদি ব্রাহ্মসমাজে প্রথম কেশবচন্দ্র সেনকে দেখেন। সেই দর্শন সম্পর্কে শ্রীরামকৃষ্ণ বলেন—"আমি বহুকাল পূর্বে একদিন আদি সমাজ দেখিতে গিয়েছিলাম। তথায় গিয়া দেখিলাম, চক্ষু বুজিয়া স্থিরভাবে

সকলে বসিয়া আছে। কিন্তু বোধ হইল, ভিতরে যেন সব লাঠি ধরিয়া রহিয়াছে। কেশবকে দেখিয়া মনে হইল, এই ব্যক্তির ফাতনা ডুবিয়াছে।”

শ্রীরামকৃষ্ণ ও কেশবচন্দ্র সেন উভয়ে প্রথম মিলিত হন ১৫ই মার্চ, ১৮৭৫ সালে বেলঘোরিয়ার বাগানবাড়ী তপোবনে। এই সাক্ষাৎকার সম্পর্কে ২৮শে মার্চ ১৮৭৫ সালে ইণ্ডিয়ান মিরার পত্রিকায় কেশবচন্দ্র লেখেন—“খুব বেশী দিন হয় নি একজন নিষ্ঠাবান হিন্দু ভক্তের সঙ্গে আমাদের সাক্ষাৎ হয় এবং তাঁর নৈতিক দৃষ্টিভঙ্গীর গভীরতা, সূক্ষ্মতা ও সরলতা লক্ষ্য ক'রে আমরা মুগ্ধ হই।...”

এই সাক্ষাৎকার সম্পর্কে প্রতাপচন্দ্র মজুমদার যে বর্ণনা দেন তার থেকে আমরা জানতে পারি যে একদিন সকালে শ্রীরামকৃষ্ণদেব স্বয়ং (তাঁর ভাগনে হৃদয়কে সঙ্গে নিয়ে) এক ছেকড়া গাড়ী (ঘোড়ার গাড়ী) করে আলুথালু বেশে কেশবচন্দ্র সেনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে আসেন। তাঁর নম্র ও সরল হাবভাব দেখে উপস্থিত ব্যক্তিরা প্রথমে তাঁকে বিশেষ আমল দেন নি। একটু পরেই তিনি অর্ধ চৈতন্য অবস্থায় আলোচনা শুরু করেন এবং মাঝে মাঝেই বাহ্য জ্ঞান হারান। কিন্তু তিনি যে সব কথা বলেন তা এতই গভীর এবং সুন্দর যে কিছুক্ষণের মধ্যেই তাঁরা বুঝতে পারেন যে তিনি একজন সাধারণ মানুষ নন। প্রতাপচন্দ্রের মতে এই ভক্তের সঙ্গে পরিচয়, যা কিছুদিনের মধ্যে অন্তরঙ্গ বন্ধুত্বে পরিণত হয়, কেশবের উদার চরিত্রে এক গভীর প্রভাব বিস্তার করে। ঈশ্বরের মাতৃরূপ সম্পর্কে শ্রীরামকৃষ্ণের আবেগপূর্ণ অনুভূতি কেশবচন্দ্র ও তাঁর অনুগামীদের যে বিশেষভাবে আকৃষ্ট করে সে কথা প্রতাপচন্দ্র অকপটে স্বীকার করেন।

কেশবচন্দ্র সেনই প্রথম শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ভক্তি ও আধ্যাত্মিকতা সম্পর্কে প্রচার করেন এবং এ সম্পর্কে স্বামী অভেদানন্দ তাঁর ‘আমার জীবনকথা’ গ্রন্থে লেখেন—“কেশবচন্দ্র সেন মহাশয়ও কলিকাতার টাউন হলে একটি বক্তৃতার সময়ে পরমহংসদেবের অপূর্ব আধ্যাত্মিকতার বিষয়ে সর্বসাধারণের সমক্ষে প্রচার করিয়াছিলেন। তিনি তাঁহার কতকগুলি উপদেশ পুস্তিকাকারে ছাপাইয়া বিতরণ করিয়াছিলেন। বলিতে গেলে কলিকাতা নগরীতে কেশববাবুর বক্তৃতা-মারফৎ পরমহংসদেবের বিষয় প্রথম প্রচার হইয়াছিল।”

হিন্দু সাধক

আমার মন এখনও সেই জ্যোতির্মণ্ডলে ভাসিতেছে যে জ্যোতি ঐ অদ্ভুত মানুষটি যখনই যেখানে যান সেইখানেই বিকীরণ করেন। যে অলৌকিক ও অবর্ণনীয় করুণা তিনি বিতরণ করেন সেই প্রভাব হইতে আমার মন এখনও মুক্ত হইতে পারে নাই। তাঁহার সহিত আমার কিসের মিল? আমি ইউরোপীয় মনভাবাপন্ন। সভ্য, আত্ম-সর্বস্ব, অর্ধ-বিশ্বাসী, তথা-কথিত শিক্ষিত, বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন এবং তিনি দরিদ্র, অশিক্ষিত, শীর্ণকায়, চাকচিক্যহীন, রোগগ্রস্ত, অর্ধ-নগ্ন, বান্ধবহীন হিন্দুভক্ত! আমি ডিজরেইলী এবং ফসেট, ষ্ট্যানলী এবং মাক্স ম্যুলার এবং আরও অনেক ইউরোপীয় পণ্ডিত ও মনীষীদের ভাষণ শুনিয়াছি। আমি খ্রীষ্টের একান্ত শিষ্য ও অনুগামী। উদার-চিত্ত খ্রীষ্টান পাদরী ও প্রচারকদিগের বন্ধু ও গুণগ্রাহী—আমি যুক্তিবাদী ব্রাহ্ম সমাজের একনিষ্ঠ সমর্থক ও কর্মী। কেন আমি তাঁহার কথা শুনিয়া মন্ত্রমুগ্ধ হই? কেন সেই আমি ঘণ্টার পর ঘণ্টা তাঁহার কাছে বসিয়া থাকি? কেবলমাত্র আমি নহে—আরও অনেকে এইরকম বসিয়া থাকেন। বহুলোক তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া থাকেন এবং তাঁহাকে পরীক্ষা করেন—বহুলোক তাঁহার দর্শন লাভ করিতে এবং তাঁহার সহিত কথা বলিতে আসেন। আমাদের কোন কোন ধূর্ত পণ্ডিত-মূর্খ তাঁহার মধ্যে কিছুই লক্ষ্য করেন নাই—কোন কোন নীচ খ্রীষ্টান পাদরী তাঁহাকে কপট অথবা আত্ম-প্রবঞ্চনাকারী ধর্মোন্মত্ত ব্যক্তি বলিয়া থাকেন। আমি তাঁহাদের সমালোচনা ভাল করিয়া পরীক্ষা করিয়াছি এবং এখন আমি যাহা লিখিতেছি তাহা স্বতঃস্ফূর্ত।

এই হিন্দু সাধুর বয়স চল্লিশের বেশ কিছু কম হইবে। তিনি জাতিতে ব্রাহ্মণ—তাঁহার শরীর স্বাভাবিকভাবে সুগঠিত কিন্তু যে ভয়ংকর তপশ্চর্যার মাধ্যমে তিনি নিজের চরিত্র গঠন করিয়াছেন তাহাতে তাঁহার দেহের চিরস্থায়ী ক্ষতি হইয়াছে—তাঁহার গঠনকে এমনই দুর্বল, ফ্যাকাশে

ও শীর্ণকায় করিয়াছে যাহা গভীরতম করুণার উদ্রেক করে। এই জীর্ণ-শীর্ণ শরীর সত্ত্বেও তাঁহার মুখ-মণ্ডল শিশুর ন্যায় কোমল-অহমিকাশূন্য ও গভীর বিনয়মণ্ডিত এবং অনির্বচনীয় মিষ্ট হাসিতে সমুজ্জ্বল যাহা আমি আর কাহারও মুখে দেখিয়াছি বলিয়া মনে পড়ে না। হিন্দু সাধক বাহ্যিক খুঁটিনাটির দিকে প্রখর নজর রাখেন। তিনি গেরুয়াবসন পরিধান করেন, ভোজনে কঠোর নিয়ম মানিয়া চলেন এবং জাতিভেদ প্রথা বিশেষভাবে মানিয়া থাকেন। তিনি সদা গর্বিত ও গূঢ় জ্ঞান প্রচার করিয়া থাকেন। তিনি সর্বদাই গুরুজী এবং মনোমুগ্ধকর বস্তু বিতরণ করেন। এই মানুষটি এই সকল ব্যাপারে সম্পূর্ণ উদাসীন। তাঁহার বেশ-ভূষা ও ভোজন সাধারণ মানুষের ন্যায়—এই দুই ব্যাপারেই তিনি অমনোযোগী এবং জাতিভেদ প্রথা তিনি নিত্যই লংঘন করেন। তিনি গুরু ও শিক্ষক আখ্যা দৃঢ়তার সঙ্গে প্রত্যাখ্যান করেন। কেহ তাঁহাকে অসাধারণ সম্মান জ্ঞাপন করিলে তিনি অত্যন্ত অসন্তোষ ও অসহিষ্ণুতা প্রকাশ করেন এবং দৃঢ়তার সঙ্গে স্বীকার করেন তাঁহার অলৌকিক ও জাদুশক্তি নাই। তাঁহার বিরাটত্বের কথা কেহ বলিলে তিনি তীব্র প্রতিবাদ করেন। তিনি জাগতিক মনোভাবাপন্ন এবং ইন্দ্রিয় সচেতন মানুষদিগকে এড়াইয়া চলেন। বাহ্যতঃ তাঁহার অসাধারণত্ব কিছুই নাই। ধর্মপ্রচারই লোক সমাজে তাঁহার সমাদারলাভ করার একমাত্র গুণ। এবং তাঁহার ধর্ম কি? ইহা হিন্দুধর্ম হইলেও অদ্ভুত ধরনের। রামকৃষ্ণ পরমহংস বলিয়া পরিচিত এই সাধু কোনও বিশেষ হিন্দু দেবতার উপাসক নহেন। তিনি শৈব নহেন, শাক্ত নহেন, তিনি বৈষ্ণব নহেন, বৈদান্তিক নহেন। তথাপি তিনি সবই। তিনি শিবপূজা করেন, কালীপূজা করেন—তিনি রামের উপাসক, তিনি কৃষ্ণের পূজা করেন এবং বৈদান্তিক মতের বিশেষ সমর্থক। তিনি পৌত্তলিক এবং তথাপি তিনি বিশ্বস্ত ও অনুরক্ত এক নিরাকার ও অসীম ঈশ্বরের যাঁহার তিনি নামকরণ করিয়াছেন অখণ্ড সচ্চিদানন্দ। অন্যান্য হিন্দু সাধুদের নিকট যেমন ধর্মের অর্থ একটি বিশেষ মত ও বিশ্বাসে পরিপূর্ণতা লাভ করা অথবা বিতর্কিত পারদর্শিতা অথবা পুষ্প-চন্দন, ধূপ ও নৈবিদ্যের বাহ্যিক আয়োজন মারফৎ উপাসনা করা তাঁহার ধর্ম ঐরূপ

নহে। তাঁহার ধর্ম হইল ভাব-সমাধি—অতীন্দ্রিয় সত্য উপলব্ধি তাঁহার উপাসনা। তাঁহার সকল সত্তায় এক বিচিত্র অনুভূতির আলো ও উত্তেজনা অহোরাত্র জ্বলিতেছে। এই অন্তরাগ্নি তাঁহার কথোপকথনে ঘণ্টার পর ঘণ্টা অবিরামভাবে প্রকাশ পাইতেছে। তাঁহার সহিত সংলাপরত ব্যক্তিরা ক্লান্ত বোধ করিলেও, বাহ্যিক দুর্বলতা সত্ত্বেও তিনি চিরসজীব। নিজের কোন আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতার কথা বলিতে বলিতে অথবা ইহার কোন আকর্ষণীয় প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করিলে তিনি আনন্দোচ্ছ্বাসে প্রায়ই সমাধিস্থ হন—বাহ্যজ্ঞান রহিত হন। কিন্তু কিরূপে সকল হিন্দু দেবতাকে গভীরভাবে শ্রদ্ধা করা তাঁহার পক্ষে সম্ভব? তাঁহার এই অসাধারণ উদার স্বভাবের রহস্য কোথায়? তাঁহার মতে এক একটি দেবতা এক-একটি শক্তি—সেই অখণ্ড সচ্চিদানন্দ ও নিরাকার সত্তার সমন্বিত বহিঃ প্রকাশ।

শিবের উদাহরণ দেখুন। এই সাধু শিবকে ধ্যান ও যোগের প্রতীকরূপে দেখিয়া থাকেন ও উপলব্ধি করেন। পার্থিব সুখ-দুঃখ, উদ্বেগ, জ্বালা, যন্ত্রণা, দারিদ্র্য, পরিশ্রম ও নিঃসঙ্গতার প্রতি উদাসীন, শান্ত, নিশ্চল ও নির্মল, নির্বেদ হিমালয়ের মত—যেখানে তাঁহার বসতি—গভীর ধ্যান ও স্বর্গীয় আবেশে সদানন্দ সেই পরম ব্রহ্ম মহাদেব সকল ধ্যানপরায়ণ ও সম্পূর্ণভাবে আত্ম অভিনিবিষ্ট মানুষের আদর্শ। অমঙ্গল ও বিষয়াসক্তির প্রতীক বিষময় সর্প তাঁহার সেই আনন্দময় দেহকে জড়াইয়া রহিয়াছে কিন্তু তাঁহার ক্ষতি করিতে অক্ষম; নানা ভয় ও বিপদের রূপ লইয়া মৃত্যু তাঁহাকে আবেষ্টন করিয়া রহিয়াছে কিন্তু তাঁহাকে দমন করিতে পারে না। অন্যান্য মানুষের বোঝা ও উদ্বেগের দায়িত্ব শিব নিজে গ্রহণ করিয়াছেন—অন্যান্য সকলকে মৃত্যুঞ্জয়ী করিবার নিমিত্ত নিজে গরল পান করিয়াছেন। শিব সকল সম্পদ ও সুখ অপরের মঙ্গলের জন্য ত্যাগ করিয়াছেন ও তাঁহার সাধনা ও নিঃসঙ্গ জীবনের সঙ্গী করিয়াছেন অনুগতা স্ত্রীকে। কেবল ভস্ম ও ব্যাঘ্র চর্ম অঙ্গের ভূষণ হিসাবে গ্রহণ করিয়াছেন। শিব যোগীশ্বর। এবং সেই সদাশয় মানুষটি শিবের গুণাবলীর বর্ণনাকালে নিজে তাঁহার আদর্শে বিলীন হন এবং ভাব-ময়তার ফলে অনেক সময় ধরিয়া বাহ্যজ্ঞান শূন্য থাকেন।

অতঃপর তিনি হয়তো কৃষ্ণ প্রসঙ্গ উত্থাপন করিবেন—কৃষ্ণকে তিনি প্রেমের প্রতীক হিসাবে দেখিয়া থাকেন। তিনি বলেন—কৃষ্ণের সেই সর্বজনপ্রিয় মুখ দর্শন কর। ইহা পুরুষ না নারীর অনুরূপ? ইন্দ্রিয়-পরায়ণতা অথবা পুরুষসুলভ ও কঠোরতার সামান্যতম ইঙ্গিত আছে কি? কৃষ্ণের মুখ স্নেহশীলা রমণীর ন্যায়—কিশোরের কমনীয়তা ও কিশোরীর লাবণ্যেভরা। বিভিন্ন ধারায় প্রবাহিত ও নানারূপে বিকশিত তাঁহার করুণার দ্বারা তিনি বহু নর-নারীকে ভক্তি ধর্মে আকৃষ্ট করেন। সকল মানুষের পবিত্র সম্পর্কের মাধ্যমে ঐ স্বর্গীয় প্রেম যে বিকশিত হইতে পারে ইহা প্রমাণ করাই কৃষ্ণের উদ্দেশ্য। লাবণ্যেভরা শিশু হিসাবে বয়স্ক পিতা-মাতার স্নেহকে একায়ত্ত করেন। প্রিয়সঙ্গী ও সখারূপে বন্ধু ও সমবয়সীদিগের আনুগত্য ও ভালবাসা জয় করেন। কৃষ্ণ প্রশংসিত ও পূজনীয় প্রভু—যাঁহার মধুর ও কোমল শিক্ষা এবং স্নেহশীল অনুপ্রেরণা কিশোরী ও নারীদিগকে ঈশ্বর প্রেম ও সেবার ধর্মে দীক্ষিত করে। সেই কৃষ্ণ—যাঁহার চরিত্রের সৌন্দর্য ও গভীরতা আজও মানুষের বুদ্ধির অগম্য—হিন্দুস্তানে প্রেম-ধর্মের প্রবর্তন করেন। অতঃপর ঐ সদাশয় ব্যক্তি বলেন প্রেমময় পরমাত্মার প্রতি, যিনি আমাদের প্রভু ও একমাত্র বন্ধু, জীবাত্মার অনুগতা স্ত্রী ও অনুগত বন্ধুর তুল্য ভক্তির স্বাদ গ্রহণের জন্য তিনি দীর্ঘদিন রাখাল বালক অথবা গোপিনীর সাজে সজ্জিত ছিলেন। কৃষ্ণ ভক্তির প্রতীক। সরল হৃদয়ে পুঞ্জীভূত জ্বলন্ত ঈশ্বর প্রেমের প্রাবল্যে সেই ধর্মপ্রাণ ব্যক্তির দেহ ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ আড়ষ্ট ও স্থির হয়। তিনি বাহ্যজ্ঞান শূন্য হন। তাঁহার চক্ষু দৃষ্টিহীন হয় এবং অশ্রুজল তাঁহার স্থির, ফ্যাকাশে অথচ হাস্যময় মুখমণ্ডল গড়াইয়া পড়ে।

হয়তো কিছুক্ষণ পরে তিনি কালী সম্পর্কে তাঁহার ধারণা বর্ণনা করিবেন—কালীকে তিনি তাঁহার মাতা বলিয়া সম্বোধন করেন। তিনি শক্তি অথবা ঈশ্বরের শক্তির প্রতীক যাহা নারী চরিত্র ও প্রভাবের মাধ্যমে প্রকাশিত। দেব-প্রকৃতিতে কালী নারী। তিনি সকল উৎপীড়ককে দমন করেন। তিনি ভূতলে শায়িত তাঁহার স্বামীর বক্ষে পদ স্থাপন করেন। তিনি সকল জীবকে সম্মোহন ও জয় করেন। তথাপি তিনি সকল

বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের মাতা। যাহারা তাঁহার নিকট মাতা বলিয়া আসে এবং চরণাশ্রয় ভিক্ষা করে সেই সন্তানদিগকে তিনি রক্ষা করেন এবং আশ্রয় দিয়া থাকেন। তাঁহার বিস্ময়কর ক্ষমতা ইহা সুনিশ্চিত করে। তাঁহার মাতৃসুলভ উৎকণ্ঠা ভক্তবৃন্দের হৃদয়ে কোমলতম ভক্তির সঞ্চার করে। কালী ভক্তির আশ্চর্য প্রকৃত সত্তা ও কার্যকারীতার উৎকৃষ্ট প্রমাণ রাম-প্রসাদের ভাবোচ্ছ্বাস যাহা সুস্পষ্টরূপে ব্যক্ত হইয়াছে বিচিত্র ভক্তিমূলক সংগীতের মাধ্যমে। আমাদের এই সিদ্ধ পুরুষের মতে শক্তি ও প্রতিপত্তির মূর্ত প্রতীক নারী এবং শক্তি (যাহার আক্ষরিক অর্থ বল) উপাসনার অর্থ শিশুর ন্যায় সর্বান্তকরণে মহানন্দে ঈশ্বরকে মাতৃভাবে কল্পনা করিয়া তাঁহার নিকট আত্ম নিবেদন করা। অতএব আমাদের বন্ধু নারীর সঙ্গে দৈহিক ও ইন্দ্রিয় সম্পর্ক ত্যাগ করিয়াছেন। তাঁহার স্ত্রী বর্তমান কিন্তু তিনি কখনও তাঁহার সঙ্গে ইন্দ্রিয় সম্পর্কে লিপ্ত হন নাই। একমাত্র মাতৃভাব ব্যতীত পুরুষ নারীকে জয় করিতে অক্ষম। নারী মোহিনী শক্তি এবং ঈশ্বরলাভের প্রতিবন্ধক। নারীর অসীম শক্তি শ্রেষ্ঠতম ও পবিত্রতম সাধককে ইন্দ্রিয় ও পাপের জগতে নামাইয়া আনিয়াছে। সম্পূর্ণভাবে ইন্দ্রিয় জয় করা রামকৃষ্ণের আকাঙ্ক্ষা। অতএব কামিনীর প্রভাব হইতে মুক্তিলাভের জন্য তিনি বহুবৎসর আপ্রাণ চেষ্টা করিয়াছেন। এই মুক্তিলাভের জন্য নদীর তীরে উচ্চস্বরে তাঁহার হৃদয় বিদারক বিলাপ ও প্রার্থনা অনেক মানুষকে আকর্ষণ করিত যাঁহারা তাঁহার সঙ্গে ক্রন্দন করিতেন এবং তাঁহাকে আশীর্বাদ করিতেন এবং তাঁহার প্রার্থনার সফলতা কামনা করিতেন। তিনি যে ইন্দ্রিয়-পরায়ণতাকে ভয় করিতেন তাঁহাকে তিনি সম্পূর্ণভাবে জয় করিয়া-ছিলেন। যে মাতাকে তিনি উপাসনা করিতেন সেই কালী তাঁহাকে বুঝাইয়া দিয়াছেন যে প্রত্যেক নারী হইল তাঁহার প্রতীক। এই জন্যই তিনি প্রত্যেক নারীকে জগন্মাতার সম্মান দিয়া থাকেন। নারীকে এমনকি একটি ক্ষুদ্র বালিকাকে দেখিলেও তিনি মাটিতে মাথা নত করিয়া প্রণাম করেন। পুত্র যেমন মাতাকে পুজা করে অনেক নারীকেও তিনি মাতৃজ্ঞানে পুজা করিবার বাসনা প্রকাশ করেন। স্ত্রীজাতির প্রতি তাঁহার

মনোভাব ও আচরণ অপূর্ব এবং শিক্ষাপ্রদ। ইহা ইউরোপীয় আদর্শের সম্পূর্ণ বিপরীত। এই মনোভাব মহিমময় জাতীয় ঐতিহ্যগত অপরিহার্য গুণ। সত্যই হিন্দু স্ত্রীজাতিকে সম্মান দেখাইতে জানে। "আমার পিতা," পরমহংস বলেন, "রামের উপাসক ছিলেন। আমিও রামভক্ত। আমি যখন পিতার ভক্তির কথা চিন্তা করি যে ফুল দিয়ে তিনি তাঁর প্রিয় দেবতার পূজো করতেন সে ফুল আমার মনে ফোটে এবং আমার মন স্বর্গীয় গন্ধে ভরিয়ে দেয়।" অনুগত ভৃত্যের ন্যায়, সত্যবাদী, কর্তব্য-পরায়ণ পুত্র, সৎ এবং বিশ্বস্ত স্বামী, ন্যায়পরায়ণ ও পিতৃতুল্য রাজা, খাঁটি এবং স্নেহশীল বন্ধু, রামকে তিনি ভালবাসেন ও শ্রদ্ধা করেন। রামকৃষ্ণ রামকে এমন একজন প্রভু হিসাবে ভক্তি করিয়া থাকেন যাঁহাকে সেবা করার সুযোগ লাভ করাই ভৃত্যের পুরস্কার—যাঁহার চরম ও তুলনাহীন সেবায় জীবন উৎসর্গ করা এক পরম আনন্দজনক কর্তব্য। রাম এমন একজন প্রভু যিনি সেবক ভৃত্যের শরীর ও আত্মাকে সম্পূর্ণভাবে অভিভূত করেন—যাঁহার পবিত্রতা ও গৌরবময় নৈতিকগুণ সকল পুরস্কার ও প্রাপ্তির চিন্তা দূর করে। তাঁহার নিকট রামের বিখ্যাত অনুচর হনুমান প্রভু ও ভক্ত-ভৃত্যের সম্পর্কের এক মহান দৃষ্টান্ত—অপার্থিব প্রেম ও ভক্তি, মৃত্যু ও ভয়কে সমভাবে বিদ্রূপ করে এমন দৈব বিশ্বাসের দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া এবং কোন পুরস্কারের আশা না করিয়া সে প্রভুর প্রতি অনুরক্ত ছিল।

তিনি সারা জীবন যে পাপ হইতে মুক্তি লাভ করিতে চাহিয়াছিলেন তাহা হইল অর্থের প্রতি লোভ। অর্থদর্শন মাত্র এক বিচিত্র ভয় তাঁহার মধ্যে প্রকাশ পায়। তাঁহার অতুলনীয় নৈতিক চরিত্রের গোপন সূত্র হইল—কামিনীকাঞ্চন ত্যাগ। দীর্ঘদিন ধরিয়া তিনি এক অসাধারণ নিয়মানুবর্তিতা পালন করিয়াছিলেন। তিনি এক হস্তে এক খণ্ড মুদ্রা ও অন্য হস্তে এক খণ্ড মৃত্তিকা লইতেন এবং উভয় হস্তের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া বারংবার "টাকা মাটি, মাটি টাকা" বলিতে বলিতে বস্তু দুইটিকে এক হস্ত হইতে অন্য হস্তে লইতেন। এইরূপ করিতে করিতে তাঁহার মুদ্রা-মৃত্তিকা ভেদাভেদ জ্ঞান দূর হইয়াছিল। নিষ্কাম সেবাই ছিল তাঁহার আদর্শ। তিনি রামকে ভক্তি ও সেবা করেন কারণ রাম সর্বশ্রেষ্ঠ ও প্রেমময় প্রভু।

প্রকৃত সিদ্ধপুরুষের নিকট সেবার অর্থ পবিত্রতম প্রেম ও নিঃস্বার্থ আনুগত্য। তিনি যে সঙ্গীত গাহিয়া থাকেন তাহার কয়েকটির মধ্যে এই আবেগপূর্ণ ভাবের অতি করুণ প্রকাশ দেখা যায় এবং প্রমাণ করে আমরা কত অমনোযোগী। যে বিভিন্ন উপাসনার কথা পূর্বে উল্লেখ করা হইয়াছে তাহা পরমহংসের মতে জীবন্ত ও উৎসাহব্যঞ্জক পার্থিব ধর্ম এবং যে সকল কঠোর নিয়মানুবর্তিতা ও তপস্যার মাধ্যমে তিনি তাঁহার বর্তমান সাধন মার্গে পেঁাছাইয়াছেন তাহা অপূর্ব যদিও তাহা বর্ণনা করা যাইবে না। তিনি কখনও কিছু লিখেন না। কদাচিৎ তর্ক করেন, কাহাকেও শিক্ষাদানের চেষ্টা করেন না। ভাবোচ্ছ্বাসে আধ্যাত্মিক বাণী তাঁহার অন্তর হইতে অবিরত প্রকাশ পাইতেছে। অজ্ঞাতসারে তিনি শাস্ত্র পুরাণের দুর্বোধ্য তত্ত্বের উপর আলোকপাত করেন এবং হিন্দু ধর্মের প্রচলিত ধর্ম-বিশ্বাস ও দর্শনের মৌখিক ব্যাখ্যা এই নিরক্ষর ও সরল মানুষটি যে ভাবে করিয়া থাকেন তাহা সত্যই অদ্ভুত। এই প্রতীকগুলি, তিনি বলেন, সেই অখণ্ড সচ্চিদানন্দের শক্তি ও লীলার প্রকাশ—যাহা অপরিবর্তনীয় ও নিরাকার—সীমাহীন ও চিরন্তন জ্ঞান, সত্য ও আনন্দের সাগর। এই অসাধারণ মানুষটি যখন আমাদের সঙ্গী হন তখন কখনও কখনও তিনি বলেন প্রতীকগুলি তাঁহাকে ত্যাগ করিয়াছে—তাঁহার মাতা বিদ্যা-শক্তি কালী দূরে অবস্থান করিতেছেন। তিনি বালক গোপালরূপে অথবা হৃদয়ের দেবতা স্বামী হিসাবে তিনি কৃষ্ণকে উপলব্ধি করিতে পারিতেছেন না এবং রাম ও মহাদেব তাঁহাকে করুণা করিতেছেন না। নিরাকার ব্রহ্ম তাঁহার সর্বস্ব গ্রাস করিতেছে। তিনি বাক্‌শক্তি রহিত হইয়া আনন্দে ভাবাবিষ্ট হন। তাঁহার উক্তিসমূহ লিখিয়া রাখিতে পারিলে এক অদ্ভুত ও অপূর্ব জ্ঞানভাণ্ডার সৃষ্ট হইত। মানব ও পার্থিব জগত সম্পর্কে তাঁহার মন্তব্যের অনুলিপি যদি সংরক্ষণ করা সম্ভব হইত তাহা হইলে জনসাধারণ ভাবিত যে ভবিষ্যদ্বাণী, মৌলিক ও অনধিত জ্ঞানের দিন বোধহয় আবার ফিরিয়া আসিয়াছে। কিন্তু তাঁহার বাণীর ইংরাজী অনুবাদ খুব দুঃসাধ্য। আমরা এখানে তাহার কয়েকটির বিক্ষিপ্ত উল্লেখ করিতে চেষ্টা করিতেছি—

ভ্রমর যতক্ষণ পদ্মফুলের বাহিরে থাকে ততক্ষণই গুন্ গুন্ শব্দ করে ; ফুলের মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া মধু পান করিতে আরম্ভ হইলেই তাহার গুন্ গুন্ শব্দ থাকে না ! ভ্রমর মধু পান করিয়া শব্দ করিতে ভুলিয়া যায়। আপনাকে পর্যন্ত বিস্মৃত হয়। সাধকও এইরূপ।

নির্মল স্রোতজলে ঘড়া বা কলসী ডুবাইবার সময় বগ্‌বগ্‌ করিয়া কতই না শব্দ হয় ; যতক্ষণ না কলসী পূর্ণ হয় ততক্ষণই শব্দ থাকে ; জলপূর্ণ হইলে আর শব্দ হয় না ; নিঃশব্দ ও পূর্ণ কলসী গভীর জলে শান্ত হইয়া অবস্থান করে। সাধকও সেইরূপ।

চিনি জ্বাল দিবার সময় যতক্ষণ চিনিতে গাদ থাকে ততক্ষণ ধূম ও দুর্গন্ধ উঠে। চিনি পরিষ্কৃত হইলে ধূমও থাকে না, শব্দও থাকে না ; পরিষ্কৃত চিনির রস টলমল করে ; গলিত বা জমাটবস্তু সেই রস সেইরূপ দেবতা ও মনুষ্যের আনন্দ বর্দ্ধন করে। বিশ্বাসীর স্বভাবও এইরূপ।

ভয়ানক সংসার স্রোতে আমি একখানা জীর্ণ-কাষ্ঠের তরী বাহিয়া যাইতেছি : অন্য লোক জীবনরক্ষার জন্য যদি আমাকে ধরে, তবে আমরা উভয়েই ডুবিয়া মরিব। গুরু করিতে সতর্ক হও।

কাঁটা ও কঙ্করের উপরে খালি পায় কে যাইতে সাহস করে ? শ্রী হরিতে বিশ্বাস থাকিলে কোন কাঁটা ও কঙ্কর তোমায় আঘাত করিতে পারে ?

যে খুঁটি মাটিতে ভালরূপে প্রোথিত আছে, সেই খুঁটি ধরিয়া ঘুরিলে মাটিতে পড়িবার সম্ভাবনা নাই। সেইরূপ বিশ্বাস দৃঢ় থাকিলে তোমার গতি যত কেন ত্রস্ত হোক্ না তুমি কোনই আঘাত পাইবে না ; বিশ্বাস না থাকিলে পদে পদে পতন।

সূর্য উঠিবার পূর্বে টাটকা দুধ টানিলেই উত্তম মাখন উঠে এবং তাহা পরিষ্কৃত জলে ভাসে। সূর্যোদয়ের পর ঘোল টানিয়া যে মাখন বাহির করা যায়, তাহা ঘোলের সঙ্গেই লিপ্ত থাকে ; পৃথকভাবে জলে রাখা যায় না। শেষোক্ত মাখন ব্রাহ্মধর্ম ও পূর্বোক্ত মাখন যথার্থ হিন্দু ধর্মের উপমাস্থল।

কামকাঞ্চনে জগৎকে পাপে ডুবাইয়াছে। স্ত্রীলোককে বিদ্যাশক্তি বলিয়া নিরীক্ষণ করিলে স্ত্রী প্রলোভন থাকে না। পবিত্র জ্ঞান-শক্তি জগতের মাতৃস্থানীয়া।

মাগো! আমি লোকের নিকট সম্মান চাই না। শারীরিক সুখ চাই না; গঙ্গা-যমুনার চির সঙ্গমস্থল তোমার নিকট আমার আত্মা উড়িয়া যাক। মা! আমার যোগ নাই, ভক্তি নাই, আমি দীন ও বন্ধুহীন। আমি কাহারও প্রশংসা চাই না। আমার মন তোমার পাদ-পদ্মে বাস করুক।

ঈশ্বরই সত্য, অন্য সবই মিথ্যা। এই ধর্মপ্রাণ ও মহান সাধু হিন্দু-ধর্মের মাধুর্য ও গভীরতার জীবন্ত প্রমাণ। তিনি জৈবিক স্পৃহাকে সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ ও প্রায় জয় করিয়াছেন। তিনি ভাবময়, যথার্থ ধর্ম-জ্ঞানী, আনন্দময় ও স্বর্গীয় পবিত্রতার প্রতীক। এই সিদ্ধ হিন্দুযোগী জগতের মিথ্যা ও মায়াকে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। তাঁহার এই অভিজ্ঞতা চরম অনুভূতিশীল প্রত্যেক হিন্দুর অন্তরকে অভিভূত করিয়াছে। ভগবদ্ চিন্তা ব্যতীত তাঁহার আর কোন চিন্তা নাই—অন্য কর্ম নাই। তাঁহার সরল জীবনে ঈশ্বরবিনা কোন আত্মীয় বন্ধু নাই। তাঁহার নিকট ঈশ্বরই সর্বস্ব। তাঁহার নিষ্কলংক পবিত্রতা, অনির্বচনীয় আনন্দ, অনধীত সীমাহীন জ্ঞান, শিশু-সুলভ প্রশান্তি, সকল মানুষের প্রতি স্নেহ ও প্রগাঢ় ভগবৎ প্রেমই তাঁহার একমাত্র পুরস্কার। দীর্ঘদিন তিনি এই পুরস্কার উপভোগ করুন! ধর্মীয় জীবন সম্পর্কে আমাদের আদর্শ পৃথক। কিন্তু যতদিন তিনি আমাদের মধ্যে রহিবেন আমরা পরম সুখে তাঁহার চরণতলে বসিয়া পবিত্রতার মহান নীতিসূত্র, বিষয়জ্ঞানরহিত আধ্যাত্মিকতা ও ঈশ্বর প্রেমের মাদকতা সম্পর্কে তাঁহার নিকট শিক্ষা লাভ করিব।

রামকৃষ্ণ ও কেশবচন্দ্র

....দক্ষিণেশ্বরবাসী পরমহংস রামকৃষ্ণের সহিত তাঁহার* সম্বন্ধের বিষয় কিছু উল্লেখ করা আবশ্যক হইতেছে। আমাদের ধর্মবন্ধু হরিভক্ত রামকৃষ্ণকে ইদানীং যাঁহারা স্বয়ং ভগবান বলিয়া পূজাকরত নববিধ এক পৌত্তলিকতার সূত্রপাত করিয়াছেন, তাঁহারা বলিয়া বেড়ান,—কেশব রামকৃষ্ণের শিষ্য ছিলেন, তাঁহারই নিকট তিনি "নববিধান ধর্ম" শিক্ষা পাইয়াছেন। ইহা দ্বারা রামকৃষ্ণোপাসকেরা গুরুদেবের মহিমা বাড়াইতে গিয়া তাঁহাকে ডুবাইতেছেন সন্দেহ নাই। রামকৃষ্ণের প্রকৃত মহত্ত্ব যাহা কিছু, কেশব দ্বারা জগতে তাহা প্রথম প্রচারিত হয়। তিনি তাঁহাকে দক্ষিণেশ্বরের অজ্ঞাত অবস্থা হইতে প্রকাশ করেন। ইহার অনেক পরে ঐ সকল রামকৃষ্ণোপাসকেরা তাঁহার মহত্ত্বকে বিকৃত করিয়া নিজেদের ইচ্ছামত এক অন্ধ ভক্তির ধর্ম প্রচার আরম্ভ করিয়াছেন। এ সকল ব্যক্তির চরিত্র ফিরিয়াছে, রামকৃষ্ণের শিক্ষা এবং দৃষ্টান্তে ইঁহাদের অনেক উপকার হইয়াছে সত্য, কিন্তু ইঁহারা রামকৃষ্ণ ও কেশব সম্বন্ধে অনেক কাল্পনিক এবং অলীক কথা বলিয়া উভয় ভক্তের নিকট অপরাধী হইয়া পড়িয়াছেন। বাহ্যাড়ম্বর, লোকসমারোহ, অজ্ঞানান্ধতা এবং লৌকিক উৎসাহ এখন ইঁহাদের মধ্যে যথেষ্ট বৃদ্ধি হইয়াছে, তৎসঙ্গে রামকৃষ্ণের নামও জগতে প্রচার হইয়াছে; কিন্তু তাঁহার স্বাভাবিক ধর্মজীবনের সে অকৃত্রিম সৌন্দর্য মিষ্টতা আর এখন নাই। এখন তিনি বৈদান্তিক পণ্ডিত এবং উপাস্য দেবতা। যাহা হউক, সারগ্রাহী মধুপ কেশ ইঁহার ভিতর যাহা কিছু সার ছিল, তাহা লইয়াছিলেন। এই মহাত্মার সঙ্গে তিনি প্রথমে বেলঘরিয়ার উদ্যানে মিলিত হন। প্রথম মিলনেই উভয়ের হৃদয় এক হইয়া যায়। সাধুরাই লুপ্ত এবং গুপ্ত সাধুদিগকে জগতের সম্মুখে বাহির করিয়া থাকেন। কেশবচন্দ্র যেমন বর্তমান

* ১। কেশবচন্দ্র—সম্পাদক।

সময়ে শিক্ষিত ধর্মপিপাসু নব্যদলের সহিত ঈশা মুসা গৌর শাক্য সক্রেটিশ মহোম্মদের পরিচয় করিয়া দিয়াছেন, এবং তাঁহাদের মনে সাধু-ভক্তির সঞ্চার করিয়াছেন, তেমনি পরমহংসকে তিনিই বঙ্গীয় যুবকবৃন্দের নিকট ডাকিয়া আনিয়াছেন। এই দুই মহাত্মার ধর্মভাবের বিনিময়ে ব্রাহ্ম সমাজে ভক্তি বিষয়ে অনেক উন্নতি হইয়াছে। আমরা পূর্বেই বলিয়াছি, কেশব যাহার ভিতরে ভাল সামগ্রী যাহা কিছু পান, তাহা শোষণ করিয়া লন। অবিকল প্রতিলিপির ন্যায় তাঁহার অনুকরণ ছিল না। অন্যের ভাব লইয়া তিনি তাহাকে নূতন আকার প্রদান করিতেন, এবং এক গুণ ভাবকে দশগুণ করিয়া তুলিতে পারিতেন। পরমহংসের সরল মধুর বাল্যভাব কেশবের যোগ বৈরাগ্য নীতি ভক্তি ও বিশুদ্ধ ধর্মজ্ঞানকে অনুরঞ্জিত করিয়াছিল। ব্রাহ্মসমাজে এক্ষণে যে ভক্তির লীলাবিলাস ও মাতৃভাবের প্রকাশ দেখা যাইতেছে, তাহার এক প্রধান সহায় পরমহংস রামকৃষ্ণ। তিনি শিশু বালকের মত মা আনন্দময়ীর সহিত যেমন কথা কহিতেন, এবং হরিলীলার তরঙ্গে ভাসিয়া যেমন নৃত্য কীর্তন করিতেন, শেষ জীবনে কেশব অবিকল তাহা দেখাইয়া গিয়াছেন। কিন্তু উভয়ের মধ্যে জ্ঞানের ধারণা সম্পূর্ণ পৃথক ছিল। রামকৃষ্ণ প্রেমভক্তি, ভাবুকতার আলোকে কালী কৃষ্ণ ইত্যাদির জড় মূর্তি দেখিতেন। কেশব পরম ভক্ত হইলেও চিরকাল ব্রহ্মজ্ঞানী ছিলেন। মাতৃভাবের সাধন, সহজ প্রচলিত ভাষায় উপাসনা প্রার্থনা ইদানীং তিনি যাহা করিতেন, তাহাই মাত্র কেবল উক্ত মহাত্মার সহিত যোগের ফল। কিন্তু কেশব ভিন্ন কয় ব্যক্তি সে ভাবের অনুকরণ করিতে পারিয়াছেন? এই প্রেমযোগের কিছু অংশ সকলেই পাইয়াছেন, কিন্তু তাঁহার মত কেহই আদায় করিতে পারেন নাই। আবার কেশবচন্দ্রের প্রভাবও পরমহংস মহাশয়ের ধর্মজীবনকে অনেক বিষয়ে পরিমার্জিত ও পরিশোধিত করিয়া দিয়াছে। তিনি মনুষ্যের স্বাধীনতা, দায়িত্ব এবং সংসারী লোকের ভক্তি বৈরাগ্য উপার্জনের সম্ভাবনীয়তা পূর্বে স্বীকার করিতেন না। হিন্দু সীমার বহির্ভাগে তাঁহার যে উদারতার পরিচয় এখন পাওয়া যায়, তাহা কেশবসহবাসের ফল। ইহা ব্যতীত রামকৃষ্ণের অশ্লীল ভাষায় বাক্যালাপ, ভদ্র মহিলা-

দিগের অশ্রাব্য রূপক উপমা, মতগত ও জ্ঞানগত ভ্রান্তি কেশব দ্বারা বহু পরিমাণে সংশোধিত হইয়া যায়। ফলতঃ রামকৃষ্ণ রামপ্রসাদের ন্যায় একজন উচ্চ শ্রেণীর পৌত্তলিক ভক্ত ছিলেন। তাঁহার জীবন ভক্ত-জীবন, কিন্তু মত বিশ্বাস অনেক ভ্রান্তিপূর্ণ বিজ্ঞানবিরোধী ছিল। ধর্মপ্রচারের প্রস্তাব শুনিলে তিনি বলিতেন, "সে সব ঐ আধারে" অর্থাৎ সে জন্য কেশবই আছেন। রামকৃষ্ণ বলেন, "আমি বহুকাল পূর্বে একদিন আদি সমাজ দেখিতে গিয়াছিলাম। তথায় গিয়া দেখিলাম, চক্ষু বুজিয়া স্থির-ভাবে সকলে বসিয়া আছে। কিন্তু বোধ হইল, ভিতরে যেন সব লাঠী ধরিয়া রহিয়াছে। কেশবকে দেখিয়া মনে হইল, এই ব্যক্তির ফাতনা ডুবিয়াছে।" অর্থাৎ তাঁহার ছিপে মাছ খাইতেছে। এই লোক দ্বারা মায়ের কাজ হইবে, ইহা তিনি মায়ের মুখেও শুনিয়াছিলেন। জাতিভেদ, পৌত্তলিকতার সহিত যোগ থাকাতে রামকৃষ্ণ সাধারণের নিকট এখন বিশেষ প্রিয়। যাহা হউক, এইরূপে উভয়ের যোগে ধর্মজগৎ অনেক বিষয়ে উপকৃত হইয়াছে। এই উপলক্ষে হিন্দুধর্মের শাখা প্রশাখার মধ্যে যে সকল আধ্যাত্মিক মধুর ভাব ছিল, তাহা বিধানবিশ্বাসীদিগের দ্বারা ব্রাহ্মসমাজের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে। যে ধর্ম এক সময়ে নিতান্ত কঠোর নীরস বোধ হইত, এইরূপে তাহা সরস এবং অত্যন্ত সরল হইল। কোথায় বৈদান্তিক জ্ঞানবিচার, আর কোথায় মাতার সঙ্গে শিশুর কথোপকথন। আরাধনা প্রার্থনায় গ্রাম্য কথার চলন এই সময় হইতে আরম্ভ হইয়াছে। পরমহংসের সহিত কেশবের ধর্মবন্ধুতার অন্য অর্থ ধরিয়া এখন অনেকে অনেক মিথ্যা কথা প্রচার করিয়া থাকেন। কিন্তু স্বয়ং রামকৃষ্ণই ইহা মিথ্যা বলিয়া জানিতেন। কেশব রামকৃষ্ণের গুণ-গ্রাহী ছিলেন, ইহা সত্য। কারই বা গুণ তিনি গ্রহণ না করিতেন? নববিধান-ধর্মের মূল বীজ তাঁহার আত্মাতে বিধাতা কর্তৃক রোপিত হয়; পরে তাহা স্বদেশ বিদেশের মত এবং জীবিত মহাজন ও সাধকদিগের ব্যক্তিগত সাহায্যে ফলে ফুলে সুশোভিত হইয়াছিল।

এই সময় (১৫ই মার্চ ১৮৭৫ খ্রীঃ) তপোবনে পরমহংস রামকৃষ্ণের সহিত কেশবচন্দ্রের সাক্ষাৎকার হয়। পরমহংস আপনার ভাগিনেয় হৃদয় সহকারে কেশবচন্দ্রকে দেখিবার জন্য কলুটোলাস্থ ভবনে গমন করেন। সেখানে শ্রবণ করেন যে, কেশবচন্দ্র তাঁহার বন্ধুগণসহ বেলঘরিয়া উদ্যানে সাধনে নিযুক্ত আছেন। কেশবচন্দ্রকে দেখিবার জন্য তাঁহার মন ব্যাকুল হইয়াছিল, সুতরাং পরদিন প্রাতে ভাগিনেয়কে সঙ্গে করিয়া তপোবনে আসিয়া উপস্থিত। প্রথমতঃ তিনি একখানা ছেকড়া গাড়ীতে উদ্যানে প্রবেশ করিয়া, পুষ্করিণীর দক্ষিণ-পশ্চিম কোণস্থ ঘাটে ভাগিনেয়সহ হস্ত-পদাদি ধৌত করিবার জন্য অবতরণ করিলেন। তাঁহার পরিধেয় একখানা রাঙাপেড়ে বস্ত্রমাত্র ছিল, উত্তরীয়াদি কিছুই ছিল না। তাঁহাকে দেখিতে অধিক দিনের পীড়িতাবস্থার ব্যক্তির ন্যায় বোধ হইল। পূর্ব দিকের বৃহৎ ঘাটে কেশবচন্দ্র বন্ধুগণসহ উপবিষ্ট ছিলেন, স্নানের উদ্যোগ হইতেছিল। এই সময়ে পরমহংস তাঁহার ভাগিনেয়সহ কেশবচন্দ্রের নিকটে উপনীত হইলেন। ভাগিনেয় হৃদয় বলিলেন, আমার মাতুল আপনার সঙ্গে হরিপ্রসঙ্গ করিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া আপনার গৃহে গিয়াছিলেন ; সেখানে শুনিলেন, আপনি এই উদ্যানে আছেন, তাই তিনি এখানে আপনার নিকট উপস্থিত। তাঁহাকে দেখিয়া কাহারও মনে তত শ্রদ্ধার উদয় হয় নাই। অভ্যাগত বলিয়া উভয়কে বসিবার জন্য আসন প্রদত্ত হইল। অভ্যাগত পরমহংস (তখন আর পরমহংস বলিয়া কে জানিত) প্রথমেই বলিলেন, বাবু তোমরা না কি ঈশ্বর দর্শন কর ? সে দর্শন কিরূপ, আমি তাহা জানিতে চাই। প্রসঙ্গ হইতে হইতে প্রসঙ্গের ভাবোপযোগী একটি রামপ্রসাদী গান তিনি ধরিয়া দেন। গাহিতে গাহিতে তাঁহার সমাধি হয় ; ভাগিনেয় হৃদয় ভট্টাচার্য 'ওঁ' শব্দ উচ্চারণ করিতে থাকেন এবং সকলকে 'ওঁ' শব্দ উচ্চারণ করিতে অনুরোধ করেন। পরমহংসের চক্ষু দিয়া আনন্দাশ্রুর উদ্গম হইল, মধ্যে মধ্যে হাসিতে

লাগিলেন, পরিশেষে সমাধি ভঙ্গ হইল। এ ব্যাপারে প্রচারকবর্গের মনে বিশেষ কোন ভাবোদয় হয় নাই। পরিশেষে তিনি যখন সাধারণ উপমাযোগে অধ্যাত্ম তত্ত্ব সকল বলিতে প্রবৃত্ত হইলেন, তখন সকলে অবাক্ হইয়া গেলেন। "যখন লুচি ভাজা যায়, তখন টগবগ করিয়া উঠে, ক্রমে অধিক জ্বাল হইলে আর শব্দ বাহির হয় না। এইরূপ জ্ঞান পরিপক্ক হইলে আর আড়ম্বর থাকে না, অল্প জ্ঞানেই আড়ম্বর।" "বানরের ছানা মার বুক জড়াইয়া ধরিয়া থাকে, বিড়ালের ছানা ম্যাও ম্যাও করিয়া থাকে। প্রথমটি নির্ভরের ভাব, দ্বিতীয়টি প্রার্থনার ভাব।" "ব্যাঙাচির ল্যাজ খসিয়া গেলেই ব্যাঙ্ হইয়া লাফাইয়া বেড়ায়। সেইরূপ আসক্তির বন্ধন ছিন্ন হইলেই সামান্য মানুষ মুক্তি লাভ করে।" এইরূপ অনেক কথা কহিয়া পরিশেষে, প্রথমে তাঁহার প্রতি যে প্রকার ব্যবহার হইয়াছিল, পরে যে প্রকার ব্যাপার হইল, তাহা লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "গরুর পালে কোন জন্তু আসিয়া ঢুকিলে, সকল গরুতে মিলিয়া তাহাকে গুঁতাইয়া তাড়াইয়া দেয়, কিন্তু কোন গরু আসিলে প্রথম গা শোঁকাশুঁকি করে। পরে আপনার জাতি জানিয়া গা-চাটাচাটি করিয়া থাকে, ভক্তে ভক্তে এইরূপ মিলন হয়।" কেশবচন্দ্র আজ পরমহংসের সহিত সাক্ষাৎ পরিচিত হইলেন, পরমহংস কিন্তু তাঁহাকে পূর্ব হইতে জানিতেন। রামকৃষ্ণ একবার 'কলিকাতা সমাজে' গমন করেন। ইনি বিলক্ষণ লোক চিনিতে পারিতেন। সেখানে যত সকল লোক উপাসনা করিতে বসিয়াছে, দেখিলেন, যেন তাহারা ঢাল খাঁড়া লইয়া লড়াই করিতেছে। কেশবচন্দ্রকে তিনি তখন কেশবচন্দ্র বলিয়া জানিতেন না, তাঁহাকে দেখিয়া তিনি হৃদয়কে বলিয়াছিলেন, 'এই লোকটার ফাত্না ডুবেছে।'

পরমহংস ও কেশবচন্দ্রের মিলন এক শুভ সংযোগ। এই সংযোগ দুই দিন পরে বা দুই দিন পূর্বে কখনো সম্ভবপর ছিল না। কেশবচন্দ্রে যখন যে ভাবের উদয় হইয়াছে, তখনই তাহার অনুরূপ আয়োজন স্বয়ং আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। কেশবচন্দ্রে যখন ভক্তির সঞ্চার হয়, তখন ভক্তি উদ্দীপন জন্য যে সকল আয়োজন, সে সকল এক এক করিয়া আসিয়া জুটিয়াছিল। কেশবচন্দ্র বিধাতার আনীত উপায়সকল যথোচিত

সদ্ব্যবহার করিতে জানিতেন; অথবা অন্য কথায় বলিতে হয়, স্বয়ং ভগবান, সে সকলের কি প্রকার ব্যবহার করিতে হইবে, শিখাইয়া দিতেন। ভক্তি সঞ্চারের সময় হইতে পথের একজন সামান্য বৈষ্ণবও কেশবচন্দ্র কর্তৃক অনাদৃত হয় নাই। যে গৃহের তৃতীয়তল বা দ্বিতীয়তলে কোনোদিন খোল করতাল বা পথের ভিখারী বৈষ্ণবের প্রবেশ করিবার অধিকার ছিল না, সেই তৃতীয়তল দ্বিতীয়তল এই সকল দ্বারা প্রায় সর্বদা পরিশোভিত থাকিত। ধন্য তাঁহার শিষ্যপ্রকৃতি! একটি সামান্য পথের ভিখারীও তাঁহাকে কিছু না দিয়া চলিয়া যাইতে পারিত না। যোগ, বৈরাগ্যাচরণ ও মাতৃভাব কেশবচন্দ্রের মনকে আসিয়া অধিকার করিয়াছে, এ সময়ে এই সমুদায় ভাবের পরিপোষক ব্যক্তি আসিয়া উপস্থিত; সুতরাং কেশবচন্দ্র বুঝিলেন, কে তাঁহাকে তাঁহার নিকট পাঠাইয়া দিয়াছেন। একদিনেই সম্বন্ধ এমন গাঢ় হইয়া গেল যে, এ সম্বন্ধ আর কোন দিন বিনষ্ট হইবে, তাহার পন্থা থাকিল না। শাক্তগণের মধ্যে মাতৃভাবের প্রাবল্য, কিন্তু এই মাতৃভাবের সঙ্গে ঘোরতর পাপবিকার সংযুক্ত। সাধক আপনি ভৈরব, সাধনার্থ স্বীকৃত শক্তি ভৈরবী, সুতরাং এখানে যথার্থ মাতৃভাবের অবকাশ কোথায়? পরমহংস শক্তিসাধক বটেন, কিন্তু তিনি যথার্থ মাতৃভাবের উপাসক। তিনি আপনি সন্তান, এবং শক্তিমাত্রেই তাঁহার মাতা, এই তাঁহার সাধনের বিশেষ ভাব ছিল. শক্তিসাধকগণ অসংযতেন্দ্রিয়, স্বেচ্ছাচারসম্ভূত পানভোজনাদিতে রত. পরমহংসের ইহার কিছুই ছিল না। ইনি সর্বথা ভোগ বিলাস হইতে বিরত হইয়াছিলেন, প্রথম রিপু ও লোভ দুইকে সম্যক্ নির্জ্জিত করিয়াছিলেন। যদিও ইনি শক্তির উপাসক, একজন হিন্দু যোগী, তথাপি প্রথমাবস্থায় সর্বপ্রকার ধর্মের প্রতি বিদ্বেষবুদ্ধি পরিহার করিয়া, সকল ধর্মপ্রবর্তকেরই সম্মাননা এবং তাঁহাদিগকে অবতার বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহার গৃহ সকল মহাত্মার আলেখ্যে শোভিত ছিল। ঈদৃশ ব্যক্তিকে পাইয়া কেশবচন্দ্রের আনন্দের পরিসীমা রহিল না, সুতরাং সময়ে সময়ে পরমহংসের বসতিস্থল দক্ষিণেশ্বরে বন্ধুগণসহ কেশবচন্দ্রের গমন এবং পরমহংসের তাঁহার নিকটে আগমন জীবনব্যাপী কার্য হইল।...

পরমহংস রামকৃষ্ণ দিন দিন প্রগাঢ় প্রীতিবন্ধনে কেশবচন্দ্রের সহিত আবদ্ধ হইয়া পড়িয়াছেন। কেশবচন্দ্রের গৃহে আগমন করিয়া তাঁহার সহিত রামকৃষ্ণের সাক্ষাৎ করা এবং কোন একটি উপলক্ষ্য হইলেই কেশবচন্দ্রের বন্ধুগণসহ তাঁহার বসতিস্থলে গমন করা, একপ্রকার নিত্যকৃত্য হইয়া পড়িয়াছে। কেশবচন্দ্রকে দেখিলে রামকৃষ্ণের ভাবপ্রধান চিত্ত একেবারে উথলিত হইয়া উঠিত। সাক্ষাৎ হইবামাত্র তিনি আর সান্তেতে থাকিতে পারিতেন না, অনন্ত আসিয়া তাঁহার হৃদয়কে এমনি অধিকার করিয়া ফেলিতেন যে, তিনি নিকটে আসিয়াই বিহ্বল হইতেন, কথা সমুদায় এলোমেলো, এবং মূর্চ্ছিতাবস্থা উপস্থিত হইত। অনেকক্ষণ পরে সংবিৎ লাভ করিয়া এত কথা বলিতেন যে, আর কাহার প্রায় কথা বলিবার অবসর থাকিত না। ভাবের পর ভাবের সমাগম হইত, তাই অন্যের কথা বন্ধ করিয়া দিয়া আপনি কথা বলিতেন। কেশবচন্দ্রের কুটিরের সম্মুখে রামকৃষ্ণ মিষ্টান্ন ভোজন করিতেছেন, কখন ভাবে মগ্ন হইয়া সংগীত করিতেছেন, কখন বলিতেছেন, উদরপূর্তি হইয়াছে, তবে কিনা খুব লোকের ভিড় হইলে কেহ তাহার ভিতর ঢুকিতে পায় না, তথাপি যদি রাজার গাড়ী আইসে অমনি সকল লোককে সরাইয়া দিয়া পথ করিয়া দেওয়া হয়, তেমনি একখানি জিলিপির পথ হইতে পারে, এইরূপ মিষ্টালাপ করিতেছেন, এ সকল দৃশ্য আমাদের চক্ষে যেন জ্বল্ জ্বল্ করিতেছে। উৎসব হইয়া গিয়াছে, তাহার কয়েক দিন পর হৃদয়কে সঙ্গে হইয়া রামকৃষ্ণ ব্রহ্মমন্দিরে আসিয়া উপস্থিত। ব্রহ্মমন্দিরে কেহ উপস্থিত ছিলেন না, দ্বারবান্ দ্বারা মন্দিরের দ্বার উদ্ঘাটন করাইয়া ভিতরে প্রবেশ করিয়াই মূর্চ্ছা। যখন তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করা হইল, আপনি প্রবেশ করিয়াই মূর্চ্ছিত হইলেন কেন ? তিনি তাহার উত্তর দিলেন যে, প্রবেশমাত্র স্থানের পবিত্রতা ও গাম্ভীর্য্য তাঁহার হৃদয়কে আসিয়া অধিকার করিল ; আর যখন স্মরণ হইল, এখানে বসিয়া এত লোক পরব্রহ্মের উপাসনা করিয়া থাকেন, তখন তিনি আত্মসংবরণ করিতে পারিলেন না। রামকৃষ্ণ ইহার পূর্বে আর কখন ব্রহ্মমন্দির দর্শন করেন নাই।

রামকৃষ্ণ পরমহংস

তখন ১৮৭৫ সাল। আমি সে সময় ভবানীপুর সাউথ সুবার্বন স্কুলের প্রধান শিক্ষক। ঘটনাচক্রে আমার সহিত লণ্ডন মিশনারী সোসাইটির বিদ্যালয়ের এক শিক্ষকের সৌহার্দ জন্মে। তাঁহার শ্বশুরালয় ছিল কলিকাতার উপকণ্ঠে, শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসের সাধনপীঠ দক্ষিণেশ্বরে। একবার তিনি দক্ষিণেশ্বর হইতে ফিরিয়া আসিয়া আমাকে বলিলেন—"শিবনাথবাবু, দক্ষিণেশ্বরের রাণী রাসমণির কালী মন্দিরে এক অতি শক্তিমান সাধক অবস্থান কচ্ছেন; তাঁর সাধনা, চালচলন, কথাবার্তা সব কিছুই বড় আকর্ষণীয়।"

তিনি আমায় রামকৃষ্ণের কয়েকটি বাণীও শুনাইলেন। সহজ, সরল ও বহুশ্রুত, কিন্তু তবু যেন এগুলি আমায় বেশ উচ্চকিত করিয়া তুলিল। বহু কর্মব্যস্ততার মধ্যেও মনে সেই কথাগুলির অনুরণন চলিতে লাগিল, কেমন যেন একটি অদৃশ্য আকর্ষণও অনুভব করিতে লাগিলাম। অবশেষে একদিন বন্ধুবরকে সঙ্গে লইয়া সেই অখ্যাত পল্লীগ্রামের উদ্দেশ্যে যাত্রা করিলাম।

তখনও শক্তিসাধক পরমহংসের অলৌকিক শক্তির সংবাদ কলিকাতার শিক্ষিত সমাজে বিশেষ পৌঁছায় নাই। পরবর্তীকালে ব্রহ্মবান্ধব কেশবচন্দ্র সেন নিয়মিতভাবে দক্ষিণেশ্বরে যাতায়াত আরম্ভ করেন এবং তিনি পরমহংসের সহিত সাক্ষাৎকারের বিশদ বিবরণ তাঁহার পত্রিকায় প্রকাশ করিতে থাকেন। ইহার ফলে দেশবাসী এই সাধক সম্বন্ধে সচেতন হইয়া উঠেন।

প্রথম পরিচয়ের পর হইতে তাঁহার জীবনের শেষদিন পর্যন্ত বহুবার আমি শ্রীরামকৃষ্ণের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছি। দর্শনের নির্দিষ্ট সময় অথবা প্রতিবার সাক্ষাৎকালীন যে সব কথাবার্তা আমাদের মধ্যে হয়, তাহা বিস্তারিতভাবে মনে নাই, তবে উহার সারাংশ স্মরণে রহিয়াছে। আজ আমার সেই পুরাতন স্মৃতিভাণ্ডার হইতে তাহা বিবৃত করিব।

আজিও আমার স্পষ্ট স্মরণ আছে, প্রথম যেদিন তাঁহাকে দেখিতে যাই সেইদিন আমায় দেখিয়া তিনি অত্যন্ত খুশী হন এবং অতি পরিচিতের মতই আমায় গ্রহণ করেন। আমি ভাবিলাম—সঙ্গী বন্ধুটি বোধহয় পূর্ব হইতেই আমার সম্পর্কে সাধককে নানা কথা শুনাইয়া রাখিয়াছেন, সেইজন্যই তিনি এরূপভাবে আমাকে আপ্যায়িত করিলেন। এইদিন তাঁহার চরিত্রের একটি বৈশিষ্ট্য আমাকে বিশেষভাবে আকৃষ্ট করিল, সেইটি হইতেছে তাঁহার অপূর্ব সরলতা। তিনি আমার অত্যন্ত নিকটে আসিয়া শিশু-সুলভ সরলতা ও ব্যাকুলতা লইয়া বারবার বলিতে লাগিলেন—"তোমায় দেখে আজ আমার বড় আনন্দ হ'ল। কিগো, মাঝে মাঝে এখানে আসবে তো?"

মন্দির পার্শ্বস্থ অধিবাসীদের নিকট এই সাধকের জীবনবৃত্তান্ত অনুসন্ধানে জানিলাম ইনি একজন নিরক্ষর দরিদ্র ব্রাহ্মণ, রাণী রাসমণির কালীমন্দিরের পূজারীরূপে দক্ষিণেশ্বরে সর্বপ্রথম আসেন কিন্তু নিজের অসাধারণ ত্যাগ, তিতিক্ষা ও কঠোর তপস্যাবলে ঈশ্বর সাক্ষাৎকার লাভ করেন। প্রতিবেশীরা আরও বলে যে, নরদেহে এইরূপ শক্তির প্রকাশ নাকি খুব অল্পই ঘটিয়া থাকে।

ইহার পর মাঝে মাঝেই তাঁহার নিকট যাইতে থাকি এবং এই যাতায়াতের ফলে আমাদের মধ্যে একটি ঘনিষ্ঠতা জন্মে। এই সময় তাঁহার নিজের মুখ হইতে যে সকল ঘটনা শুনি তাহাই এখানে বর্ণনা করিতেছি তিনি বলেন—পূজারী হইয়া যখন এই মন্দিরে বাস করিতেন তখন তিনি বহু মহাপুরুষ ও সাধুসন্তের ব্যক্তিগত সান্নিধ্য লাভ করেন। তাহার কারণ, সে সময় সাধু সন্ন্যাসীরা পুরী বা জগন্নাথ দর্শনের পথে এই মন্দির দর্শন করিতে আসিতেন এবং অনেকে আবার কয়েক দিনের জন্য এখানে অবস্থানও করিতেন। এই সকল সিদ্ধ সাধকগণের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্য রামকৃষ্ণের জীবনে এক বিরাট পরিবর্তন আনিয়া দেয়। শিশুকাল হইতে স্বাভাবিকভাবেই তাঁহার ভিতর অধ্যাত্মতৃষ্ণা প্রবল ছিল। বর্তমান পরিবেশ উহাকে আরও তীব্রতর করিয়া তুলে। ফলে সমগ্র মন প্রাণ ভগবানে সমর্পণ করিয়া পরম প্রাপ্তির জন্য তিনি তপস্যায় ব্রতী হন।

শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনে বিশেষ উল্লেখযোগ্য বাণী ছিল—কামিনী-কাঞ্চন ত্যাগ। তিনি মুমুক্ষুদিগকে বলিতেন, অধ্যাত্ম সাধনার পথে কামিনী-কাঞ্চনকে বিষবৎ ত্যাগ করিতে হয়। তিনি কিভাবে নিজ জীবনে এই বোধটি সম্যক্‌ভাবে উপলব্ধি করেন, তাহার বর্ণনা আমাকে চমৎকৃত করে। তিনি বলেন যে, সাধক জীবনে কাঞ্চন সম্পর্কে আসক্তি ত্যাগ করিবার বাসনায় তিনি এক হস্তে কিছু ধূলি ও অপর হস্তে কয়েকটি মুদ্রা লইয়া গঙ্গার তীরে গিয়া বসিতেন এবং ধূলি ও মুদ্রা এই দুইটি বস্তুই যে মূলতঃ এক বস্তু ছাড়া আর কিছুই নহে এইটি বোধ করিতে চেষ্টা করিতেন। এই সময় তাঁহার মুখে উচ্চারিত হইত—মাটি টাকা, টাকা মাটি। একাগ্র মননশীলতার বলে যখন দুইটি বস্তুই তাঁহার নিকট একাকার বলিয়া প্রতীয়মান হইত তখন ধূলি ও মুদ্রা দুই-ই অবলীলায় তিনি গঙ্গাবক্ষে নিক্ষেপ করিতেন।

কামিনীসঙ্গ ত্যাগ সম্বন্ধেও তাঁহার প্রচেষ্টা কম চমকপ্রদ নহে। এই স্বল্প পরিসর স্থানে সমস্ত ঘটনার বিবৃতি সম্ভব নহে। তবে ইহা বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, সাধক-জীবনে সিদ্ধিলাভের পরও কোন নারীর ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে তিনি আসিতে পারিতেন না। কোন ভক্ত শিষ্যা তাঁহার পাদস্পর্শ করিতে অগ্রসর হইলে তিনি অত্যন্ত চঞ্চল হইয়া বলিতেন—"ঠিক আছে, ঠিক আছে। ওখান থেকে প্রণাম করলেই চলবে, মা। আর কাছে এগিয়ে আসার প্রয়োজন নেই।"

নারীদের সম্পর্কে শ্রীরামকৃষ্ণের এই মনোভাব সম্বন্ধে আমার একটি বিশেষ কৌতূহল ছিল। আমি একদিন তাঁহাকে প্রশ্ন করিলাম—"আচ্ছা, মহিলারা আপনার চরণ স্পর্শ করতে এলে আপনি এমন ব্যস্ত হয়ে উঠে তাঁদের নিরস্ত করেন কেন?"

সাধক প্রবর আমায় উত্তর দিলেন—কামিনী ও কাঞ্চন এ দুইটি বস্তু স্পর্শ করিবার তাঁহার উপায় নাই। ইহাদের স্পর্শমাত্রই তিনি অচৈতন্য হইয়া পড়েন। আমার সম্মুখে আমি কোন মহিলাকে তাঁহার দেহ স্পর্শ করিতে দেখি নাই, কিন্তু কাঞ্চনের প্রতিক্রিয়া স্বচক্ষে দেখিয়াছি। একদিন একটি কৌতূহলী ব্যক্তি শ্রীরামকৃষ্ণের কামিনী-কাঞ্চন ত্যাগের

সত্যতা পরীক্ষার্থে তাঁহার হস্তে হঠাৎ একটি মুদ্রা স্থাপন করে। আমি তখন তাঁহার কক্ষেই উপবিষ্ট। বিস্মিত হইয়া দেখিলাম, মুদ্রাটি যেন তাঁহার দেহে তড়িৎ প্রবাহের কাজ করিল। সেই মুহূর্তে তিনি মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন এবং যতক্ষণ না মুদ্রাটি তাঁহার হস্ত হইতে উঠাইয়া লওয়া হইল তৎক্ষণ সে দেহে চেতনার কোন লক্ষণ প্রকাশ পাইল না।

কামিনী-কাঞ্চন ত্যাগ শ্রীরামকৃষ্ণের সাধনার একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ রূপেই গণ্য হইত। আমার সহিত যখন তাঁহার প্রথম পরিচয় হয় সে সময় রামকৃষ্ণের সহিত তাঁহার সহধর্মিণী সারদা দেবীর বস্তুতঃ কোন সাংসারিক সম্পর্ক ছিল না। বালিকা সারদা দেবী গ্রামের বাড়ীতে বাস করিতেন। পত্নী সম্পর্কে তাঁহার এইরূপে উদাসীনভাবে আমি সেই সময় মোটেই সঙ্গত বলিয়া মানিয়া লইতে পারি নাই বরং স্ত্রীর প্রতি অকর্তব্যের অভিযোগই সেইদিন উঠাইয়াছিলাম।

একদিন আমি দক্ষিণেশ্বরে তাঁহার কক্ষে উপস্থিত। আমার কয়েকজন বন্ধুর সম্মুখে পরমহংসের দাম্পত্য জীবনের কর্তব্যচ্যুতি সম্পর্কে আলোচনা করিতেছি। সাধক কিন্তু পার্শ্বেই উপবিষ্ট। আমার অভিযোগপূর্ণ উক্তি শুনিয়া তিনি আমাকে তাঁহার নিকটে ডাকিয়া কাণের নিকট মুখ লইয়া বলিলেন—"তুমি শুধু শুধু এ নিয়ে কেন আন্দোলন ক'রছো। আমার দ্বারা জৈব জীবন যাপন যে আর সম্ভব নয়। এ দেহ থেকে জীব জীবনের কামনা বাসনার মূল উৎপাটিত হয়ে গিয়েছে।"

এই ঘটনার কয়েকদিন পরে পুনরায় রামকৃষ্ণের উপদিষ্ট কামিনী-কাঞ্চন ত্যাগের অযৌক্তিকতা লইয়া আমার সাথে বিতর্ক হয়। প্রসঙ্গতঃ আমি বলিলাম—"আপনি ধর্ম জীবন থেকে নারী বর্জনের যে নীতি নির্ধারণ করেছেন তা অনুচিত। ব্রাহ্ম সমাজ কিন্তু তা করে নি। ব্রাহ্মধর্মে নারী শিক্ষা, নারী প্রগতি, সমাজে তাদের ন্যায্য অধিকার প্রদান সম্বন্ধে আন্দোলন চলছে। মানুষের সামাজিক ও পারিবারিক জীবনের ক্ষেত্র থেকে নারীসঙ্গ পরিহারের নীতি কোন ক্রমেই গ্রহণীয় হতে পারে না।"

তাঁহার নির্দেশিত পথ সম্পর্কে অভিযোগ ও ব্রাহ্মধর্মের ব্যবস্থা

শুনিয়া পরমহংস উত্তেজিত হইয়া উঠিলেন। তাঁহার ক্রোধের রূপটি আমাদের বড় আনন্দ দিত। তিনি উচ্চকণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন—"মূর্খের দল! এই নারীরাই তোমাদের জন্য সর্বনাশা গর্ত খুঁড়ে রাখছে।"

কথা বলিতে বলিতে তিনি হঠাৎ স্তব্ধ হইয়া গেলেন। তারপর উজ্জ্বল তীক্ষ্ম দৃষ্টিটি আমার মুখের উপর নিবদ্ধ করিয়া বলিতে লাগিলেন—"আচ্ছা একজন মালীর কথাই ধর। যখন সে বাগানে ফুল গাছের চারা পোঁতে, তখন গরু ছাগলের হাত থেকে ওটা রক্ষা করার জন্য কি সে বেড়া দেয় না? শিশু গাছটি যখন বড় হয়ে ওঠে, তখন মালী নিজেই সে বেড়া খুলে ফেলে দেয়।"

আমি বলিলাম—"আপনার কথা যথার্থ, কিন্তু ওটা তো মালীর বৃক্ষ রোপণের কথা মাত্র। মানুষের জীবনের ক্ষেত্রে তার যৌক্তিকতা কোথায়?"

তিনি মন্তব্য করিলেন—"মানুষের আধ্যাত্মিক জীবন সম্পর্কেও সেই একই নিয়ম খাটে। আধ্যাত্মিক জীবনের প্রথমভাগে নারীসঙ্গ সম্পূর্ণভাবে ত্যাগ কর। মনকে একান্তভাবে ঈশ্বরে সমর্পণ করে কঠোর ব্রহ্মচর্য পালন কর ও আত্মশক্তিতে প্রতিষ্ঠিত হও, তারপর নারীদের সাথে মেলামেশা কর। তার আগে নয়।"

আমি বলিলাম—"আধ্যাত্মিক জীবনের ক্ষেত্রে নারী জাতি গরু ছাগলের মত হেয় এবং অহিতকারী সঙ্গী বলে আপনি যে উপমাটি আজ দিলেন তা আমি মানতে কিছুতেই সম্মত নই। বরং আমি একথাই বলবো যে নারীজাতি আমাদের আধ্যাত্মিক ও সামাজিক জীবনে অপরিহার্য সঙ্গিনী ও সহায়িকা।"

শ্রীরামকৃষ্ণ আমার যুক্তি সমর্থন করিলেন না। শুধু মাথা নাড়াইয়া জানাইলেন—এ ধারণা ভ্রান্ত।

আলাপ আলোচনায় সেদিন সন্ধ্যা হইয়া গেল। পশ্চিমাকাশের দিকে দৃষ্টি ফিরাইয়া তিনি সকৌতুকে বলিয়া উঠিলেন—"কি গো! সন্ধ্যে তো হয়! তাড়াতাড়ি ঘর পোষা জীব ঘরে ফিরে যাও, নইলে গিন্নী আবার ঘরে ঢুকতে দেবে না।" মহাপুরুষের সেই সরল অনাবিল রসিকতায় উপস্থিত ব্যক্তিরা সকলেই হাসিয়া উঠিলেন।

কেবল নারী সম্পর্কেই নহে, শ্রীরামকৃষ্ণের সাধনার অন্যান্য পন্থাগুলিও বড় বিচিত্র ছিল। ইহার মধ্যে অনেকগুলি খাম-খেয়ালী-পনা এবং সময় ও শ্রমের অপচয় বলিয়া আমার মনে হইয়াছিল। তাঁহার সাধনার সিদ্ধিলাভের আরও ভাল পন্থা ছিল কিন্তু কোন মানুষকে বিচার করিতে হয় তাঁহার একাগ্রতা এবং ধর্মীয় জীবন যাপনে তাঁহার আকাঙ্খার দ্বারা। তাঁহার নিজ মুখ হইতেই শুনিয়াছি যে, সে সময় দক্ষিণেশ্বর কালী মন্দিরে বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী সাধু-সন্ন্যাসীর যাতায়াত ছিল। এই সন্ন্যাসীগণ নিজ নিজ আধ্যাত্মিক আদর্শ ও সাধন-জীবনের অভিজ্ঞতা হইতে যে যে পন্থাকে ব্রহ্মপ্রাপ্তির সহায়ক বলিয়া বুঝাইতেন, বিশ্বাসবান রামকৃষ্ণ সেই ভাবকে অবলম্বন করিয়া তখনই সাধনা আরম্ভ করিয়া দিতেন।

একবার এক সন্ন্যাসী তাঁহাকে বলেন যে, ঈশ্বরে পরিপূর্ণ নির্ভরতা আনিতে হইলে ভক্ত হনুমানের ভাব অবলম্বন বিশেষ কার্যকরী। রামায়ণে দেখা যায় হনুমানের জীবনে রাম ব্যতীত অন্য কোন চিন্তার স্থান নাই—পরিপূর্ণ আত্ম-নিবেদনেই এই ভাব সম্ভব। ইহা শুনিবা মাত্র রামকৃষ্ণ হনুমানের ভাবে সাধনা আরম্ভ করিলেন। একাদি-ক্রমে কয়েকদিন তিনি কক্ষ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন না। নিজের মধ্যে হনুমানের ভাবটি আরোপ করিলেন এবং ইহার পর তিনি সম্পূর্ণরূপে উক্তভাবে ভাবান্বিত হইয়া পড়িলেন। এই সময়ে হনুমানের মত একটি লেজ নিজ দেহে সংযোজন করিয়া কক্ষ মধ্যে লাফালাফি করিতেও ছাড়েন নাই। মুখে এখন তাঁহার শুধু এক কথা, "ঈশ্বর, আমি তোমার একান্ত অনুগত ভৃত্য। আমায় তুমি কৃপা কর।"

এক সময় একজন সাধক তাঁহাকে বলেন যে, নিজেকে দীনাতিদীন ভাবিতে থাকিলে ক্রমে মন হইতে সকল প্রকার অহংকারের বীজ অপসা-রিত হয়। কথাটি পরমহংসের মনে গভীর রেখাপাত করে। তিনি ইহার পর হইতে নিজে অতি দীনভাবে জীবনযাপন আরম্ভ করেন। শিষ্য ও ভক্তগণের অলক্ষ্যে প্রতিবেশীদের মলমূত্রাগারে প্রবেশ করিয়া তিনি তাহা পরিষ্কার করিতে থাকেন—মলপাত্র নদীতে লইয়া গিয়া স্বহস্তে পরিষ্কার

করিয়া আবার তাহা স্বস্থানে রাখিয়া আসিতেন। কয়েকদিন পূজার্চনা ছাড়িয়া তিনি মনপ্রাণ দিয়া এই ঘৃণ্য কর্মে নিজেকে লিপ্ত রাখিলেন। পরে ভক্তগণ জানিতে পারিয়া তাঁহাকে এই কর্ম হইতে প্রতিনিবৃত্ত করে।

এ জাতীয় অদ্ভুত আচরণ ব্যতীত তাঁহার দৈনন্দিন আহার বিহারেও কঠোর কৃচ্ছ্রসাধন লক্ষিত হইত। দিনের পর দিন তাঁহার অনাহার ও অনিদ্রায় কাটিয়া যাইত। দেহের স্বাভাবিক সহ্যশক্তির একটা সাম্য রহিয়াছে যাহা অতিক্রান্ত হইলে স্বাভাবিক নিয়মেই প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। মনে হয়, শ্রীরামকৃষ্ণের ক্ষেত্রেও ইহার ব্যতিক্রম হয় নাই। অল্পকাল মধ্যেই তাঁহার স্বাস্থ্য একেবারে ভাঙিয়া পড়ে এবং গলনালীতে দুরারোগ্য ক্যান্সার ব্যাধি দেখা দেয়। ইহার ফলেই তাঁহার মৃত্যু ঘটে।

রামকৃষ্ণের দেহে একটি বিস্ময়কর স্নায়বিক পরিবর্তনের লক্ষণ প্রায়ই দেখা দিত যখনই তাঁহার মনে কোন আবেগ বা উচ্ছ্বাস দেখা দিত সেই সময়েই তিনি কিছুক্ষণের জন্য অচেতন হইয়া পড়িতেন—তাঁহার মুখমণ্ডল একটি অপূর্ব জ্যোতিতে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিত। দেখিলে মনে হইত যে, ভিতরে একটি তীব্র অধ্যাত্ম-আবেগ তরঙ্গায়িত হইতেছে। শুনিয়াছি চৈতন্য, মহম্মদ প্রভৃতি মহাপুরুষদিগেরও নাকি ভাবাবেগের ফলে অনুরূপ বাহ্যজ্ঞানহীন অবস্থা হইত। ভাবামগ্ন অবস্থায় মহম্মদ যে সকল বাণী উচ্চারণ করিতেন তাহাই কোরাণে লিখিত হইয়াছে। খ্রীষ্টীয় সাধকদের জীবনেও দেখা যায়, ভাবময়তার ফলে তাঁহারা অচৈতন্য হইয়া পড়িতেন। আমাদের দৈনন্দিন জীবনেও আমরা দেখি যে, কীর্তন-সভা বা হরিবাসরে কীর্তন জমিয়া উঠিলে অনেক ভক্ত বাহ্য-জ্ঞান বিরহিত হন। সাধারণ মানুষের ক্ষেত্রে যে উচ্চতর ভাবানুভূতি কদাচিৎ দৃষ্টিগোচর হয় রামকৃষ্ণ, চৈতন্য প্রভৃতি সাধকগণের জীবনে তাহা প্রতিনিয়তই ঘটিয়া থাকে। তাঁহার এই ভাবাবেগজনিত মূর্চ্ছা যে অতিরিক্ত কৃচ্ছ্রসাধনের ফলে হইয়াছে, ইহা একদিন তিনি নিজেই আমাকে বলিয়াছিলেন। একদিন আমি তাঁহার স্বাস্থ্য ভঙ্গ ও ঘন ঘন অচেতন হওয়ার বিষয় লইয়া অভিযোগ করিতেছি শুনিয়া তিনি আমায় বলিলেন—"তুমি ঠিকই বলেছ, ভাবতন্ময়তা আমায় শেষ করবে। যে

সাধুসন্তরা আসতেন, তাঁদের অতসব নির্দেশ পালন করতে গিয়েই আমার এ অবস্থা দাঁড়িয়েছে।”

অত্যধিক কঠোর তপশ্চর্যার ফলে এক সময়ে কিছুদিনের জন্য শ্রীরামকৃষ্ণের মস্তিষ্ক বিকৃতি পর্যন্ত ঘটিয়াছিল। এই ব্যাপারটি অনেকেরই জানা নাই। কিন্তু ইহা সত্য—একদিন তিনি নিজেই আমাদের একথা বলেন। সেদিনের প্রসঙ্গটি যথাযথভাবেই এখানে উদ্ধৃত করিলাম।

একদিন আমি শ্রীরামকৃষ্ণের সম্মুখে বসিয়া তাঁহার সহিত কথা বলিতেছি, এমন সময় কলিকাতা হইতে কয়েকজন ধনী ভক্ত আসিয়া উপস্থিত হন। কথা অসমাপ্ত রাখিয়াই তিনি কয়েক মিনিটের জন্য ঘরের বাহিরে চলিয়া যান। এই অবসরে তাঁহার ভাগিনেয় ও সেবক হৃদয় আগন্তুকগণের নিকট মাতুলের আধ্যাত্মিক উন্নতি সম্পর্কে নানা চমকপ্রদ কাহিনী বিবৃতি প্রসঙ্গে বলেন—“মামার ভগবৎ প্রেম এতো বেশী যে, বাইরের জগৎ সম্পর্কে তাঁর কোন চেতনাই থাকে না। সময় সময় তিনি বাহ্যজ্ঞানহীন হয়ে যান।” হৃদয় শেষ কথাগুলি যখন বলিতেছিলেন সে সময় রামকৃষ্ণ কক্ষে প্রবেশ করিলেন। অপরের সম্মুখে নিজের প্রশস্তিতে তিনি খুশী হন নাই। বরং অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া হৃদয়ের উদ্দেশে বলিয়া উঠিলেন—“ওরে তোর যে এতহীন প্রকৃতি তা তো জানতাম না। ধনী লোক, আর তাঁদের পোষাক পরিচ্ছদ, ঘড়ি চেন দেখে মামার সম্পর্কে উচ্চ প্রশংসা কচ্ছিস্। তুই কি আমার জন্য টাকাকড়ি যোগাড়ের মতলবে আছিস্ না কি রে? এরা যদি আমার সম্বন্ধে উঁচু ধারণা পোষণ না-ই করে, তাতে আমার কি এলো গেলো?” এই কথা কয়টি বলিয়া শ্রীরামকৃষ্ণ উপস্থিত ব্যক্তিদের দিকে ফিরিয়া কহিলেন—“দেখুন, হৃদয়ের মুখ থেকে আপনারা যা শুনেছেন তা কিন্তু মোটেই সত্য নয়। ভগবৎ প্রেম আমাকে বাহ্যজ্ঞানহীন করেছে তা সত্য নয়। মধ্যে কিছুকাল আমার মস্তিষ্ক বিকৃতিই ঘটেছিল। সে সময় আমি একেবারে অপ্রকৃতস্থ হয়ে পড়ি। তাছাড়া, আমার এ অবস্থা কেন হয়েছিল তাও বলছি—মন্দিরে আগত সাধকগণের নির্দেশে নানা প্রক্রিয়া ও কঠোর ব্রতাদি পালন করতে করতে আমার মাথা তখন খারাপ

হয়ে যায়। আমার বাহ্যজ্ঞানহীনতা ভগবৎ প্রেমের জন্য নয়—তা মাথা গণ্ডগোলের লক্ষণ, আর খুব বেশী কৃচ্ছ্রসাধনের জন্যই তা হয়েছিল।”

সেদিন রামকৃষ্ণের এ সরল ও অকপট উক্তি আমাকে তাঁহার প্রতি আরও শ্রদ্ধাশীল না করিয়া পারে নাই। ব্যক্তিগতভাবে তাঁহার কতকগুলি সাধন পদ্ধতির তাৎপর্য আমি বুঝি নাই বা মানিয়া লইতে পারি নাই সত্য, কিন্তু দীর্ঘদিন যাতায়াত ও বিভিন্ন পরিবেশের মধ্য দিয়া তাঁহার যে পরিচয় পাইয়াছি, সে অভিজ্ঞতা হইতে বলিতে পারি—আমার জীবনে আমি এরূপ ভগবদ্‌ সমর্পিতচিত্ত, মহাসাধক কমই দেখিয়াছি। ঈশ্বর লাভের জন্য কেহ যে এরূপ ত্যাগ তিতিক্ষা ও কঠোর জীবন স্বেচ্ছায় বরণ করিতে পারে, এ ধারণাও পূর্বে আমার ছিল না।

পূর্ব অভিজ্ঞতা হইতে আমি এই সিদ্ধান্তেই আসি যে, রামকৃষ্ণ কেবলমাত্র সাধক বা ভক্ত নহেন—তিনি সিদ্ধপুরুষ। প্রত্যক্ষ অধ্যাত্মদৃষ্টি দিয়া তিনি যে পরম সত্যকে দর্শন করিয়াছেন, যে সত্য তাঁহার সাধন জীবনের উৎসরূপে বর্তমান—তাহা ঈশ্বরীয় মাতৃমূর্তি। ভগবানকে তিনি জগজ্জননীরূপে ভাবিতে ভালবাসিতেন। মাতৃস্নেহের একটি অপার্থিব অমৃতধারার মাঝে তিনি পরম আশ্রয় লাভ করেন, ইষ্টকে মাতৃভাবে আরাধনা করিয়াই তাঁহার সাধনা, সিদ্ধি ও পরম প্রাপ্তি ঘটে। তাঁহার মনোজগতে ও জীবন সত্তায় ‘মা’ ব্যতীত আর কোন বস্তুর যেন অস্তিত্বই ছিল না। সেজন্য মায়ের গান শুনিলে তিনি ভাবস্রোতে নিমজ্জিত হইয়া একেবারে সম্বিৎ হারাইয়া ফেলিতেন।

ইষ্টতে রামকৃষ্ণের এই মাতৃজ্ঞান কিন্তু কোন একটি দেবীমূর্তির মধ্যেই সীমিত ছিল না, তাহা মূর্তিকে অতিক্রম করিয়া বিশ্বব্যাপী সত্তারূপে সর্বত্র পরিব্যাপ্ত হইয়াছিল। তিনি যখন তাঁহার মায়ের কথা বলিতেন তখন সে মাতৃরূপের বর্ণনা চতুর্ভুজা কালীমূর্তির সীমাকে ছাড়াইয়া অনন্তব্যাপিনী মাতৃমূর্তিকেই যেন রূপায়িত করিয়া তুলিত। শ্রীরামকৃষ্ণের সাধনায় কালী ও কৃষ্ণের এক পরম মধুর সমন্বয় ঘটিয়াছিল। তিনি বলিতেন—“মানুষ মূর্খ, তাই কালী ও কৃষ্ণের বৈষম্য নিয়ে মিথ্যেই ঝগড়া করে। আসলে, যিনি কালী তিনিই যে কৃষ্ণ।”

রামকৃষ্ণের আধ্যাত্মিক চেতনায় জগজ্জননীর যে বিশ্বব্যাপিনী মাতৃরূপ প্রকাশ লাভ করে তাহাতে খণ্ডতা অপূর্ণতা বা বৈষম্যের কোন স্থান ছিল না। তাই বিভিন্ন ধর্মের মধ্যকার সমন্বয়ের মূল সত্যটি তিনি অনায়াসেই ধরিতে সক্ষম হন। এ প্রসঙ্গে একটি ঘটনা আজ মনে পড়িতেছে।

ভবানীপুরের এক খ্রীষ্টান ধর্মপ্রচারকের সহিত সে সময় আমার বিশেষ হৃদ্যতা জন্মে। আমার মুখে শ্রীরামকৃষ্ণের বহু কথা শুনিয়া তিনি এই শক্তিমান সাধক পুরুষকে দর্শনের আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করেন। আমি একদিন বন্ধুটিকে লইয়া দক্ষিণেশ্বরে উপস্থিত হই। রামকৃষ্ণের সঙ্গে তাঁহার পরিচয় করাইবার কালে বলিলাম—"ইনি একজন খ্রীষ্টান ধর্মযাজক, লোকমুখে ও আমার কাছে আপনার কথা শুনে আপনাকে দেখতে এসেছেন।"

আমার কথার উত্তর দিবার পূর্বে শ্রীরামকৃষ্ণ বার বার ভূমিতে মস্তক স্পর্শ করিয়া বলিতে লাগিলেন—"মহাত্মা যিশুর চরণে আমার শত শত প্রণাম।"

যিশু সম্পর্কে একটি অপর ধর্মসম্প্রদায়ভুক্ত সাধকের এরূপ অকুণ্ঠ শ্রদ্ধা জ্ঞাপন আগন্তুক খ্রীষ্টান যাজকটিকে বিস্মিত করিয়া তুলিল। তিনি সবিস্ময়ে বলিয়া উঠিলেন—"মশাই, আপনি যিশুর চরণোদ্দেশে যে নত হয়ে প্রণাম করলেন তার তাৎপর্য কি?"

রামকৃষ্ণ বলিলেন—"সে কি গো! তাঁকে প্রণাম করব না? তিনি যে ভগবানের অবতার!"

বন্ধু ততোধিক বিস্ময়পূর্ণ কণ্ঠে প্রশ্ন করিলেন—"অবতার! ঈশ্বরের অবতরণ আমি কিন্তু এর কোন অর্থই বুঝলাম না। আপনি কি দয়া করে আমায় আর একটু পরিষ্কার করে এ কথাগুলো বুঝিয়ে দেবেন?"

রামকৃষ্ণ বলিলেন—"এ দেশে যিনি রাম ও কৃষ্ণ রূপে আবির্ভূত হয়েছিলেন যিশুও তাঁর সেরূপ আর এক প্রকাশ! তুমি ভগবত পড়নি? তাতে লেখা আছে অনন্ত শক্তিমান ভগবান অথবা বিষ্ণুর অসংখ্য অবতার রূপে অবতরণ।

আমার বন্ধুটি বিস্ময় প্রকাশ করিয়া বলিলেন—"আমি কিন্তু এখনও

ওর তাৎপর্য বুঝতে পারছিনে। আপনি যদি দয়া করে আরও বিশদ ব্যাখ্যা করেন তা হলে বাধিত হবো।"

রামকৃষ্ণ বলিলেন—"একটা সাধারণ কথা দিয়েই বলি। আচ্ছা সমুদ্রের কথাই ধর। যখন এর দিকে তাকাও, এর অনন্ত জলরাশি ছাড়া কিছুই দৃষ্টিপথে আসে না। কিন্তু ঠাণ্ডায় যখন জলভাগের কিছুটা জমে যায় তখন এই অসীমতার মধ্যে তোমার দৃষ্টি সীমিত হয়, অবলম্বনের একটি ক্ষেত্র খুঁজে পায়। তুমি একে ইচ্ছে বা প্রয়োজন মত ব্যবহার করতেও পার। অবতার সম্পর্কেও সেই একই কথা। ঈশ্বর অনন্ত, অরূপ, বিশ্বব্যাপী। কিন্তু বিশেষ প্রয়োজনে এই অসীম শক্তি সীমার মাঝে রূপ নিয়ে আসেন এই শক্তি যাঁদের, তাঁদের আমরা বলি মহাপুরুষ, মহাত্মা বা অবতার। অবতার ঈশ্বরের বিশেষভাবে প্রকাশকেই বুঝায়। মহাপুরুষদের লোকোত্তর জীবনের মধ্যে দিয়েই লীলাময়ের স্বর্গীয় সত্তার প্রকাশটি ঘটে। এ হচ্ছে অবতারের ব্যাখ্যা।"

আমার বন্ধু বলিলেন—"এবারে আমি আপনার কথা বুঝলাম, কিন্তু এ তত্ত্ব গ্রহণ করতে পারছিনে।" এই কথা কয়টি বলিয়া জিজ্ঞাসু নেত্রে বন্ধু আমার দিকে ফিরিয়া বলিলেন—"অবতারবাদ সম্পর্কে ব্রাহ্ম সম্প্রদায়ের অভিমত কি বলুন তো।"

রামকৃষ্ণ বলিলেন—"ও মূর্খদের (ব্রাহ্মদের) কথা আর বলো না। এ সত্য বোঝবার মত দৃষ্টি ওদের নেই।"

আমি তৎক্ষণাৎ বলিয়া উঠিলাম—"আপনাকে কে বলেছে যে, মহাপুরুষদের লোকোত্তর সত্তা সম্বন্ধে আমরা আস্থাবান নই।"

রামকৃষ্ণ উত্তর দিলেন—"সত্যিই কি তোমরা ঈশ্বরের অবতরণ বিশ্বাস কর? আমার তো সে ধারণা ছিল না।"

এ প্রসঙ্গ এখানেই সমাপ্ত হইল। ইহার পর রামকৃষ্ণ তাঁহার সেই সুপরিচিত ভঙ্গীতে ও ভাষায় অধ্যাত্ম জগতের বহু নিগূঢ় তত্ত্ব সম্পর্কে আলাপ আলোচনা করিতে থাকেন। খ্রীষ্টান ধর্মযাজকটি সেদিন তাঁহার প্রগাঢ় জ্ঞানের পরিচয় পাইয়া স্তম্ভিত হইয়া যান। ইহার পর হইতে আমি যখনই অবসর পাইতাম দক্ষিণেশ্বরে তাঁহার নিকট

যাইতাম। তাঁহার সহিত বহুবার সাক্ষাৎ করিয়াছি। তাঁহার মুখে নিঃসৃত পরমতত্ত্বের বহু মূল্যবান ব্যাখ্যা শুনিবার সুযোগও কম পাই নাই কিন্তু পৃথকভাবে সেগুলি সব আজ স্মরণ নাই। স্মৃতিপটে যে ঘটনাগুলি তখন বিশেষভাবে রেখাপাত করিয়াছিল তাহারই কয়েকটি এখানে উদ্ধৃত করিতেছি—

আমি একদিন শ্রীরামকৃষ্ণের কক্ষে বসিয়া আছি। কয়েকটি ভক্তও সেখানে উপবিষ্ট। পরমহংস হঠাৎ এক সময়ে কক্ষ হইতে বাহিরে গিয়াছেন। ভক্তেরা নিজেদের মধ্যেই ঈশ্বরের গুণাগুণের বিচার আরম্ভ করিলেন। তিনি কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিতে করিতে কহিলেন—"চুপ কর তো তোরা, ঈশ্বরের গুণাগুণের বিচার করে কি লাভ বল্ দেখি। তাঁর মহিমা বুঝতে হলে স্মরণ, মনন, ধ্যান-ধারণা দিয়ে তা করতে হয়। তর্ক করে কি তা বুঝা যায়? ঈশ্বর যে করুণাময় একথা কি যুক্তি দিয়ে সত্যিই আমায় বোঝাতে পারিস্? এই যে সেদিন দক্ষিণ সাবাজপুরে বন্যা আর ঝড়ে শত শত লোকের প্রাণ নষ্ট হল এ কি করুণার নিদর্শন? তোরা হয়তো বলবি, এই ধ্বংসের ফলে নোংরা পরিস্কার হল, মাটি উর্বর হ'ল। কিন্তু আমি তর্ক করে বলবো—যিনি সর্বশক্তিমান, একদিকে সৃষ্টি করতে হলে কি তাঁকে আবার একদিকে ধ্বংস করতে হবে? শত শত অসহায় শিশু, নারী, বালক, বৃদ্ধের কান্নার মধ্যে দাঁড়িয়ে কি ঈশ্বরের করুণার কথা কল্পনা করা যায় রে?"

একজন ভক্ত শ্রোতা অসহিষ্ণু হইয়া বলিয়া উঠিল—"তবে কি বলতে হবে, ঈশ্বর নিষ্ঠুর!"

শ্রীরামকৃষ্ণ দৃঢ়কণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন—"আরে বোকা, কে তোকে তা বলতে বলছে? ঈশ্বরের গুণাগুণ নির্ণয় কে করবে? তাঁর অনন্ত মহিমার অন্ত কে করবে! তাই তো বলছি কাতর হয়ে শুধু এই প্রার্থনা কর্—"ঈশ্বর! তোমার মহিমা বুঝবার মত ক্ষমতা আমাদের নেই, তুমি কৃপা করে আমাদের জ্ঞাননেত্র খুলে দাও।"

এই বলিয়া তিনি একটি সুন্দর গল্পের মাধ্যমে সত্যের ব্যাখ্যা করিতে লাগিলেন—

—"এক বাগানে একটা আম গাছের নীচে দুই বন্ধু পথশ্রান্ত হয়ে এসে বসলো। ওদের একজন তৎক্ষণাৎ কাগজ পেন্সিল নিয়ে আম গাছের হিসাব-নিকাশ নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। অপর জন প্রকৃত বুদ্ধিমান, সে এসব চিন্তা না করে পাকা আমগুলো তৎক্ষণাৎ পেড়ে খেতে শুরু করলো। সে জানে, আমের হিসাবে তার প্রয়োজন নেই। সে আম খেতে এসেছে। খাওয়ার তৃপ্তিই তার কাম্য। আমাদের সম্পর্কেও ঠিক একই কথা। আমরা ক্ষুদ্র মানুষ, ঈশ্বরের গুণের বিচারে আমাদের কাজ কি? আমরা আনন্দে তাঁর নামসুধা পান করে যদি তৃপ্ত হই, তাই কি পরম লাভ নয়?"

শ্রীরামকৃষ্ণ বলিতে থাকেন—"বাগানে যে দুই বন্ধু এসে ঢুকলো তাদের মধ্যে যে পাকা আমটি খেলো, প্রকৃত লাভবান সে-ই—এ সম্পর্কে কারুর সন্দেহ থাকতে পারে না। সে জানে, অপরের বাগানে স্বল্প-ক্ষণের জন্য এসে হিসাব করতে বসা মূর্খতা।"

ভক্তেরা একবাক্যে মাথা নাড়িয়া তাহার কথা সমর্থন করিলে পরমহংস হাসিয়া বলিলেন—"ওরে, মানুষের জীবনও তো এমনি স্বল্পস্থায়ী। এই সময়ের মধ্যে ঈশ্বরের গুণাগুণ বিচারে সময়ের অপচয় করবি কেন? অনন্ত শক্তির হিসাব কে করতে পারে? তার চাইতে তাঁর নাম-গান করে আনন্দলাভ করলেই বরং জীবনের চরিতার্থতা। সমস্ত প্রাণ-মন সমর্পণ করে তাঁর নাম গান করে যা, তিনিই কৃপা করে তাঁর অনন্ত মহিমার রাজ্য তোর সামনে উন্মোচন করবেন। আমাদের আর হিসেবে প্রয়োজন কি?"

একদিন আমি রামকৃষ্ণের কক্ষে বসিয়া আছি, এমন সময় কলিকাতা হইতে একদল ভক্ত আসিয়া উপস্থিত। এক ভদ্রলোক শ্রীরামকৃষ্ণকে প্রশ্ন করিলেন—"অধ্যাত্ম সাধনায় সদগুরু প্রাপ্তির উপর জোর দেওয়া কি সত্যই অপরিহার্য?"

রামকৃষ্ণ দৃঢ়কণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন—"নিশ্চয়ই, প্রকৃত ভাগ্যবান মানুষ আধ্যাত্মিক জীবনে ঈশ্বরপ্রাপ্ত গুরুর সান্নিধ্য লাভ করে। এ পথে গুরুর করুণা যে সবচেয়ে মূল্যবান সম্পদ। গুরুই শিষ্যকে প্রধানতঃ

এ পথে অগ্রসর হতে সাহায্য করেন, শিষ্যের চেষ্টার তেমন প্রয়োজন নেই। তবে ব্যক্তিগত চেষ্টাও কাজ হয়, কিন্তু গুরুই সেই দুর্গম পথকে উপযুক্ত উপদেশ দিয়ে সুগম করে দিতে পারেন।"

এই বলিয়া তিনি সম্মুখে প্রবাহিনী গঙ্গায় চলমান একখানি বাষ্পীয়পোতের দিকে সমাগত ভক্ত ও দর্শনার্থীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিলেন। তারপর বলিলেন—'আচ্ছা স্টীমারটি চুঁচুড়ায় কখন পৌঁছবে বলতে পার?'

একজন উত্তর দিলেন—"সন্ধ্যা পাঁচটা-ছয়টা হবে।"

রামকৃষ্ণ বলিলেন —"হালটানা নৌকোর সেখানে পৌঁছতে পনের কুড়ি ঘণ্টার বেশী সময় লাগবে। কিন্তু নৌকোটিকে যদি ওই বাষ্পীয় যানটির সঙ্গে জুড়ে দাও তবে সেও ওটার মত অল্প-সময়ের মধ্যেই নির্দিষ্ট স্থানে পৌঁছবে। যারা মুক্তি চায় তাদের ক্ষেত্রেও সেই একই ব্যবস্থা। তুমি যদি গুরুর নির্দেশ ছাড়াই এ পথে চলতে আরম্ভ কর, তা হলে বহু বিঘ্ন বিপত্তি অতিক্রম করে গন্তব্য স্থানে পৌঁছতে তোমার সময় ও পরিশ্রম কম যাবে না। কিন্তু গুরুর সহায়ে সহজে ও স্বল্প সময়ে তা সম্ভব হয়। এই হচ্ছে ধর্মজীবনে গুরু সহায়ের তাৎপর্য।"

অপর একদিন এক ভক্ত তাঁহাকে প্রশ্ন করেন—"জ্ঞান ও ভক্তি দুইয়ের মধ্যে কোনটি বড়?"

সংস্কৃত সাহিত্যে অনভিজ্ঞ সাধকের ব্যাকরণগত ত্রুটি আমার শিক্ষিত মনকে ঝাঁকুনি দেয় সত্য, কিন্তু তাঁহার অনাড়ম্বর সরল ও প্রাণস্পর্শী ব্যাখ্যা আমার মনকে বিশেষভাবে তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট না করিয়া পারে না। সংস্কৃত ব্যাকরণে 'জ্ঞান' ক্লীব লিঙ্গ, কিন্তু নিরক্ষর রামকৃষ্ণ জ্ঞানকে পুরুষরূপে ব্যাখ্যা করিলেন। তিনি বলিলেন—"জ্ঞান পুরুষ, সেজন্য তাকে সকল সময়ই মহামায়ার অন্তঃপুরের বাইরে অপেক্ষা করতে হয়—ভেতরে প্রবেশের অধিকার তার নেই। কিন্তু ভক্তি নারী, মায়ের অন্তঃপুরে তার অবাধ গতি, মায়ের প্রত্যক্ষ সান্নিধ্যলাভে তার কোন বাধাই নেই। জ্ঞানের পথ আয়াস সাপেক্ষ। কিন্তু ভক্তির সরসতা গমন পথকে স্নিগ্ধ করে, পথের বাধার রুক্ষতা দূর করে দেয়।"

জ্ঞানযোগ ও ভক্তিযোগের মত দুরূহ তত্ত্বকে এমন সহজভাবে ব্যাখ্যা করা চলে, এ কথা পূর্বে কখনও ধারণা করিতে পারি নাই। তাঁহার সান্নিধ্যে ইহাই বুঝিয়াছিলাম যে, পরম তত্ত্বের সম্যক উপলব্ধি না হইলে বিশ্বসংসারের সমস্যা কাহারো নিকট এমন সহজ ও সুন্দর হইয়া উঠে না। তাঁহার ব্যাখ্যাত তত্ত্বগুলি এতই প্রত্যক্ষ ও সহজ যে, তাহা যে কোন মানুষই সাধারণ জ্ঞান দিয়া বুঝিতে পারিত।

একদিনের ঘটনার কথা বলি। শ্রীরামকৃষ্ণ গৃহীদের সাধনার কথা বলিতেছেন, এক ভক্ত বলিয়া উঠিলেন—"গৃহীরা ধ্যান-ধারণা করবে কখন? দিবারাত্র সংসারের কাজে তারা মোহগ্রস্ত হয়ে রয়েছে, এ অবস্থায় ভগবদ্ ভজনের অবসর কই?"

শ্রীরামকৃষ্ণ বলিলেন—"এর মধ্যেই হয়। গ্রামদেশের চিঁড়েকুটুনী মেয়েদের দেখেছ? ওরা চিঁড়ে কুটবার সময় একহাতে ঢেঁকির ভেতরে ধান উল্টায়, আর এক হাতে শিশুকে স্তন দেয়; আবার ব্যাপারী এসে তার সাথে চিঁড়ের দর কষাকষি করে। করে সে সব কাজই, কিন্তু মনটি দিয়ে রাখে ঢেঁকির গড়ের দিকে। সে জানে, অন্যমনস্ক হলেই তার হাত ঢেঁকির ঘায়ে চূর্ণ হয়ে যাবে। সংসারী লোকেরা চিঁড়ে কুটুনীর মতই সমস্ত মনটি ঈশ্বরের দিকে রেখে সকল কাজ করে যেতে পারে, তাতেই কাজ হবে।"

সাধক রামকৃষ্ণের সমগ্র জীবনটি ভগবদ্‌সত্তায় এমনই ভরপুর ছিল যে, সেখানে যে কোন বাহ্যিক আচার অনুষ্ঠানই নিতান্ত অপ্রয়োজনীয় ও অপ্রাসঙ্গিক বোধ হইত। আন্তরিকতাহীন অনুষ্ঠান বা অড়ম্বর তিনি পছন্দও করিতেন না।

একদিন ভক্তমন্ডলী পরিবৃত হইয়া তিনি বসিয়া আছেন। কথাপ্রসঙ্গে মালা জপের প্রসঙ্গ উঠিল। একটি ভক্ত পরমহংসকে প্রশ্ন করিলেন—"আচ্ছা দেব-দেবীর নাম স্মরণের জন্য মালা জপের কি সত্যই কোন সার্থকতা আছে?"

রামকৃষ্ণ আত্ম-প্রত্যয়ের সুরে বলিলেন—"হ্যাঁগো, যদি তার পেছনে আন্তরিক ব্যাকুলতা থাকে। কিন্তু আন্তরিকতাহীন নাম জপে কোন ফলোদয়ই হয় না। যেমন ধর, টিয়াপাখীর হরির নাম করা। পোষা

পাখীকে রাধা-কৃষ্ণ বুলি শিখাও, সে পড়তে শিখবে এবং কারণে অকারণে সেই শিখানো বুলি পড়ে শ্রোতাদের চমৎকৃত করবে। কিন্তু যদি কোন দিন তাকে বেড়ালে আক্রমণ করে, তখন কিন্তু তার মুখ দিয়ে আর রাধা-কৃষ্ণবুলি বার হবে না। সে তখন প্রাণ ভয়ে মাতৃভাষায় 'ক্যাঁ' 'ক্যাঁ' শব্দই করতে থাকবে। তার কারণ রাধাকৃষ্ণ তার শেখা বুলি, অন্তরের কথা নয়, সে জন্যই সে সঙ্কটকালে সে বুলি ভুলে যায়।"

তিনি বলিয়া চলিলেন—"আন্তরিকতা ও ব্যাকুলতাহীন ধর্মাচরণকারীদের অবস্থা টিয়াপাখীর মতই হয়ে থাকে। ধর্মানুষ্ঠান তাদের জীবনের বহিরঙ্গ ব্যাপার, তাই সঙ্কটমুহূর্তে তারা টিয়াপাখীর মতই এটা বিস্মৃত হয়ে যায় —ফলে ধর্মের মুখোস খুলে স্বরূপ প্রকাশ পায়। বিশ্বাস বা ভক্তির জোর না থাকলে ধর্মের ভাব অল্প আঘাতেই ছুটে যায়। যে বিশ্বাস জীবনের সঙ্কটকালে টিকে থাকতে পারে না সে আবার বিশ্বাস নাকি?"

এরূপ ধরনের কথা বহুবারই শুনিয়াছি। কিন্তু তত্ত্বদর্শী ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষের সহজ ব্যাখ্যার মধ্য দিয়া তাহার প্রত্যক্ষতা নূতনরূপে লইয়াই প্রত্যেকটি ভক্তের অন্তর স্পর্শ করিল।

রামকৃষ্ণ পরমহংসের সহিত কথোপকথনের বহু স্মৃতি মনের দ্বারে ভিড় করিতেছে। সকল কথা বলিতে হইলে প্রবন্ধের দীর্ঘতা বৃদ্ধি পাইবে বলিয়া সে ইচ্ছা ত্যাগ করিলাম। আমার প্রতি প্রেমিক শ্রীরামকৃষ্ণের গভীর স্নেহ প্রদর্শনের কয়েকটি ঘটনা বলিয়া এ রচনা শেষ করিব। সংসারী মানুষের ভালবাসা প্রয়োজনের সীমায় বদ্ধ, কিন্তু তাঁহার স্নেহ যেন স্রোতস্বিনী, আপন গতিতেই উহা পরিপূর্ণ ও সার্থক। তাঁহার এই অহেতুকী স্নেহের ধারায় আমার জীবন ধন্য হইয়াছে। ছোট্ট একদিনের একটি ঘটনা বলিতেছি।

ব্রাহ্ম সমাজের প্রচার কার্য লইয়া ব্যস্ত থাকায় আমি কিছুকাল দক্ষিণে-শ্বরের দিকে যাইতে পারি নাই। শ্রীরামকৃষ্ণ প্রায়ই আমার সংবাদ লইতে কোন না কোন ভক্তকে পাঠাইতেন, আমাকে তাঁহার নিকট যাইতে বলিতেন। আমিও যাইব বলিয়া প্রায়ই প্রতিশ্রুতি দিতাম কিন্তু নানা কার্যের

মধ্যে তাহা রক্ষা করা সম্ভব হইত না। অবশেষে স্নেহপরায়ণ পরমহংস একদিন অন্যত্র যাইবার পথে আমার বাসায় উপস্থিত হন।

আমার কাছ ঘেঁষিয়া ব্যাকুলকণ্ঠে তিনি বলিলেন—"কি গো, আমার কথা বুঝি তোমার মনে পড়ে না! যাব, যাব, বল—অথচ যাওনা। ব্যাপার কি তোমার?"

উত্তরে বলিলাম—"সমাজের কাজ নিয়ে বড় ব্যতিব্যস্ত আছি। সেজন্য ইচ্ছা সত্ত্বেও যেতে পারি নি।"

শিশুর মত রুষ্ট ও অভিমানহত হইয়া তিনি বলিয়া উঠিলেন—"চুলোয় যাক তোমার ব্রাহ্মসমাজ। যে কাজ করলে বন্ধুর সাথে দেখা করা যায় না অমন কাজ করে লাভ কি?"

একটু হাসিয়া আমার মুখের দিকে তাকাইয়া হঠাৎ তিনি কৌতুকপূর্ণ ভঙ্গীতে বলিলেন—"কি মজা হয়েছে জান? আমি যখন তোমার বাড়ি আসছি, তখন আমারই একজন ভক্ত আমায় বলে—'আপনি একজন ব্রাহ্মের বাড়ি যাচ্ছেন কেন? তিনি এমন কি পদস্থ ব্যক্তি যে আপনি নিজে তাঁর কাছে যাবেন?'—আমি উত্তরে তাদের কি বলেছি জান?"

আমার সপ্রশ্ন দৃষ্টি দেখিয়া পরমহংস বলিলেন—"আমি বললাম, দেখো, আমি সবার সেবক।"

দমদমের এক বাগানবাড়িতে ব্রাহ্মসমাজের এক উৎসবে আহূত হইয়া শ্রীরামকৃষ্ণ সেখানে উপস্থিত হন। আমার সেখানে পেঁছিতে কিছু বিলম্ব হয়। আমি পেঁছিয়া দেখি তিনি শিষ্য ও ভক্তবৃন্দ পরিবৃত হইয়া কীর্তনানন্দে নৃত্য করিতেছেন ও নামে বিভোর হইয়া আছেন। সেই অবস্থায় আমাকে দেখিয়া তিনি ক্ষিপ্রগতিতে আমার নিকট আসিলেন ও আমাকে বুকে জড়াইয়া ধরিলেন।

অতঃপর স্নেহমাখা স্বরে বলিতে লাগিলেন—"তুমি আসনি, তাই এতক্ষণ এত আনন্দের মধ্যেও যেন কিসের অভাব বোধ হচ্ছিল, এখন আমার মন পূর্ণ আনন্দ লাভ করেছে।" ইহা বলিয়াই শ্রীরামকৃষ্ণ দ্বিগুণ উৎসাহে নাম-গান ও নৃত্যে মগ্ন হইয়া গেলেন।

আরও একটি ঘটনা মনে পড়িতেছে। অনেকদিন পর সেদিন দক্ষিণে-

শ্বরে গিয়াছি। পরমহংসকে তাঁহার কক্ষে না দেখিয়া ইতস্ততঃ ঘোরাঘুরি করিতেছি। হঠাৎ যে দৃশ্য দেখিলাম তাহাতে আর বিস্ময়ের সীমা রহিল না। তিনি একটি গাছের নীচে দাঁড়াইয়া তীর-ধনুক সহযোগে একদল কাক তাড়াইতে ব্যস্ত। হাবভাবে মনে হইল সে সময়ে ইহা অপেক্ষা আর কোন কাজই তাঁহার জীবনে বেশী গুরুত্বপূর্ণ নয়।

তাঁহার এই শিশুসুলভ ব্যস্ততা কৌতূহলোদ্দীপক। সহাস্যে প্রশ্ন করিলাম—"কি ব্যাপার ? আপনি দেখছি একজন তীরন্দাজ হয়ে উঠলেন।"

আমার কণ্ঠস্বরে চমকিয়া পিছন ফিরিয়া রামকৃষ্ণ আমাকে দেখিলেন। দীর্ঘদিন পরে দেখা। তাই আমার উপস্থিতি তাঁহাকে বিহ্বল করিয়া তুলিল। তীরধনুক তৎক্ষণাৎ মাটিতে ফেলিয়া তিনি ছুটিয়া আসিলেন ও আমায় বুকে জড়াইয়া ধরিলেন। অল্পক্ষণ মধ্যেই দেখা গেল, তিনি গভীর ভাবাবেশে বাহ্যজ্ঞানহীন হইয়া পড়িয়াছেন। ধীরে ধীরে তাঁহাকে তাঁহার কক্ষে আনিয়া বিছানায় শোয়াইয়া দিলাম।

কিছুক্ষণ শুইয়া থাকিবার পর তিনি সুস্থ হইলেন। অতঃপর তিনি যে কথাটি বলিলেন উহাতে যে কেহ বিস্মিত না হইয়া পারিবে না। তিনি বালকের মত আবদার করিয়া কহিতে লাগিলেন—"ওগো তুমি আমাকে চিড়িয়াখানায় নিয়ে যাবে ? এখানকার একজন আমায় একবার চিড়িয়া-খানায় সিংহ দেখাতে নিয়ে যাবে বলে কথা দেয়, শেষ পর্যন্ত তা রাখে নি।" সাধকের সমস্ত মুখমন্ডলটি তখন এক অকপট কৌতূহল ও বালসুলভ আগ্রহে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে।

তিনি পরম উৎসাহে বলিয়া চলিলেন—"আচ্ছা, তোমার সিংহ দেখতে কেমন লাগে। জগজ্জননীদেবী দুর্গার সাক্ষাৎ বাহন!" বলিতে বলিতে তাঁহার মধ্যে এক অতীন্দ্রিয় অনুভূতি জাগ্রত হইয়া উঠিল। ভাববিহ্বল দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকাইয়া অস্ফুট স্বরে বার বার তিনি বলিতে লাগিলেন—"ওগো, তুমি আমায় সত্যিই নিয়ে যাবে তো ?"

আমি বলিলাম—"সিংহ আমি এর আগে বহুবার দেখেছি। আপনার সঙ্গে থেকে আবার দেখতে পেলে খুসিই হতাম, কিন্তু আজ আমার নানা জরুরী কাজ রয়েছে। তবে আমি আপনাকে আজ সুকিয়া ষ্ট্রীট পর্যন্ত

নিয়ে গিয়ে সেখান থেকে নরেনের সঙ্গে চিড়িয়াখানায় যাবার ব্যবস্থা করে দিতে পারি।"

শেষ পর্য্যন্ত একজন শিষ্য একখানি ভাড়াটিয়া ঘোড়ার গাড়ি ঠিক করিল এবং তাঁহাকে লইয়া সুকিয়া ষ্ট্রীট অভিমুখে রওনা হইলাম। স্থির হইল, মেট্রোপলিটন ইন্‌স্টিটিউশন হইতে নরেন্দ্রনাথ (পরবর্তীকালে স্বামী বিবেকানন্দ) শ্রীরামকৃষ্ণকে সঙ্গে করিয়া চিড়িয়াখানায় লইয়া যাইবেন।

সাধকপুরুষ রামকৃষ্ণের ভাবগম্ভীর অধ্যাত্ম জীবনের সহিতই আমাদের পরিচয় ছিল, সে মানুষ যে এত রসিক এ সংবাদ পূর্বে আমার জানা ছিল না। সেদিন তাঁহার রসিকতা দেখিয়া আমি সত্যই বিস্ময়বোধ করিয়াছিলাম। তিনি গাড়িতে উঠিয়াই আমার বাম পার্শ্বে বসিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। আমি প্রথমে তাঁহার এই ইচ্ছার প্রচ্ছন্ন উদ্দেশ্য বুঝি নাই। তিনি কিন্তু আমার পাশে বসিয়াই যে ভঙ্গি করিলেন তাহা যেমন বিচিত্র তেমনি কৌতুককর। গাড়িটি দক্ষিণেশ্বর মন্দির ছাড়িতেই রামকৃষ্ণ হঠাৎ তাঁহার স্কন্ধের চাদরখানি লইয়া নব পরিণীতা বধূর মত নিজের মাথায় ঘোমটা টানিয়া আমার পাশে আসিয়া বসিলেন। আমি তাঁহার এ আচরণের অর্থ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বধূর মত সলজ্জ দৃষ্টি তুলিয়া সকৌতুকে বলিলেন—"আমি যে তোমার প্রেমিকা। প্রেমিকের সাথে বেড়াতে চলেছি মাথায় ঘোমটা দেব না।"—এই বলিয়া একখানি হাতে আমার কোমর জড়াইয়া অপূর্ব ভঙ্গিতে বসিয়া রহিলেন।

এই কৌতুকের ভাবটি অবলম্বন করিয়াই কিন্তু সাধকের সমগ্র সত্তায় আধ্যাত্মিক ভাবের অবতরণ ঘটিল। সবিস্ময়ে লক্ষ্য করিলাম, এক দিব্য ভাবের ব্যঞ্জনায় ও অপার্থিব আনন্দে তাঁহার সমস্ত মুখমন্ডলটি উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে। ভাবাবেশে তিনি বাহ্যজ্ঞানহীন। মাঝে মাঝে অস্ফুট স্বরে বলিতেছেন—"মা জগজ্জননী, আমার বাহ্যজ্ঞান লোপ করে দিসনে। আমি চিড়িয়াখানায় গিয়ে সিংহ দেখব, আনন্দ করবো। আমায় সে আনন্দ থেকে বঞ্চিত করিসনে।"

—বলিতে বলিতে গভীর ভাবাবেশে বাহ্যচৈতন্যরহিত হইয়া তিনি আমার বাহুতে এলাইয়া পড়িলেন। কিছুক্ষণ পর তিনি ভাবালোক হইতে

নামিয়া আসিলেন ও আবার তাঁহার শিশুসুলভ চপলতা ও সরস কথা-বার্তায় সকলকে আনন্দ দিতে লাগিলেন। ইতিমধ্যে গাড়ি সুকিয়া স্ট্রীটে পৌঁছিলে নরেন্দ্রনাথের দায়িত্বে তাঁহাকে চিড়িয়াখানায় পাঠাইয়া আমি গৃহে প্রত্যাবর্তন করি। একথা উল্লেখ করা প্রয়োজন যে সেই সময় মেট্রোপলিটন ইন্সটিটিউশন সুকিয়া স্ট্রীটে অবস্থিত ছিল।

রামকৃষ্ণের জীবনের শেষ কয়েক বৎসর আমার সহিত তাঁহার খুব অল্পই দেখা হয়—অবশ্য ইহার পিছনে ছিল দুইটি কারণ। প্রথমতঃ এ সময়ে তাঁহার নিকট কয়েকজন নূতন ভক্ত আসেন এবং তাঁহাদের মাধ্যমে তাঁহার সহিত রঙ্গমঞ্চের বেশ কয়েকজন অভিনেতারও যথেষ্ট ঘনিষ্ঠতা জন্মে। উহাদের সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠতা আমার মনে তিক্ততারই সৃষ্টি করে। দ্বিতীয়তঃ, শ্রীরামকৃষ্ণের কয়েকজন শিষ্য তাঁহাকে সর্বশক্তি-মান ঈশ্বর বলিয়া প্রচার করিতে আরম্ভ করেন। আমি এই মতবাদ কোন সময়ই মানিতে পারি নাই। পাছে এই প্রসঙ্গ লইয়া অপ্রীতিকর পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়, এ আশঙ্কায় আমি দক্ষিণেশ্বরে যাতায়াত বন্ধ করি।

অনেকদিন পরের কথা। একদিন আমারই এক বিশেষ পরিচিত ব্যক্তির নিকট রামকৃষ্ণের অসুখের সংবাদ পাইয়া বড় বিচলিত হইয়া পড়ি। সমস্ত কাজকর্ম ফেলিয়া তখনি আমি দক্ষিণেশ্বরের অভিমুখে যাত্রা করি। তখন তাঁহাকে চিকিৎসার্থে স্থানান্তরিত করার কথাবার্তা চলিতেছে। আমাকে দেখিয়া তো কিছুক্ষণ রুদ্ধ অভিমানে চুপ করিয়া রহিলেন। আমি কেন তাঁহার এত অসুখেও দেখিতে আসি নাই ইহা লইয়া বারবার অনুযোগ করিতেও ছাড়িলেন না।

আমার ব্যবহারে তিনি আন্তরিক ব্যথা পাইয়াছেন দেখিয়া আমিও দুঃখিত না হইয়া পারি নাই। আমি অকপটে তাঁহাকে না আসিবার কারণ দুইটি জানাইয়া দিলাম, আরও বলিলাম—"আপনার শিষ্য ও ভক্তেরা আপনাকে ঈশ্বরের এক নতুন সংস্করণরূপে প্রচার আরম্ভ করেছে। বইয়ের নতুন সংস্করণের মত ঈশ্বরের যেন নতুন নতুন সংস্করণ!"

তিনিও ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন—"একবার ভেবে দেখ, সেই সর্বশক্তি-মান ঈশ্বর গলার ক্যান্সারে মরতে বসেছে। এরা কত বড় মূর্খ!"

আমার সহিত শ্রীরামকৃষ্ণের ইহাই শেষ দেখা। ইহার পর চিকিৎসার্থে তাঁহাকে দক্ষিণেশ্বর হইতে স্থানান্তরিত করা হয় এবং অভিজ্ঞ চিকিৎসক-গণের তত্ত্বাবধানে তাঁহার চিকিৎসা চলে, এবং শিষ্যগণও একনিষ্ঠভাবে তাঁহার সেবা করিতে থাকেন। কিন্তু অসুখের নিরাময় হইল না—যথাসময়ে রামকৃষ্ণের মহাত্মা মরজীবনের অধ্যায় সমাপ্ত করিয়া পরলোকে চলিয়া গেল। যে পূতস্মৃতি তিনি রাখিয়া গেলেন, তাহা আজিও শত শত ভক্ত ও মুমুক্ষুর জীবনকে উজ্জীবিত করিতেছে।

তাঁহার সহিত আমার পরিচয় ও ঘনিষ্ঠতার সময় খুব দীর্ঘ নয়, কিন্তু ঐ স্বল্প কালের মধ্যেই উহা গভীর ও আন্তরিক না হইয়া পারে নাই। তাঁহার জীবন ও বাণী আমার চলার পথেও সহায়ক হইয়াছে, আমার জীবনের বহু আধ্যাত্মিক আদর্শকে উহা রসপুষ্ট করিয়াছে। জীবনপথে যে সকল মনীষী ও মহাপুরুষের দর্শন লাভ ঘটিয়াছে, রামকৃষ্ণ পরমহংস অবশ্যই তাঁহাদের মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি।

রামকৃষ্ণ পরমহংস ও ব্রাহ্মসমাজ

আমাদের পূজনীয় আচার্য ব্রহ্মানন্দ যখন বেলঘরিয়া উদ্যানে নির্জন সাধন ভজন করিবার জন্য গমন করিয়াছিলেন, সেই সময়ে আমরা অনেকেই পরমহংসদেবের সহিত পরিচিত হইয়াছিলাম। আমাকে তিনি বড়ই স্নেহ করিতেন। শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত রামকৃষ্ণ-কথামৃত নামে একখানি পুস্তক ও তাঁহার অন্যান্য শিষ্যেরা তাঁহার আধ্যাত্মিক ধর্মের অনেক কথা সাধারণের নিকট প্রকাশ করিয়াছেন; সুতরাং, সেইসকল বিষয় পুনরুক্তি আমার উদ্দেশ্য নহে। তবে আমার সঙ্গে যে সকল কথাবার্তা হইয়াছিল, তাহা সাধারণের পক্ষে অমূল্য জিনিস মনে করিয়া সংক্ষেপে কয়েকটি ঘটনা লিখিয়া প্রকাশ করিতেছি।

রামকৃষ্ণদেব এক অসাধারণ ব্রহ্মশক্তি অন্তরে ধারণ করিয়া বর্ধমানের* এক ক্ষুদ্র পল্লীতে ব্রাহ্মণ বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি লেখাপড়া ভাল করিয়া শিক্ষা করেন নাই। অতীতের পল্লীগ্রামস্থ ছেলেরা যতটুকু লেখাপড়া শিক্ষা করিত, তাহাও অতি সামন্যই শিক্ষা করিয়াছিলেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রানী রাসমনির দক্ষিণেশ্বর ঠাকুরবাটীর পূজারী ব্রাহ্মণ ছিলেন। তাঁহার নিকট তিনি ঠাকুর পূজার্চনা করিবার জন্য আসিলেন। পার্থিব সুখ ঐশ্বর্যের উপর তাঁহার বাল্যকালে অনাস্থা ছিল। প্রথম হইতেই তাঁহার পিতা তাঁহাকে সংসারে আবদ্ধ করিবার জন্য, তাঁহার পরিণয় ক্রিয়া সম্পন্ন করিয়া দিয়াছিলেন। 'বান্দা ভাবেন এক প্রকার আর খোদা করেন অন্য প্রকার।' তাঁহার পিতার বুদ্ধি কৌশল ভগবান একেবারে চূর্ণ বিচূর্ণ পূর্বক তাঁহাকে আত্মত্যাগী সন্ন্যাসী করিয়া মানবের মঙ্গলের জন্য নিযুক্ত করিয়াছিলেন। তিনি ঠাকুর পূজার্চনারূপ বাহ্যিক কার্য পরিত্যাগ করিয়া নিজে নির্জন সাধন-ভজনে নিযুক্ত হইলেন।

যখন ব্রহ্মানন্দ শুনিলেন যে, দক্ষিণেশ্বরের ঠাকুর বাড়িতে রামকৃষ্ণ নামে একজন ভক্ত সাধু অবস্থিতি করিতেছেন, তখন ব্রহ্মানন্দ তাঁহাকে দর্শন করিবার জন্য বেলঘরিয়ার উদ্যানে তাঁহাকে আনয়ন করিলেন এবং

পরস্পরে মুগ্ধ হইয়া উভয়ে একটি আধ্যাত্মিক যোগে আবদ্ধ হইলেন। আমার বোধহয় কেশবচন্দ্রই তাঁহাকে পরমহংস উপাধিতে ভূষিত করিয়াছিলেন। রামকৃষ্ণদেব সেই সময় হইতে ব্রাহ্মসমাজে যাতায়াত করিতে আরম্ভ করিলেন। ব্রাহ্মসমাজের প্রচারক এবং অন্যান্য সাধুচরিত্রের লোক সকল তাঁহাতে বিশেষভাবে আকৃষ্ট হইয়া পড়িলেন। মহর্ষিদেব ও আদি সমাজ দর্শন করিয়া পরমহংসদেব বড়ই আনন্দ প্রকাশ করিলেন। আমি যে সময়ের কথা লিখিতেছি, সেই সময়ে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠা হয় নাই এবং নরেন দত্ত, যিনি পরে বিবেকানন্দ নামে অভিহিত হইয়া সকল নরনারীর পূজনীয় ও আদৃত হইয়া গিয়াছেন, সেই সময়ে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন কিনা জানি না।

রামকৃষ্ণদেব বড়ই শান্ত প্রাকৃতির লোক ছিলেন। স্ত্রী কি পুরুষ, যিনি একবার তাঁহার মুখের কথা শুনিতেন, তিনি তাঁহাকে ছাড়িতে চাহিতেন না। আমি অনেক বৎসর তাঁহার চরণপ্রান্তে বসিয়া অনেক ধর্মোপদেশ শ্রবণ করিয়াছিলাম ; কিন্তু তাঁহাকে কখন কোন সম্প্রদায়ের নিন্দা কি কুৎসা করিতে শুনি নাই। সকল সম্প্রদায়ের লোকদিগকে তিনি আপনার বলিয়া মনে করিতেন। তিনি সর্বদাই আধ্যাত্মিক রাজ্যে বিচরণ করিতেন। তিনি সামান্য বিদ্যা শিক্ষা করিয়াও, নিজে সাধন ভজন ও পরাবিদ্যা দ্বারা পরিচালিত হইয়া সকল প্রকার ধর্মশাস্ত্র হইতে উদাহরণ দিয়া সকলকে ধর্মোপদেশ দিতেন। সামান্য সামান্য চলিত কথা দ্বারা উদাহরণ দিয়া সাধারণ লোকদিগের মনপ্রাণকে আকৃষ্ট করা তাঁহার চরিত্রের একটি বিশেষ লক্ষণ ছিল। তিনি অত্যন্ত তোৎলা ছিলেন। বাহ্যিক বেশভুষার উপর তাঁহার বিন্দুমাত্র দৃষ্টি ছিল না। তিনি সর্বদাই হরিপ্রেমে এমনই মগ্ন থাকিতেন যে, তাঁহার পরিধেয় বস্ত্রখানি অঙ্গে আছে কি না কিংবা কোঁচা কোন দিকে দিতে হইবে, বা বিনামা কোথায়, এই সকলের বাহ্যজ্ঞান একেবারে তাঁহাতে দৃষ্ট হইত না। বস্ত্রখানি কোন প্রকারে অঙ্গে জড়াইয়া লজ্জা নিবারণ করিতেন।

হৃদয় নামে ঠাকুরবাটীর কর্মচারীকে (ইনি সম্বন্ধে পরমহংসদেবের ভাগিনেয় হইতেন) সর্বদাই তাঁহার সেবায় নিযুক্ত থাকিতে দেখিতাম।

রামকৃষ্ণদেব সর্বদা ইঁহাকে 'হৃদেশালা' বলিয়া ডাকিতেন। তিনি 'শালা' কথাটা প্রায়ই সকল ধর্মজিজ্ঞাস্য লোকদিগের প্রতি ব্যবহার করিতেন। আমি একদিন তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম যে, এই কথাটি কেন সকল লোকের প্রতি ব্যবহার করেন? তাঁহাতে তিনি বলিলেন, 'এই সকল লোক একটা হুজুক দেখিবার জন্য ও আমাকে বিরক্ত করিবার জন্য এখানে আসে। কটা লোক ধর্মের কথা শুনিতে আসে? এক কাণ দিয়া শোনে অপর কাণ দিয়া বাহির হইয়া যায়। স্থতরাং উহাদের পরীক্ষা করিবার জন্য এই কথাটি ব্যবহার করি।' লোক পরীক্ষা করিবার তাঁহার একটি বিশেষ শক্তি ছিল। কোন লোক কি উদ্দেশ্যে তাঁহার নিকট আসিতেন, তিনি তাঁহার মুখ দেখিয়া বুঝিতে পারিতেন। বিশেষতঃ—সম্প্রদায়ের লোক তাঁহার নিকট আসিলে তাঁহাদিগকে কর্কশ বাক্য দ্বারা তাড়াইয়া দিতেন। আমি একদিন তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম 'কেন উহাদিগকে তাড়াইয়া দিতে চেষ্টা করেন?' তিনি উত্তর দিলেন, 'উহারা কামিনী-কাঞ্চন লইয়া থাকিতে ভালবাসে, ধর্মের কথা উহারা ভালভাবে চিন্তা করে না, এক কাণ দিয়া শোনে আর অপর কাণ দিয়া বাহির করিয়া দেয়। কেমন জানিস? আমাদের চলিত কথায় বলে, "ধরি মাছ না ছুঁই পানি।" ওরা মাছ ধরিতে চায়, অথচ গাত্রে জল বা কাদা লাগিবে না। ওরা স্ত্রীকে ভাল ভাল রঙিন কাপড় পরাইবে, মুখে ও ঠোঁটে আলতা পরাইবে, ভাল ভাল গহনা পরাইবে, আবার ধর্মের কথা শুনিতে আসে; ধর্ম জিনিসটা কি এত সহজ যে একবার আমার কাছে শুনিলেই ধার্মিক হইয়া যাইবে?' তাহাতে আমি তাঁহাকে বলিলাম, 'আমরাও তো কামিনী-কাঞ্চন লইয়া থাকি, কই আমাদের তো তাড়াইয়া দেন না?' তিনি বলিলেন, 'তোরা আর ওরা সম্পূর্ণ পৃথক। তোদের প্রাণে একটা ব্যাকুলতা আছে, সরলতা আছে, স্বার্থত্যাগ আছে, তোরা একদিন না একদিন কামিনী-কাঞ্চন ছাড়িতে পারিবি কিন্তু ওরা কখনও পারিবে না। দেখ না তোদের ভিতর শিবনাথ কি প্রকার স্বার্থত্যাগ করিয়াছে।' এই প্রকার কত কথা সেই মহাত্মা সিদ্ধপুরুষের চরণপ্রান্তে বসিয়া শুনিতাম, তাহা এখন স্মরণ করিয়া লেখা আমার পক্ষে অসম্ভব। তবে নিতান্ত যাহা সাধারণের পক্ষে

অমূল্য এবং তাঁহার শিষ্যগণ এতদিন বোধ হয় জানিতে পারেন নাই, তাহাই লিখিতেছি।

পরমহংসদেব সংকীর্তন করিতে ভালবাসিতেন। তাঁহার কণ্ঠের স্বরও বেশ সুমধুর ছিল, কিন্তু তিনি কথা বলিবার সময় যে প্রকার তোৎলা কথা বলিতেন, কীর্তনের সময় তাহা থাকিত না। তিনি কালীভক্ত ছিলেন; কারণ, যখনই কীর্তন করিতেন, কালী-কীর্তন করিতেন, তিনি কীর্তন করিতে করিতে ভাবাবেশে একেবারে অজ্ঞান হইয়া পড়িতেন। আমি অনেকবার তাঁহার ভাবাবেশ দেখিয়াছি। তাঁহাকে সজ্ঞান করিবার একমাত্র ঔষধ ছিল "ওঁ" বা "ওঁ ব্রহ্ম।" তাঁহার কাণের কাছে দুই চারিবার "ওঁ ব্রহ্ম" নাম উচ্চারণ করিতে করিতে তিনি ক্রমে ক্রমে সজ্ঞান হইতেন। আমি যখন ২৮নং ঝামাপুকুরে ভক্ত বিজয়কৃষ্ণ ও উমেশচন্দ্রের সহিত সপরিবারে বাস করিতাম, তখন সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। পরমহংসদেব নরেনকে সঙ্গে লইয়া প্রায়ই আমাদের ওখানে আসিতেন এবং গোস্বামী মহাশয়ের সহিত একত্র কীর্তন করিতেন। উপস্থিত শ্রোতাগণ সেই অপরূপ ভক্তি ও প্রেমের লীলা দর্শন করিয়া সকলেই আত্মহারা হইয়া যাইতেন। সেই অতীতের ভক্তগণের প্রেমলীলা কি জীবনে আর দেখিতে পাইব!

অতীতকালে ব্রাহ্মসমাজে একদিকে ব্রহ্মানন্দ, বিজয়কৃষ্ণ প্রভৃতি প্রচারকগণ এবং অন্যান্য ভক্তগণ, অপরদিকে রামকৃষ্ণ, এই উভয়ের সম্মিলনে এক অপূর্ব প্রেম ও ভক্তির স্রোত ব্রাহ্মসমাজে প্রবাহিত হইয়াছিল। পরমহংসদেব ব্রাহ্মসমাজে যাতায়াত করিতে করিতে তাঁহার প্রাণেও একটি অভূতপূর্ব অজ্ঞাত আকাংখা পরিলক্ষিত হইয়াছিল, যাহা পাঠক-পাঠিকা সকলে তাঁহার মুখ নিঃসৃত নিম্নলিখিত বাক্য হইতে বুঝিতে পারিবেন। তিনি প্রায়ই ব্রাহ্মসমাজের উৎসবে আসিয়া যোগদান করিতেন। বিশেষতঃ সিন্দুরিয়াপটী মণিলাল মল্লিকের বাটীতে যে বাৎসরিক উৎসব হইত, তাহাতে আসিতে তিনি বড়ই ভালবাসিতেন। কেন না, সেখানে কোন বৎসর ব্রহ্মানন্দ, কোন বৎসর শাস্ত্রী মহাশয় উপাসনা করিতেন। এইরূপে ব্রাহ্মসমাজের উপাসনার ভিতর প্রবেশ করাতে তাঁহার অন্তরে একটি উচ্চ-

আদর্শ প্রকাশিত হইয়াছিল। একদিন তিনি বলিলেন, 'ওরে ত্রৈলোক্য, তোদের উপাসনা খুব ভাল, কেবল একটা আমার ভাল লাগে না।' আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, 'কি বিষয় আপনার ভাল লাগে না?' তিনি বলিলেন, 'তোরা ভগবানকে বড় খোসামোদ করিস। এত খোসামোদ আমি ভালবাসি না।' তাঁহাকে আমি বলিলাম, "ভগবানের আরাধনা করিতে হইলে, তাঁহার স্বরূপসকল ভাল করিয়া ব্যাখ্যা না করিলে, উপাসকমণ্ডলী হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন না বলিয়াই আচার্য এমন করিয়া সরল ভাষায় বুঝাইয়া দেন।' তাহাতে তিনি বলিলেন, 'অত বেশী করিয়া বলিবার দরকার নাই।'

আমি প্রায়ই পূর্ণিমার দিন সন্ধ্যার সময় তাঁহার সহবাস লাভ করিবার জন্য দক্ষিণেশ্বরে যাতায়াত করিতাম। যখনই তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎ হইত, তখনই বলিতেন, 'তোদের মহর্ষি ও কেশব এক একটা লোক'—অর্থাৎ প্রকৃত মানুষ। আবার কিছুদিন পরে বিজয়কৃষ্ণ, অঘোর ও শিবনাথের নাম করিয়া বলিলেন যে 'উহারা এক একটা লোক।' এইরূপে তিনি বলিতেন, আমি শুনিতাম। তিনি কালী কীর্তন করিতে করিতে অচেতন হইতেন, আবার "ওঁ ব্রহ্ম" নাম শুনিতে শুনিতে সচেতন হইতেন। এই উভয় ব্যাপারে আমার মনে একটা খট্‌কা বা সন্দেহ আসিয়া উপস্থিত হইল।

একদিন সন্ধ্যার অগ্রে আমি দক্ষিণেশ্বরে গিয়া দেখি যে, পরমহংসদেব সুন্দর বেশভুষায় ভুষিত হইয়া অর্থাৎ কালাপেড়ে কোঁচান কাপড় পরিয়া বসিয়া আছেন এবং সম্মুখে একজোড়া চিনের বাড়ির বার্ণিশ করা চটিজুতা রহিয়াছে। আমি তাঁহাকে দেখিয়া কিছুক্ষণ অবাক্ হইয়া সম্মুখে দাঁড়াইয়া রহিলাম। তাহাতে তিনি আমার দিকে তাকাইয়া বলিলেন, 'ঐ হৃদে শালা আজ আমাকে বাবু সাজাইয়াছে—তুই এখানে বস্।' আমি বসিলে তিনি তাঁহার বাবু-আনার ব্যাখ্যা আরম্ভ করিয়া বলিলেন, "কেমন জানিস, কাঁঠাল ভাঙিবার অগ্রে যদি হাতে তৈল দিয়া ভাঙা যায়, তাহা হইলে আঠা আর হাতে লাগে না। তোদের বাবু-আনা আর আমার বাবু-আনা দুটো আলাদা জিনিস; তোরা বাবু-আনা করতে একেবারে জড়িয়ে মরিস, আর আমার কিছুই হয় না।' বাস্তবিক ভক্তের

কথা কি কখন মিথ্যা হয়? কিছুক্ষণ পরে উপস্থিত ধর্মাপিপাসু ব্যক্তিগণ যখন তাঁহার সঙ্গে ধর্মালাপ করিতে আরম্ভ করিলেন কোথায় তাঁহার সুন্দর কোঁচান বস্ত্র, আর কোথায় বা তাঁহার বিনামা? সকলই বিশৃংখল অবস্থায় আসিয়া উপস্থিত হইল। আর একদিন বসিয়া তাঁহার সহিত ধর্মালাপ করিতেছি, এমন সময় হঠাৎ আমাকে বলিলেন, 'ওরে আমার মা আমার সেবা করিবার জন্য আসিয়াছে,ঐ ঘরের ভিতর আছে, তুই একবার আমার মাকে দেখ।' আমি বলিলাম, 'আপনার মা তো অনেকদিন স্বর্গারোহণ করিয়াছেন, এখন আপনার মা কোথা হইতে আসিলেন?' তিনি বলিলেন, 'জগতের স্ত্রীলোকমাত্রই আমার মা।' তখন আমি বুঝিতে পারিলাম উঁহার সহ-ধর্মিণী আসিয়াছেন। আমি বলিলাম, 'আপনি তো স্ত্রীলোকদিগকে উপদেশ দেন যে, "পতি সেবাই তাঁহাদের পরম ধর্ম।" উঁনি পতিসেবার জন্য আসিয়াছেন, ইহাতে তো আপনি উঁহাকে বঞ্চিত করিতে পারেন না।' তখন তিনি বলিলেন, 'আমার সে অবস্থা অতীত হইয়াছে। তবে আমি উঁহাকে বলিয়াছি, দূরে দূরে থাকিয়া আমার সেবা যতটা পার করিও, কিন্তু কখন আমার অঙ্গ স্পর্শ করিও না।' বাস্তবিক আমি দেখিয়াছিলাম তিনি সিদ্ধাবস্থায় উপস্থিত হইয়াছেন।

আর একদিন সন্ধ্যার সময় দক্ষিণেশ্বরে তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলাম, কত সস্নেহে আমাকে কাছে বসাইয়া কত ভাল ভাল ধর্মের কথা শুনাইলেন। তাঁহার কাছে বসিলে আর উঠিতে ইচ্ছা হইত না। এমন সময়ে কালীর মন্দিরে আরতি আরম্ভ হইল। আমার অনেকদিনের ইচ্ছা ছিল যে একবার আরতি দেখিব। আমি তাঁহাকে বলিলাম, 'আপনার সঙ্গে গিয়া আজ কালীর আরতি দেখিব বড় ইচ্ছা হইয়াছে।' তাহাতে তিনি বলিলেন, 'তুই ব্রাহ্ম, কালীর আরতি দেখবি কি করে?' আমি বলিলাম, 'দেখতে দোষ কি? আপনি আসুন, একত্রে যাইয়া দেখিয়া আসি।' তিনি বলিলেন, 'আমি ঐ শালীর মুখ আর দেখি না, তুই একলা গিয়ে দেখে আয়।' আমি বলিলাম, 'আমি ব্রাহ্ম, যদি কেহ কিছু বলে, সেই জন্য আপনার সঙ্গে যাইতে ইচ্ছা।' তিনি কোন প্রকারে যাইতে স্বীকৃত হইলেন না। তখন তিনি আমাকে বলিলেন, 'তুই নীচে

জুতা রাখিয়া উপরে গিয়া আরতি দেখিস, কেহ কিছু বলিবে না।' আমি তাঁহার আদেশমত কার্য করিয়া আরতি দেখিয়া ফিরিয়া আসিলাম। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, 'ওরে কেমন দেখলি?' বলিলাম, 'বড় সুন্দর'। ইহাতে আমার মনটা বড় অস্থির হইল, কেবলই মনে হইতে লাগিল পরমহংসদেব এত কালীভক্ত, কেন কালীর আরতি দেখিতে গেলেন না? পরদিন খুব প্রত্যুষে উঠিয়া গঙ্গার ধারে সুন্দর বাঁধান চাতালে বসিয়া সঙ্গীত ও উপাসনা করিতেছি, এমন সময়ে একটি লোক আসিয়া আমাকে বলিল, 'পরমহংসদেব আপনাকে ডাকিতেছেন।' আমি তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলে, তিনি গাড়ুটি হস্তে লইয়া আমাকে বলিলেন, 'তুই আমার সঙ্গে আয়।' আমি বলিলাম, 'আপনি বাহ্যে যাইতেছেন, আমি আপনার সঙ্গে কোথায় যাইব?' তিনি বলিলেন, 'তুই আমার সঙ্গে আয় না। আমি তাঁহার অনুসরণ করিলাম তিনি উত্তরদিকে ফটক হইতে বাহির হইয়া সম্মুখে একটি বাঁধান বটগাছের ধারে গেলেন এবং গাড়ুটি নিম্নে রাখিয়া সেই বাঁধান রকে ঠেশ দিয়া দাঁড়াইলেন এবং নিম্নলিখিত অনন্ত সাধারণ অলৌকিক কথাসকল বলিতে লাগিলেন পাঠক-পাঠিকা ও তাঁহার প্রিয় শিষ্যগণ, এই সকল কথা--যাহা স্মরণ করিলে সর্বশরীর কম্পিত ও ও রোমাঞ্চিত হইয়া উঠে তাঁহার সাধনের চরমাবস্থার কথা ও তাঁহার মুখনিঃসৃত ব্রহ্মবাণী—সকলে শ্রবণ করুন।

তিনি স্বর্গের দেবতা, স্বর্গের কথাসকল বলিতে লাগিলেন, আমি তাঁহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া শুনিতে লাগিলাম: 'দেখ্ ত্রৈলোক্য, কাল যে তুই আমাকে আরতি দেখিবার জন্য বলিয়াছিলি, আমি অনেকদিন ধরিয়া ঐ শালীর মুখ দেখি না।' আমি বলিলাম', 'কেন দেখেন না?' তিনি বলিলেন, 'অনেকদিন ধরিয়া ঐ শালী আমাকে ঘুরাইয়া লইয়া বেড়াইতেছিল, আমাকে ঠিক পথ দেখাইয়া দেয় নাই, সেইজন্য আমি ওর মুখ দেখি না।' তারপর তিনি বলিতে লাগিলেন, 'দেখ, ঐ যে ভাঙা চালাঘর দেখছিস ঐ ঘরে আমি মুত মাখিয়া পড়িয়া থাকিতাম আর হৃদে আসিয়া আমাকে পরিষ্কার করিয়া দিত এবং আমাকে আসিয়া খাওয়াইত। এই রূপে অনেকদিন যাবৎ তাঁহাকে পাইবার জন্য ডাকিতেছিলাম। এমন সময়ে

একদিন গভীর রাতে কে যেন আসিয়া আমাকে ডাকিল—"তোকে ঐ গঙ্গার ধারে, তোর অনেকদিনের বাঞ্ছিত ধন দেখিবার জন্য কে ডাকিতেছেন।" আমি কোন প্রকার বিলম্ব না করিয়া তাঁহার অনুসরণ করিয়া গঙ্গার ধারে গিয়া উপস্থিত হইলাম। আবার কে যেন বলিল, "আর একটু নীচে আয়, এখানে বস্।" আমি বসিলাম, চক্ষু মুদ্রিত করিলাম, আমার মনে অভুতপূর্ব আনন্দ সঞ্চার হইল। তৎপরে আমাকে বলিলেন, "তোর চিরবাঞ্ছিত তপস্যার ধন একবার দেখ।" আমি দেখিলাম যে, এক অপূর্ব জ্যোতির্ময় রূপ আমার প্রাণ মনকে এক আশ্চর্য জ্যোতিতে পরিপূর্ণ করিল। অল্পক্ষণ প্রকাশিত হইয়া আবার কোথায় চলিয়া গেলেন। আমি আবার দেখিবার জন্য প্রার্থনা করিলাম যে. আর কি দেখা দিবে না? তাঁহার উত্তর পাইলাম, "তুই যখন ডাকবি আমাকে পাইবি"।' পরমহংসদেব যখন এই সকল কথা আমাকে বলিতেছিলেন তখন তাঁহার দুইগণ্ড দিয়া প্রেমাশ্রু প্রবাহিত হইতেছিল। আমি সেই সময় সেই সিদ্ধপুরুষের মুখের এক অপরূপ সৌন্দর্য দর্শন করিয়া গলদশ্রু লোচনে কম্পিত ও রোমাঞ্চিত হইয়া তাঁহার চরণতলে বসিয়া পড়িলাম। আবার বলিলেন, 'এমন সৌন্দর্য আমি মুখে বলিয়া প্রকাশ করিতে পারি না, আমি ধন্য হইয়াছি।' যখন এই সকল কথা তাঁহার মুখ হইতে শুনিলাম, তখন আমার পূর্ব দিনের মনের খট্‌কা বা সন্দেহ একেবারে কোথায় চলিয়া গেল। এখন পাঠক-পাঠিকা ও তাঁহার প্রিয় শিষ্যগণ, এই যোগসিদ্ধ মহাপুরুষের ব্রহ্মদর্শন একবার চিন্তা করুন। কিন্তু সাম্প্রদায়িক গণ্ডীর ভিতব বসিয়া অপরা শক্তিদ্বারা পরিচালিত হইয়া এই সিদ্ধপুরুষকে কেহ চিনিতে পারিবেন না। অতীতের ব্রাহ্মসমাজ একদিকে রামকৃষ্ণদেব অপরদিকে ব্রহ্মানন্দ, মহর্ষি প্রভৃতি সিদ্ধপুরুষদিগের আদান-প্রদান ও ঘাত-প্রতিঘাতে এক স্বর্গীয় সৌন্দর্য ধারণ করিয়াছিল। পরমহংসদেবের মন্ত্রশিষ্য আমি কখন দেখি নাই। তিনি সকল সম্প্রদায়ের লোকদিগকে সাধারণ হিতকর উপদেশ দিতেন। চরিত্রের বিশুদ্ধতা, সত্যপরায়ণতা, সরলতা, কার্যে একনিষ্ঠতা, মানবের সেবা ও স্বার্থত্যাগ তাঁহার উপদেশের সার ছিল। সেই মুক্ত যোগী

রামকৃষ্ণদেবের ধর্মপ্রভাবে আজ তাঁহার ভক্তগণ নিজ নিজ সুখ-স্বাচ্ছন্দতা, পিতামাতা, ভাই-ভগ্নী আত্মীয়স্বজন পরিত্যাগ করিয়া নরনারীর সেবার জন্য এই ভারতের নানা স্থানে দীন-দুঃখী আতুরদিগের জন্য অনাথাশ্রম সকল প্রতিষ্ঠা করিয়া সাধারণ নরনারীর কত প্রীতি ও শ্রদ্ধার পাত্র হইয়াছেন। প্রায় ৫০ বৎসর পূর্বে তাঁহার যে সকল উক্তি আমি শুনিয়া খাতায় লিখিয়া রাখিয়াছিলাম তন্মধ্যে কয়েকটি অমূল্য জিনিস নিম্নে লিখিয়া জানাইতেছি :

পরমহংসদেবের উক্তি

তিনটি টান একত্র হইলে ভগবানকে লাভ করা যায়। প্রথম—বিষয়ীর বিষয়ের প্রতি টান। দ্বিতীয়—সতীর পতির প্রতি টান। তৃতীয়—মায়ের সন্তানের প্রতি টান। এই তিনটি টান একত্র হইলে ভগবানের সহিত সাক্ষাৎ হয়।

ভালমন্দ জীবেরই পক্ষে, সৎ অসৎ জীবেরই পক্ষে, ঈশ্বরের ওতে কিছু আসে যায় না। যেমন আলোর সম্মুখে কেহ ভাগবত পড়িতেছে, কেহ বা জাল করিতেছে, কিন্তু প্রদীপ নির্লিপ্ত। সূর্য শিষ্টের উপর আলো দেয়, আবার দুষ্টের উপরও আলো দেয়। যদি বল দুঃখ, পাপ, অশান্তি এ সকল কি ? ওসব জীবেরই পক্ষে ; ব্রহ্ম নির্লিপ্ত। সাপের ভিতর বিষ আছে, অন্যকে কামড়াইলে মরিয়া যায়, কিন্তু সাপের কিছুই হয় না।

ব্রহ্ম জিনিসটি আজ পর্যন্ত কেহ এঁটো করিতে পারিল না ; কারণ, ইহা যে কি বস্তু কেহ মুখে বলিয়া শেষ করিতে পারেন নাই। বেদ, পুরাণ, তন্ত্র সমস্তই এঁটো হইয়াছে। কারণ, এই সকল মুখে উচ্চারণ করিয়া পড়া হইয়াছে।

ব্রহ্ম দর্শন হইলে মানুষ নিস্তব্ধ হইয়া যায়, যতক্ষণ দর্শন না হয় ততক্ষণ বিচার। ঘি কাঁচা যতক্ষণ থাকে, ততক্ষণ কলকলানী। ঘি পাকিয়া গেলে আর শব্দ থাকে না।

* হুগলী জেলার কামারপুকুর গ্রামে শ্রীরামকৃষ্ণের জন্ম হয়। —সম্পাদক।

যতক্ষণ মৌমাছি ফুলে না বসে ততক্ষণ ভন ভন করে; কিন্তু একবার ফুলে বসিলে চুপ হইয়া যায়।

পুকুরে কলসীতে জল ভরিবার সময় ভক্ ভক্ শব্দ হয়; কিন্তু কলসী ভর্তি হইলে আর শব্দ থাকে না।

পরমহংসদেবের প্রধান শিষ্য, শ্রীমান নরেন্দ্রনাথ দত্ত (যিনি পরে বিবেকানন্দ নামে বিখ্যাত হইয়াছিলেন), যখন প্রথমে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ স্থাপিত হয় তখন হইতে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজে আসিয়া উপাসনা করিয়া যাইত। নরেন ভাল সংগীত করিতে পারিত; তাঁহার কন্ঠের স্বর বেশ সুমিষ্ট ছিল, সমাজে প্রায়ই সে সংগীত করিত। সে শাস্ত্রী মহাশয়, বিজয়বাবু ও নগেন্দ্রবাবুর বিশেষ ভক্ত ছিল। সেই সময়ে পরমহংসদেব প্রায়ই সাধারণ সমাজে আসিতেন, এবং শাস্ত্রী মহাশয় ও বিজয়বাবুর সংগে ধর্মালাপ করিতেন। রামকৃষ্ণদেবের এইভাবে সাধারণ সমাজে যাতায়াত এবং শাস্ত্রী প্রভৃতির সহিত ধর্মালাপ এই সকল দেখিয়া নরেন পরমহংস-দেবের শিষ্য হইয়াছিল।

এক দিবস পূর্ণিমার দিন বৈকালে পরমহংসদেবকে দর্শন করি-বার জন্য দক্ষিণেশ্বরে উপস্থিত হইয়া দেখি যে, কয়েকটি ভক্ত তাঁহাকে ঘিরিয়া ধর্মালাপ করিতেছেন। আমি গিয়া দেখিলাম যে ধর্মালাপটি বেশ জমাট বাঁধিয়া গিয়াছে। আমি এক পার্শ্বে বসিবামমাত্র পরমহংস দেব আমাকে দেখিয়া সম্মুখে বসিবার জন্য অনুরোধ করিলেন। তিনি আমাকে বড়ই স্নেহ করিতেন, সুতরাং বাধ্য হইয়া তাঁহার সম্মুখে গিয়া বসিলাম। সেই সময়ে ধর্মালাপটি এই প্রকার চলিতেছিল যে, 'মানুষ সাধনা দ্বারা কি প্রকারে ভগবানকে লাভ করে।' তিনি বলিতে লাগিলেন, 'তিনটি জিনিষ সাধনার মত সাধন করিলে মানবপ্রাণে ভগ-বানকে পাইবার জন্য একটা টান হয়। সেই টানটি প্রকৃত হইলে ভগবান আবার তাহাকে টানিয়া লন, তখন উভয়ের টানাটানিতে ভক্ত চুপ হইয়া যায়; তখন আর ভক্তের ভনভনানি, কলকলানি ও ভক্‌ভকানি শব্দ থাকে না।' আমি বলিলাম, 'ইহার অর্থ কিছুই বুঝিতে পারিলাম না, আপনি ভাল করিয়া বুঝাইয়া দিন।' তিনি বলিলেন, 'তোদের সমাজে

এ প্রকার ভক্ত অনেক আছেন, তুই জানিস না ?' তৎপরে তিনি উপস্থিত সকলকে বুঝাইতে লাগিলেন। 'কেমন জানিস—

সতীর, পতির প্রতি যেমন টান।
মাতার, সন্তানের প্রতি যেমন টান।
বিষয়ীর, বিষয়ের প্রতি যেমন টান।

এই তিনটি টানের মত মানব ব্যাকুল হইয়া সাধনা করিলে ভগবানকে আত্মস্থ করিয়া চুপ হইয়া যায়।' আমি বলিলাম, 'ভনভনানি, কলকলানি ও ভকভকানি কি বলিলেন, বুঝাইয়া দিন।' তিনি বলিলেন, 'দেখ—মৌমাছি ফুলের মধু যতক্ষণ না পায় ততক্ষণ ভনভন করিয়া বেড়ায়, যেই মধু পায় অমনি চুপ হইয়া যায়। তৈল কড়ায় দিয়া জাল দিলে যতক্ষন কাঁচা থাকে ততক্ষণ কলকল করিয়া শব্দ হয়; যেই গাঁজা মরিয়া পাকিয়া যায় আর শব্দ থাকে না। পাড়াগাঁয়ের মেয়েরা কলসী কাঁকে করিয়া পুকুরে জল আনিতে যায় কলসীটি যতক্ষণ না পূর্ণ হয়, ততক্ষণ ভকভক করিয়া শব্দ হয়, আর যেই উহা জলে ভরিয়া যায় অমনি শব্দটি বন্ধ হইয়া যায়। ভক্তের অবস্থা ঠিক এই প্রকার হয়।'

তৎপরে আমি আবার জিজ্ঞাসা করিলাম, 'আপনি আমাদের সমাজে ভক্তের কথা কি বলিলেন, তাহা বলুন।' তিনি বলিলেন, 'তাও আবার তোকে বলিতে হইবে, তবে বলি শোন। ঐ দেখ তোদের দেবেন্দ্রনাথ অত ধনৈশ্বর্যের ভিতর থাকিয়া পদ্মপত্রের জলের মত নিজেকে নির্লিপ্ত রাখিয়া সাধনা দ্বারা ব্রহ্মকে হৃদয়স্থ করিয়া চুপ হইয়া গিয়াছে। ঐ তোদের কেশব, ঐ তোদের বিজয়, ঐ তোদের অঘোর আর কত কত নাম করিব ? আর তোদের শিবনাথ এখন টানটানির ভিতর আছে, শীঘ্র চুপ হইয়া যাইবে।' তিনি শিবনাথকে বড়ই ভালবাসিতেন। ভক্ত রামকৃষ্ণের একটা ঐশ্বরিক শক্তি ছিল যে লোকের মুখ দেখিলেই সে ভক্ত কি অভক্ত সহজে চিনিতে পারিতেন। তিনি ব্রাহ্মসমাজের ভক্তদিগকে ভালরূপে চিনিতে পারিয়াছিলেন বলিয়া উপরের কথাগুলি বলিয়া অন্তরের ভাব ব্যক্ত করিয়াছিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণের স্মৃতিচারণ

সম্ভবত ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দে পূজার ছুটির সময় শ্রীরামকৃষ্ণকে আমি প্রথম দর্শন করি। সেইদিন কেশব বাবুর আসার কথা ছিল। আমি নৌকাযোগে দক্ষিণেশ্বরে গিয়াছিলাম। খেয়াঘাটের সিঁড়ি দিয়া উঠিতে উঠিতে একজনকে জিজ্ঞাসা করিলাম—"পরমহংস কোথায় থাকেন।" বাগানমুখী উত্তর দিকের বারান্দায় তাকিয়ায় হেলান দেওয়া অর্ধশয়ান অবস্থায় এক ব্যক্তিকে দেখাইয়া তিনি আমাকে বলিলেন—"ঐ তো পরমহংস!" তাকিয়ায় হেলান দেওয়া কাল পাড়ের কাপড় পরিহিত ব্যক্তিটিকে যখন দেখিলাম তখন আমার মনে হইল—"ইনি আবার কোন ধরণের পরমহংস?" তিনি তাকিয়ায় হেলান দিয়া হাঁটু মোড়াইয়া তাহা দুই হস্তে জড়াইয়া ধরিয়া বসিয়া আছেন। তখন আমি ভাবিলাম—"ইনি নিশ্চয়ই ভদ্রলোকেদের মত তাকিয়া ব্যবহারে অভ্যস্ত নন এবং হয়তো এজন্যই তিনি পরমহংস।" তাঁহার ডান দিকে তাকিয়ার নিকট একজন ভদ্রলোক বসিয়া ছিলেন। জানিলাম তাঁহার নাম রাজেন্দ্রলাল মিত্র, যিনি পরবর্তীকালে বাংলা সরকারের সহকারী সচিব হইয়াছিলেন। অনতিদূরে আরও কয়েকজন ভদ্রলোক বসিয়াছিলেন।

স্বল্পক্ষণ পর শ্রীরামকৃষ্ণ রাজেন্দ্রবাবুকে বলিলেন—"দয়া করে দেখ তো কেশব আসছে কিনা।" একজন দেখিয়া আসিয়া বলিলেন—"না"। আবার কিছুক্ষণ পর বাহিরের একটি শব্দ শুনিয়া তিনি পুনরায় বলিলেন—"দয়া করে আবার দেখ না।" আবার একজন ঘুরিয়া আসিয়া একই উত্তর দিলেন। তখন শ্রীরামকৃষ্ণ ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন—"পাতার মর মর শব্দ পেলেই রাধা বলে উঠে—'ঐ আমার প্রিয়তম আসছে।' দেখ, কেশবও আমায় ঐ ভাবে আশা দিয়ে নিরাশ করে।" কিছুক্ষণ পর কেশব তাঁহার দল লইয়া উপস্থিত হইলেন।

কেশব যখন মাটিতে কপাল ঠেকাইয়া তাঁহাকে প্রণাম করিলেন শ্রীরামকৃষ্ণও অনুরূপ ভাবে তাঁহাকে প্রতি নমস্কার জানাইলেন। কিছু-

ক্ষণ পর তিনি মাথা তুলিয়া অর্ধ-চৈতন্য অবস্থায় জগন্মাতাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—"তুই তো সারা কলকাতার লোক এনে জুটিয়েছিস—যেন আমি বক্তৃতা করতে যাচ্ছি। আমি ও সব পারবো না। তোর ইচ্ছা হয় তুই কর। ও সব আমার দ্বারা হবে না।" অতঃপর ঐ মোহ-বিস্ট অবস্থায়ই এবং দিব্যহাসি ভরা মুখে তিনি বলিলেন—"আমি তোর সন্তান। আমি শুধু বাঁচবো আর ঘুরবো। খাব, ঘুমাব আর সামান্য কাজ কর্ম করবো। বক্তৃতা আমি দিতে পারবো না।" শ্রীরামকৃষ্ণকে দেখিয়া কেশববাবুর অন্তর ভাবাবেগে পুলকিত হইয়া উঠিল। পরম-হংসের ঐ অবস্থা দেখিয়া আমার মনে হইল—"এটা কি শুধুই ভান?" আমি পূর্বে কখনও ইহা দেখি নাই এবং আমি অসন্দিগ্ধ চিত্তও ছিলাম না।

সেই তন্ময় অবস্থার অবসান হইলে পর শ্রীরামকৃষ্ণ কেশবকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—"কেশব, তোমাদের উপাসনা মন্দিরে একবার যখন গেছিলাম তখন তোমায় বলতে শুনেছিলাম 'ভক্তি নদীতে ডুব দিয়ে আমরা সোজা সচ্চিদানন্দ সাগরে পৌঁছব।' তখন আমি উপরের বস-বার আসনের দিকে তাকালাম (যেখানে কেশবের স্ত্রী ও অন্যান্য মহিলারা বসেছিলেন) এবং ভাবলাম—'তাহ'লে ঐ সব মহিলাদের কি হবে?'—তোমরা গৃহী, কি করে তোমরা হঠাৎ সচ্চিদানন্দ সাগরে ডুববে? তোমাদের অবস্থাত ন্যাজে পাথর বাঁধা নেউলের মত। যদি কিছু ঘটে তো নেউল ছুটে গিয়ে দেয়ালের কোণে উঠে বসবে। কিন্তু সেখানে সে থাকবে কি করে? পাথরের ভারে সে মেঝেতে ধপ্ করে প'ড়ে যাবে। তোমরা তপ-ধ্যান একটু আধটু করতে পারো বটে, কিন্তু স্ত্রী ও সন্তানদের ভার তোমাদের টেনে নামাবে। ভক্তি সাগরে হয়তো তোমরা ডুব দিতে পারো, কিন্তু আবার তোমাদের উঠে আসতে হবে। ডোবা আর ওঠা—এই হবে। কিভাবে সম্পূর্ণ ডুবে যাবে।"

কেশববাবু জিজ্ঞাসা করিলেন—"গৃহীদের পক্ষে এটি কি একেবারেই অসম্ভব?"

শ্রীরামকৃষ্ণ—"দেখ, যতদিন মানুষ মায়ার কবলে থাকে ততদিন তার

অবস্থা ডাবের মত। ওর শাঁস তুলতে গেলে ওর খোলের কিছু অংশ অবশ্য উঠে আসবে। কিন্তু যে মানুষ মায়ার প্রভাব থেকে নিজেকে মুক্ত করেছে তার অবস্থা শুকনো নারকেলের মত। তার শাঁস খোলা থেকে মুক্ত—একটু ঝাঁকালেই শুনতে পাবে ওর অবস্থা তাই। অর্থাৎ আত্মা তখন দেহ বন্ধন মুক্ত—সে আর দেহতে বাঁধা থাকে না।

"এসব গোলমালের মূলে আছে অহং বোধ। তুচ্ছ অহং জ্ঞান যেন সম্পূর্ণ ধ্বংসের অতীত। এর অবস্থা যেন পোড়ো বাড়ীর জঞ্জাল থেকে গজানো অশ্বথগাছের মত। আজ ওটা কেটে ফেল, কালই দেখবে শিকড় থেকে ওটি আবার গজিয়ে উঠছে। অহংবোধও ঐ রকম। পেঁয়াজ-রাখা বাটি যতই পরিষ্কার কর না কেন ওর জোড়ালো গন্ধ থেকে যায়।"

কথোপকথনের মধ্যে তিনি কেশববাবুকে বলিলেন—"আচ্ছা কেশব, তোমাদের কলকাতার বাবুরা নাকি ভগবানের অস্তিত্ব স্বীকার করে না? এরকম একজন বাবু সিঁড়ি বেয়ে উঠছিল। একটা সিঁড়ির পর আর একটা সিঁড়িতে পা দিতে গিয়ে বলে উঠলো 'ও আমার পাঁজর গেল, আমার পাঁজর গেল' এবং অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেল। একজন ডাক্তারের জন্য চেঁচামেচি শুরু হ'ল। কিন্তু ডাক্তার আসার আগেই সেই লোকটি মারা গেল। এবং এ জাতীয় লোকেরাই বলে 'ঈশ্বর নেই'।"

প্রায় এক ঘন্টা পর কীর্তন (ভক্তি মূলক গান) আরম্ভ হইল। তখন আমি যাহা দেখিলাম তাহা ইহ জীবনে কেন পরজীবনেও বোধ হয় ভুলিতে পারিব না। উপস্থিত সকলেই, এবং কেশবও, শ্রীরামকৃষ্ণকে মধ্যখানে রাখিয়া এবং তাঁহাকে ঘিরিয়া নৃত্য শুরু করিল। নৃত্য চলা কালে শ্রীরামকৃষ্ণ হঠাৎ নিশ্চল হইয়া দাঁড়াইয়া পড়িলেন। তিনি সমাধিস্থ হইলেন এই অবস্থা দীর্ঘ সময় ধরিয়া চলিল। এইসব দেখিয়া এবং শুনিয়া আমি উপলব্ধি করিলাম তিনি সত্যই একজন পরমহংস।

আমি আবার একদিন শ্রীরামকৃষ্ণের নিকট গিয়াছিলাম। আমি যখন তাঁহাকে প্রণাম করিলাম এবং নিজের আসন গ্রহণ করিলাম তখন তিনি বলিলেন—"তুমি কি আমায় ঐ জিনিসটা এনে দিতে পার যার অর্ধেক টক আর অর্ধেক মিষ্টি—যার ছিপি নিচের দিকে ঠেলে দিলে বজ্ বজ্

শব্দ হয় ? আমি বলিলাম—"আপনি কি লেমনেডের কথা বলছেন।
তিনি বলিলেন—"হ্যাঁ—আমায় তুমি ও জিনিসটা এনে দেবে তো ?"
আমার যতদূর স্মরণ আছে আমি তাঁহাকে একটি বোতল আনিয়া দিয়াছিলাম। আমার যতদূর মনে পড়ে তিনি সেই দিন একাই ছিলেন। আমি তাঁহাকে কয়েকটি প্রশ্ন করিয়াছিলাম।

আমি-"আপনি কি জাতি ভেদ প্রথা মানিয়া চলেন ?"

শ্রীরামকৃষ্ণ—"গর্ব করার মত কিছু নয়। আমি কেশব সেনের বাড়ীতে একদিন তরকারী খেয়েছিলাম। একদিন কি হয়েছিল তোমায় বলি। লম্বা দাঁড়িওয়ালা একটা লোক (একজন মুসলমান) বরফ বেচতে এসেছিল, কিন্তু ওটা কেনার ইচ্ছে আমার হ'ল না। কিছুক্ষণ পর কোন একজন ঐ লোকটার কাছ থেকেই এক টুকরো বরফ কিনে এনে আমায় দিল আর আমি চুষে খেয়ে ফেললাম। তা হ'লে দেখলে জাতি ভেদের বাধা আপনা থেকেই ভেঙে পড়ে। যখন নারকেল আর তাল গাছ বেড়ে ওঠে তাদের পাতা আপনা থেকেই খসে পড়ে। জাতিভেদ প্রথাও ঐভাবে চলে যায়। কিন্তু ওকে জোড় করে হাটাতে যেও না।"

আমি—"কেশব বাবু সম্পর্কে আপনার মতামত কি ?"

শ্রীরামকৃষ্ণ—"ও, সে তো একজন সাধুলোক।"

আমি—"আর ত্রৈলোক্য বাবু ?"

শ্রীরামকৃষ্ণ—"একজন ভাল লোক এবং ভাল গাইয়ে।"

আমি—"আর শিবনাথ বাবু ?"

শ্রীরামকৃষ্ণ—"একজন ভাল লোক। তবে সে বড় তর্ক করে।"

আমি—"হিন্দু ও ব্রাহ্মদের মধ্যে পার্থক্য কি ?"

শ্রীরামকৃষ্ণ—"খুব বেশী না। সানাই যখন বাজে তখন একজন পোঁ ধরে থাকে আর অন্যজন নানা রাগ-রাগিণী বাজায়। ব্রাহ্মরা একস্বর ধরে আছে—নিরাকার ব্রহ্মের কিন্তু হিন্দুরা তাঁর নানাভাব উপভোগ করছে।

"নিরাকার ব্রহ্ম ও সাকার ব্রহ্ম জল আর বরফের মত। অতিরিক্ত ঠাণ্ডায় জল জমে বরফ হয়। জ্ঞানের তাপে বরফ গলে জল হয় আর

অবস্থা ভাবের মত। ওর শাঁস তুলতে গেলে ওর খোলের কিছু অংশ অবশ্য উঠে আসবে। কিন্তু যে মানুষ মায়ার প্রভাব থেকে নিজেকে মুক্ত করেছে তার অবস্থা শুকনো নারকেলের মত। তার শাঁস খোলা থেকে মুক্ত—একটু ঝাঁকালেই শুনতে পাবে ওর অবস্থা তাই। অর্থাৎ আত্মা তখন দেহ বন্ধন মুক্ত—সে আর দেহতে বাঁধা থাকে না।

"এসব গোলমালের মূলে আছে অহং বোধ। তুচ্ছ অহং জ্ঞান যেন সম্পূর্ণ ধ্বংসের অতীত। এর অবস্থা যেন পোড়ো বাড়ীর জঞ্জাল থেকে গজানো অশ্বত্থগাছের মত। আজ ওটা কেটে ফেল, কালই দেখবে শিকড় থেকে ওটি আবার গজিয়ে উঠছে। অহংবোধও ঐ রকম। পেঁয়াজ-রাখা বাটি যতই পরিষ্কার কর না কেন ওর জোড়ালো গন্ধ থেকে যায়।"

কথোপকথনের মধ্যে তিনি কেশববাবুকে বলিলেন—"আচ্ছা কেশব, তোমাদের কলকাতার বাবুরা নাকি ভগবানের অস্তিত্ব স্বীকার করে না? এরকম একজন বাবু সিঁড়ি বেয়ে উঠছিল। একটা সিঁড়ির পর আর একটা সিঁড়িতে পা দিতে গিয়ে বলে উঠলো 'ও আমার পাঁজর গেল, আমার পাঁজর গেল' এবং অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেল। একজন ডাক্তারের জন্য চেঁচামেচি শুরু হ'ল। কিন্তু ডাক্তার আসার আগেই সেই লোকটি মারা গেল। এবং এ জাতীয় লোকেরাই বলে 'ঈশ্বর নেই'।"

প্রায় এক ঘন্টা পর কীর্তন (ভক্তি মূলক গান) আরম্ভ হইল। তখন আমি যাহা দেখিলাম তাহা ইহ জীবনে কেন পরজীবনেও বোধ হয় ভুলিতে পারিব না। উপস্থিত সকলেই, এবং কেশবও, শ্রীরামকৃষ্ণকে মধ্যখানে রাখিয়া এবং তাঁহাকে ঘিরিয়া নৃত্য শুরু করিল। নৃত্য চলা কালে শ্রীরামকৃষ্ণ হঠাৎ নিশ্চল হইয়া দাঁড়াইয়া পড়িলেন। তিনি সমাধিস্থ হইলেন এই অবস্থা দীর্ঘ সময় ধরিয়া চলিল। এইসব দেখিয়া এবং শুনিয়া আমি উপলব্ধি করিলাম তিনি সত্যই একজন পরমহংস।

আমি আবার একদিন শ্রীরামকৃষ্ণের নিকট গিয়াছিলাম। আমি যখন তাঁহাকে প্রণাম করিলাম এবং নিজের আসন গ্রহণ করিলাম তখন তিনি বলিলেন—"তুমি কি আমায় ঐ জিনিসটা এনে দিতে পার যার অর্ধেক টক আর অর্ধেক মিষ্টি—যার ছিপি নিচের দিকে ঠেলে দিলে বজ্‌ বজ্‌

শক্ত হয়? আমি বলিলাম—"আপনি কি লেমনেডের কথা বলছেন।" তিনি বলিলেন—"হ্যাঁ—আমায় তুমি ও জিনিসটা এনে দেবে তো?" আমার যতদূর স্মরণ আছে আমি তাঁহাকে একটি বোতল আনিয়া দিয়াছিলাম। আমার যতদূর মনে পড়ে তিনি সেই দিন একাই ছিলেন। আমি তাঁহাকে কয়েকটি প্রশ্ন করিয়াছিলাম।

আমি-"আপনি কি জাতি ভেদ প্রথা মানিয়া চলেন?"

শ্রীরামকৃষ্ণ—"গর্ব করার মত কিছু নয়। আমি কেশব সেনের বাড়ীতে একদিন তরকারী খেয়েছিলাম। একদিন কি হয়েছিল তোমায় বলি। লম্বা দাঁড়িওয়ালা একটা লোক (একজন মুসলমান) বরফ বেচতে এসেছিল, কিন্তু ওটা কেনার ইচ্ছে আমার হ'ল না। কিছুক্ষণ পর কোন একজন ঐ লোকটার কাছ থেকেই এক টুকরো বরফ কিনে এনে আমায় দিল আর আমি চুষে খেয়ে ফেললাম। তা হ'লে দেখলে জাতি ভেদের বাধা আপনা থেকেই ভেঙে পড়ে। যখন নারকেল আর তাল গাছ বেড়ে ওঠে তাদের পাতা আপনা থেকেই খসে পড়ে। জাতিভেদ প্রথাও ঐভাবে চলে যায়। কিন্তু ওকে জোড় করে হাটাতে যেও না।"

আমি—"কেশব বাবু সম্পর্কে আপনার মতামত কি?"

শ্রীরামকৃষ্ণ—"ও, সে তো একজন সাধুলোক।"

আমি—"আর ত্রৈলোক্য বাবু?"

শ্রীরামকৃষ্ণ—"একজন ভাল লোক এবং ভাল গাইয়ে।"

আমি—"আর শিবনাথ বাবু?"

শ্রীরামকৃষ্ণ—"একজন ভাল লোক। তবে সে বড় তর্ক করে।"

আমি—"হিন্দু ও ব্রাহ্মদের মধ্যে পার্থক্য কি?"

শ্রীরামকৃষ্ণ—"খুব বেশী না। সানাই যখন বাজে তখন একজন পোঁ ধরে থাকে আর অন্যজন নানা রাগ-রাগিণী বাজায়। ব্রাহ্মরা একসুরে ধরে আছে—নিরাকার ব্রহ্মের কিন্তু হিন্দুরা তাঁর নানাভাব উপভোগ করছে।

"নিরাকার ব্রহ্ম ও সাকার ব্রহ্ম জল আর বরফের মত। অতিরিক্ত ঠাণ্ডায় জল জমে বরফ হয়। জ্ঞানের তাপে বরফ গলে জল হয় আর

ভাত্তর শীতলতায় জল জমে বরফ হয়। জিনিস এক তার নানা নাম....”
তিনি তাঁহার সাধন জীবন সম্পর্কেও কিছু বলিয়া ছিলেন। তোতাপুরীর সম্পর্কেও কিছু মন্তব্য করেন। অতঃপর আমি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করি—
“আমি কি করে ঈশ্বর উপলব্ধি করতে পারি।”

উত্তরে তিনি বলিলেন— “দেখ চুম্বক যেমন লোহাকে টানে তিনিও তেমনি আমাদের আকর্ষণ করছেন। লোহা যখন কাদায় ঢাকা পড়ে তখন চুম্বক তাকে আকর্ষণ করতে পারে না। মনের ময়লা চোখের জলে ধুয়ে গেলে সে তাঁর দিকে আকৃষ্ট হবে।”

আমি তাঁহার কথাগুলি যখন লিপিবদ্ধ করিতেছিলাম তখন তিনি মন্তব্য করিলেন—“দেখ ভাং ভাং করে চেঁচালেই নেশা হয় না। তোমায় ভাং জোগাড় করে জলে গুলে খেতে হবে।” অতঃপর তিনি বলিলেন-“সংসারেই তোমায় বাস করতে হবে। তাই মনকে সব-সময়ই ঈশ্বর চিন্তায়ই মত্ত রাখতে হবে। সব কাজের মধ্যেই সেই নেশার ভাবটা তোমায় রাখতে হবে। অবশ্য শুকদেবের মত ভগবত-প্রেমরস পান করতে করতে চৈতন্য হারাবার অবস্থা তোমার হতে পারে না।

“যদি সংসারেই থাকতে চাও তো তাকে বকলমা দাও, তোমার দায়-দায়িত্বের বোঝা তাঁকে তুলে দাও। তাঁর যা ইচ্ছে তাই করবেন।”

এতক্ষণ শ্রীরামকৃষ্ণ মাটিতে বসিয়া ছিলেন। তিনি এইবার উঠিয়া খাটের উপর শয়ন করিলেন। ইহার পর তিনি বলিলেন—“দয়া করে একটু বাতাস কর।” আমি তাঁহাকে বাতাস করিতে লাগিলাম এবং তিনি চুপ করিয়া রহিলেন। কিছুক্ষণ পর তিনি বলিলেন—“উঃ বড্ড গরম! পাখাটা একটু জলে ডুবিয়ে নাও না কেন?” আমি মন্তব্য করিলাম—“বাঃ, তাহলে দেখছি আপনার ভাল লাগালাগি আছে!” তিনি মৃদু হাসিয়া বলিলেন—“হ্যাঁ, কেন থাকবে না?” আমি বলিলাম—“ভাল কথা, তাহলে পুরোপুরি ভোগ করুন।” আমি সেইদিন যে আনন্দ উপভোগ করিয়াছিলাম তাহা ভাষায় প্রকাশ করিতে পারিব না।

অতঃপর তিনি উঠিয়া বসিলেন এবং ‘ওম’ উচ্চারণ করিয়া গান আরম্ভ করিলেন “ডুব, ডুব ডুব, রূপ সাগরে আমার মন।”

কয়েকটি সারি গাহিবার পর তিনি নিজেই সমাধির অতল জলে ডুবিলেন।

সমাধি অন্তে তিনি ঘরে পায়চারী করিতে লাগিলেন এবং দুই হস্তে পরিধেয় বস্ত্রখানি টানিতে টানিতে কোমর পর্যন্ত উঠাইয়া আনিলেন। কাপড়ের এক প্রান্ত মাটিতে লুটাইতেছিল আর এক প্রান্ত আলগা হইয়া ঝুলিতেছিল। আমার সঙ্গীর দৃষ্টি সেইদিকে আকর্ষণ করিয়া ফিস্ ফিস্ করিয়া বলিলাম—"দেখুন, কি সুন্দর করে উনি কাপড় পড়েছেন।" কিছুক্ষণ পর তিনি কাপড়খানি ছুড়িয়া ফেলিয়া দিয়া বলিলেন—"আঃ কি আপদ! এটা দূর হোক।" তিনি ঘরের এক প্রান্ত হইতে আর একপ্রান্ত অবধি পায়চারি আরম্ভ করিলেন। উত্তর প্রান্ত হইতে একটি লাঠি ও একটি ছাতি আনিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"এগুলো কি তোমার?" আমি 'না' বলা মাত্র তিনি বলিলেন—"আমি জানিতাম। আমি একটি লোক কে বিচার করতে পারি তার লাঠি ও ছাতি দিয়ে। যে লোকটা কিছুক্ষণ আগে এখানে ছিল এবং প্রচুর খাবার গিললো এগুলো তার।"

তাঁহার খাটের উত্তর প্রান্তে বিবস্ত্র অবস্থায় পশ্চিমমুখী হইয়া বসিলেন এবং আলাপ আলোচনা শুরু করিলেন—

শ্রীরামকৃষ্ণ—"আচ্ছা তুমি কি আমায় অসভ্য মনে কর?"

আমি—"নিশ্চয়ই না। আপনি একথা জিজ্ঞেস করছেন কেন?"

শ্রীরামকৃষ্ণ—"দেখ শিবনাথ আর কয়েকজন কিন্তু অন্যরকম ভাবে। যখন তারা আসে আমাকে কোনোমতে তখন কাপড় জড়াতে হয়। তুমি গিরীশ ঘোষকে চেনো?"

আমি—"কোন গিরীশ ঘোষ—যিনি নাট্যশালা পরিচালনা করেন?"

শ্রীরামকৃষ্ণ—"হ্যাঁ।"

আমি—"তাঁকে আমি কখনও দেখিনি, কিন্তু তাঁর কথা শুনেছি।"

শ্রীরামকৃষ্ণ —"একজন ভাল লোক।"

আমি—"লোকে বলে তিনি মদ খান।"

শ্রীরামকৃষ্ণ—"খাক না। কদিন আর খাবে। তুমি নরেন্দ্র কে চেনো?"

আমি—"না মশায়।"

শ্রীরামকৃষ্ণ—"আমার খুব ইচ্ছে তুমি তার সঙ্গে আলাপ কর। সে বি. এ. পাশ করেছে এবং অবিবাহিত।"

আমি—"ভাল কথা, আমি তার সঙ্গে দেখা করবো।"

শ্রীরামকৃষ্ণ—"আজ রাম দত্তের বাড়ীতে কীর্তন আছে। তুমি সেখানে তার সঙ্গে দেখা করতে পারো। দয়া করে আজ সন্ধ্যায় সেখানে যেও।"

আমি—"ঠিক আছে।"

শ্রীরামকৃষ্ণ—"হ্যাঁ যেও, ভুলো না কিন্তু।"

আমি—"আপনার হুকুম এবং আমি তা তামিল করবোই। নিশ্চয়ই আমি যাব।"

তিনি তাঁহার ঘরের ছবি গুলি আমায় দেখাইলেন এবং জিজ্ঞাসা করিলেন বুদ্ধদেবের কোন ছবি পাওয়া যাইবে কি না। আমি উত্তর করিলাম—"খুব সম্ভবত পাওয়া যাবে।"

শ্রীরামকৃষ্ণ—"আমাকে একখানা দয়া করে এনে দিও।"

আমি—"আমি যখন আবার আসবো তখন একখানা নিয়ে আসবো।" কিন্তু, হায়! সে সুযোগ আর আমার হয় নাই।

আমি তাঁহার সঙ্গে চার পাঁচবার দেখা করি। কিন্তু এই স্বল্প সময়ের মধ্যে আমাদের অন্তরঙ্গতা এত গভীর হয় যে মনে হইত আমরা যেন সহপাঠী। তাঁহার সঙ্গে কথা প্রসঙ্গে কত অবাধ স্বাধীনতা না লইয়াছি কিন্তু তাঁহার নিকট হইতে বিদায় লইবার পরই মনে হঠাৎ উদয় হইত—"হা ঈশ্বর আমি কার সঙ্গে কথা বলছিলাম?" স্বল্পকালের সান্নিধ্যে তাঁহার নিকট হইতে যাহা লাভ করিয়াছি তাহা আমার সমগ্র জীবনকে মধুময় করিয়া তুলিয়াছে। তাঁহার দিব্য হাসির মধুর স্মৃতি আমার আজও মনে আছে এবং আমায় অপার সুখ শান্তি দান করে।

পরমহংস রামকৃষ্ণদেবের প্রতি

বহু সাধকের বহু সাধনার ধারা
ধেয়ানে তোমার মিলিত হয়েছে তারা।
তোমার জীবনে অসীমের লীলা পথে
নূতন তীর্থ রূপ নিল এ জগতে ;
দেশ বিদেশের প্রণাম আনিল টানি
সেথায় আমার প্রণতি দিলাম আনি।

পরমহংস রামকৃষ্ণ

রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের সাক্ষাৎ সংস্পর্শে আসিবার সৌভাগ্য আমার হয় নাই। আমি তাঁহাকে কখনও দেখি নেই, তাঁহার বাণী কখনও শুনি নাই। তাঁহার সম্বন্ধে অপরের মুখে সামান্য কিছু শুনিয়াছি, এবং তাঁহার সম্বন্ধে অন্যের লেখা কিছু পড়িয়াছি। সুতরাং তাঁহার সম্বন্ধে নূতন কথা কিছু বলিবার সামার্থ্য আমার নাই। আমি কেবল তাঁহার অসাধারণ আধ্যাত্মিক প্রতিভা, তাঁহার অসাধারণ সাধনা ও তাঁহার অসাধারণ সিদ্ধির প্রশংসা করিতে পারি। কিন্তু যাঁহার গুণ-কীর্তন দেশবিদেশের বহু মনীষী করিয়াছেন, করিতেছেন, করিবেন, আমি তাঁহার প্রশংসা করি বা না করি, তাহাতে কিছুই ক্ষতিবৃদ্ধি নাই।

আমার যতদূর মনে পড়ে, তাঁহার বিষয় আমি প্রথম কিছু শুনিয়াছিলাম আমার ভক্তি ভাজন শিক্ষক স্বর্গীয় কেদারনাথ কুলভী মহাশয়ের মুখে। আমি তখন বালক, বাঁকুড়া জেলা স্কুলে পড়ি। কুলভী মহাশয় ব্রাহ্ম ছিলেন, পেন্সান লইবার পর ব্রাহ্মধর্ম প্রচারক হইয়াছিলেন। তাঁহার কাছেই প্রথম পরমহংসদেবের ধূলো ও টাকার সমত্ববোধ-উৎপাদক সাধনার কথা শুনি। তাঁহার সম্বন্ধে আর একটি কথা কুলভী মহাশয়ের কাছে শুনিয়াছিলাম বলিয়া মনে হইতেছে। কিন্তু যাহা শুনিয়াছিলাম, তাহা কোথাও লিখিয়া রাখি নাই। অর্দ্ধ শতাব্দীরও অধিককাল পূর্বে শোনা কথার অস্পষ্ট স্মৃতি হইতে বিশেষ কিছু বলা চলে না। কেবল আখ্যানটির উল্লেখ করা চলে। কুলভী মহাশয়ের কাছে একদিন শুনিয়াছিলাম মনে হইতেছে যে, একদা একজন অবৈধ ইন্দ্রিয়-সুখ ভোগাসক্ত ব্যক্তি পরমহংসদেবের নিকট উপদেশ লইতে যায়। তিনি তাহাকে তিরস্কার করেন নাই, নিবৃত্তিমূলক কথাও কিছু বলেন নাই। কেবল বলেন, তুমি যখন সুখভোগ করিবে, তখন সর্বদাই মনে রাখিবে, ভগবানই তোমাকে সেই শক্তি দিয়াছেন, যাহা তুমি সুখভোগের জন্য ব্যবহার করিতেছ। ইহা শুনিয়া সেই ব্যক্তির হৃদয়ের পরিবর্তন হয়, এবং সে

পাপপথ পরিত্যাগ করে। অতি অস্পষ্ট স্মৃতি হইতে আমি এই কথাগুলি লিখিলাম। বাস্তবিকই আমি এইরূপ কিছু শুনিয়াছিলাম কিনা, নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারি না। পরমহংসদেবের উপদেশাবলীর যে সকল সংগ্রহ পুস্তক আছে, তাহার কোনটিতে এরূপ কোন আখ্যান ও উপদেশ থাকিলে আমার স্মৃতিভ্রম হয় নাই নিশ্চিত মনে করিতে পারি। নতুবা আমার স্মৃতির অভ্রান্ততা সম্বন্ধে সন্দেহ থাকিবে।

স্বর্গীয় পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় ১৯১০ খ্রীষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে মডার্ণ রিভিয়ুর জন্য পরমহংসদেবের সম্বন্ধে ইংরেজীতে একটি প্রবন্ধ লেখেন। ঐ বৎসর তাহা উহার নবেম্বর সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। ইহা তাঁহার প্রত্যক্ষ জ্ঞান হইতে লিখিত। পরমহংসদেব সম্বন্ধে আমার ধারণা প্রধানতঃ এই প্রবন্ধটি হইতে জন্মিয়াছে। শাস্ত্রী মহাশয় ইহাতে যাহা লিখিয়াছিলেন, তাহার কোন কোন অংশের মংকৃত অনুবাদ দিতেছি। রামকৃষ্ণের সাধনা ও সিদ্ধি সম্বন্ধে শাস্ত্রী মহাশয় বলেন :—

"পরমহংস রামকৃষ্ণ তাঁহার সাধনা সম্বন্ধে আমাকে যাহা বলিয়াছিলেন, তাহার অনেক কথা আমার মনে আছে।...দৃষ্টান্ত স্বরূপ, এক হাতে কিছু ধুলো ও অন্য হাতে কয়েকটি মুদ্রা লইয়া তিনি নদীর ধারে বসিয়া ধ্যানস্থ হইতেন, এবং উভয়েরই সমান অকিঞ্চিৎকারতা উপলব্ধি করিতে চেষ্টা করিতেন। তাহার পর তিনি পুনঃ পুনঃ বলিতেন "টাকা ধুলো, ধুলো টাকা, ধুলো টাকা.' এবং এই সত্যের সম্পূর্ণ উপলব্ধি হইবার পর ধুলা ও টাকা দুই-ই নদীতে ফেলিয়া দিতেন।

"একজন সাধু তাঁহাকে দীনতা সাধন করিতে, আপনাকে হীনতম মেথরের সমান মনে করিতে বলেন। রামকৃষ্ণ তৎক্ষণাৎ মেথরের কাজ করিতে প্রতিজ্ঞা করিলেন। তিনি গোপনে এক প্রতিবেশীর পায়খানার নীচের দরজা দিয়া ঢুকিয়া ময়লার গামলা হইতে ময়লা ফেলিয়া দিয়া তাহা নদীতে ধুইয়া যথাস্থানে রাখিয়া দিতেন। কিছুদিন তিনি এইরূপ করিবার পর ব্যাপারটি জানা পড়িল এবং তাঁহার বিরুদ্ধে আপত্তি ও অনুযোগ হইল। তখন তাঁহাকে মেথরের কাজ ছাড়িয়া দিতে হইল।"

"বস্তুতঃ তাঁহার সহিত মিলামিশায় আমার এই ধারণা জন্মে যে, আমি কচ্চিত এমন আর একটি মানুষকে দেখিয়াছি আধ্যাত্মিক জীবনের জন্য যাঁহার আকাঙ্ক্ষা এত অধিক এবং যিনি ধর্ম সাধনের জন্য এত দুঃখভোগ ও ত্যাগ স্বীকার করিয়াছেন। দ্বিতীয়তঃ, আমার এই দৃঢ় বিশ্বাস জন্মে, যে, তিনি এখন আর সাধক নহেন কিন্তু সিদ্ধ হইয়াছেন। যে সত্যটির তিনি আত্মিক সাক্ষাৎ দর্শন লাভ করিয়াছিলেন এবং যাহা হইতে তিনি স্বীয় আত্মায় মহৎ প্রেরণা লাভ করিতেন, তাহা পরমাত্মার মাতৃত্ব। তিনি পরম দেবতাকে মা বলিয়া উল্লেখ করিতে ভালবাসিতেন, ঐশী মাতৃত্বের চিন্তায় তাঁহার প্রবল ভাবাবেগ হইত, এবং বিশ্বজননীর বাৎসল্যের গান গাহিতে গাহিতে উত্তেজনার আধিক্যে তিনি সংজ্ঞাহারা হইতেন। তাঁহার এই বিশ্বমাতৃত্বের ধারণা কোন বিগ্রহ বা মূর্ত্তিকে অতিক্রম করিয়া অনন্দের ধারণায় পরিণত হইত।"

জ্ঞান ও ভক্তি সম্বন্ধে একবার একজন জিজ্ঞাসু পরমহংসদেবকে প্রশ্ন করে। সে বিষয়ে শাস্ত্রী মহাশয় লিখিয়াছেন :—

"একবার একজন দর্শক তাঁহাকে প্রশ্ন করিল, জ্ঞান ও ভক্তির মধ্যে কোন্‌টি শ্রেষ্ঠ। রামকৃষ্ণ সংস্কৃত ব্যাকরণ অনুযায়ী লিঙ্গ অনুসারে জ্ঞান ও ভক্তি শব্দ দুটির মধ্যে জ্ঞানকে পুরুষ ও ভক্তিকে নারী বলিয়া উপদেশ দিলেন। কিন্তু তিনি জানিতেন না, যে, সংস্কৃত ব্যাকরণ অনুসারে জ্ঞান ক্লীব লিঙ্গ। যাহা হউক, এক্ষেত্রে তাঁহার জ্ঞানানুযায়ী লিঙ্গভেদের চমৎকার প্রয়োগ তিনি করিলেন। একটিকে পুরুষ ও অন্যটিকে নারী বলিয়া বর্ণনা করিয়া এবং নারীদিগের অন্তঃপুরে থাকিবার ভারতীয় প্রথার উল্লেখ করিয়া তিনি বলিলেন,—"জ্ঞান পুরুষ ব'লে মা'র বাড়ির বাইরের মহলে অপেক্ষা করতে বাধ্য হয়; কিন্তু ভক্তি নারী ব'লে একেবারে সোজা মা'র অন্তপুরে গিয়ে তাঁর সামনে উপস্থিত হয়।"

সাংসারিক কাজে ব্যাপৃত থাকিয়াও কেমন করিরা পরমার্থ চিন্তা সম্ভব তদ্বিষয়ে পরমহংসদেবের উপদেশ এইরূপ লিখিত হইয়াছে :—

"আর একদিন এক জন দর্শক জিজ্ঞাসা করিলেন, 'আমরা সংসারে নিত্য নানা উদ্বেগ ও কর্ত্তব্য নিয়ে থাকি : এ অবস্থায় পারমার্থিক

বিষয়ে মনঃসংযোগ করতে হ'লে কি করতে হবে?' রামকৃষ্ণ বলিলেন, 'ঢেঁকিতে মেয়েদের চিড়া তৈরি করতে দেখেছ? ঢেঁকির মুশল যে গর্ত্তটিতে ক্রমাগত পড়ে ও তার থেকে ওঠে, তার কাছে একটি স্ত্রীলোক ব'সে থেকে তাতে ধান দেয়, আর কুটা ধানগুলি সরিয়ে নেয়। তাকে গর্ত্তটি থেকে কুটা ধান খুব সাবধানে সরাতে হয়, নইলে তার আংগুল গুলি থেঁতলে যেতে পারে। এই স্ত্রীলোকটির কথা ভাব। আর এও বিবেচনা কর, যে, সে তখন অন্য কাজেও ব্যাপৃত থাকে। তার কোলে একটি শিশু আছে, তাকে সে মাই দিচ্ছে, বাঁ হাত দিয়ে কুটা ধান রোদে দিবার জন্য ছড়াচ্ছে, আবার একজন প্রতিবেশীকে কিছুক্ষণ আগে যে চিঁড়া দিয়েছিল তার সংগে তার দামেরও কথা বলছে। ঐ স্ত্রীলোকটির মন সকলের আগে সকলের চেয়ে বেশী কিসে আছে মনে কর? নিশ্চয়ই সেই ঢেঁকির গর্তে ঢুকান হাতটিতে, যাতে ক'রে মুশলে হাতটা থেঁতলে না যায়। সেই রকম তোমরা এই সংসারে নানা ব্যাপারে লিপ্ত থেকো, নানা কর্ত্তব্যে ব্যস্ত থেকো, কিন্তু সকলের আগে সকলের চেয়ে মন দিও তোমাদের পারমার্থিক কল্যাণের বিষয়, যাতে তা নষ্ট না হয়।"

শাস্ত্রী মহাশয় তাঁহার প্রবন্ধ এই বলিয়া শেষ করিয়াছেন:—

My acquaintance with him, though short, was fruitful by strengthening many a spiritual thought in me. I owe him a debt of gratitude for the sincere affection he bore towards me. He was certainly one of the most remarkable personalities I have come across in life."

তাৎপর্য। "তাঁহার সহিত আমার পরিচয় অল্পকাল স্থায়ী হইলেও তাহা এই ফল দান করিয়াছিল, যে, তাহা আমার অনেক আধ্যাত্মিক চিন্তাকে পুষ্ট করিয়াছিল। তিনি আমার প্রতি যে অকপট স্নেহ হৃদয়ে পোষণ করিতেন, তাহার জন্য আমি কৃতজ্ঞতাঋণে ঋণী। আমি জীবনে যে সকল ব্যক্তিত্ববৈশিষ্ট্য সম্পন্ন অসাধারণ মানুষদের সংস্পর্শে আসিয়াছি, তিনি নিঃসন্দেহ তাঁহাদেরই মধ্যে একজন।"

ব্রাহ্ম সমাজ প্রকাশিত পত্র-পত্রিকায়
শ্রীরামকৃষ্ণ

সুলভ সমাচার, ৩ পৌষ ১২৮৮ শনিবার ; ১৭ ডিসেম্বর ১৮৮১*

সাপ্তাহিক সংবাদ—দক্ষিণেশ্বরের পরমহংসকে কলিকাতার ভদ্রলোকেরা ক্রমেই চিনিতেছেন। তাঁহারা কেহ কেহ তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করিয়া বাটিতে আনিতেছেন এবং আত্মীয় বন্ধুদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া তাঁহার জীবন্ত ধর্ম-কথা ও কীর্তনাদি শুনাইয়া সুখী করিতেছেন। উক্ত মহাত্মা দ্বারা কলিকাতার হিন্দু সমাজে ধর্মভাব জাগ্রত হইতেছে। বিগত শনিবার বাঙ্গলা গবর্ণমেণ্টের সহকারী সেক্রেটারী শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রনাথ মিত্র মহাশয়ের বাটীতে তাঁহার সমাগম হইয়াছিল। তিনি ভাবে বিভোর ও উন্মত্ত হইয়া অনেকগুলি গূঢ় গূঢ় ধর্মকথা বলিয়া দিলেন। তিনি এই একটি কথা বলিলেন যে পরমাত্মা জীবাত্মার অতি নিকট রহিয়াছেন তথাচ জীবাত্মা তাঁহাকে দেখিতে পাইতেছে না। সে কথা এইরূপে বুঝাইলেন যে রামচন্দ্র পরমাত্মাসাদৃশ, সীতাদেবী মায়া ও লক্ষণ জীবাত্মার অনুরূপ। জীবাত্মার প্রতিরূপে লক্ষণ পরমাত্মার ঠিক পশ্চাতেই যাইতেছেন, কিন্তু কেবল মায়ারূপী সীতার ব্যবধানেই তাঁহাকে দেখিতে পাইতেছেন না ; যখনই সীতা একটু পাশ দেন তখনই তিনি তাঁহাকে দেখিয়া মোহিত হন। আর একটি দৃষ্টান্ত দ্বারা এই কথাটি সুন্দর ভাবে বুঝাইলেন ; তিনি বলিলেন যে. পরমাত্মা চুম্বকসদৃশ, জীবাত্মা লোহ শলাকার ন্যায়। চুম্বক স্বাভাবিক অবস্থায় আপনার গুণেই লৌহকে আকর্ষণ করে কিন্তু লৌহে কাদা মাখান থাকিলে তাহার উপর চুম্বকের যেমন কোন বল খাটে না, তদ্রূপ আত্মা কর্দমে পূর্ণ থাকিলে তাহা পরমাত্মার নিকট যাইতে সক্ষম হয় না। কিন্তু অনুতাপের অশ্রুজলের দ্বারা সেই পাপরূপ কর্দম ধৌত হইলে, অনাবৃত লৌহসম আত্মা আপনাপনিই পরমাত্মারূপে চুম্বকের দিকে ধাবিত হয়।

---

* ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস সংকলিত 'সমসাময়িক দৃষ্টিতে শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস' বইটি থেকে উদ্ধৃত। পৃঃ ২৫।—সম্পাদক।

ধর্মতত্ত্ব,* ১লা জৈষ্ঠ্য ১৭৯৭ শক

রামকৃষ্ণ পরমহংস

জাহানাবাদের নিকট কোন পল্লীতে ব্রাহ্মণ কুলে ইনি জন্মগ্রহণ করেন। বয়ঃক্রম যখন দশ কিম্বা, একাদশ তখন হইতে ই'হার মনে অসাধারণ ধর্মানুরাগের লক্ষণ প্রকাশিত হইয়াছিল। যেখানে অতিথি ফকির সন্ন্যাসী দেখিতে পাইতেন সেইখানে গিয়া ইনি বসিয়া থাকিতেন। রামকৃষ্ণের পিতাও একজন সাধক ছিলেন। তিনি পুত্রকে পরিধানের জন্য বস্ত্র দিতেন পুত্র তাহা ছিন্ন করিয়া কৌপিন প্রস্তুত করিতেন। রামকৃষ্ণ লেখা পড়া শিক্ষা করেন নাই। লেখা পড়া শিখিলে পৌরহিত্য ব্যবসায় করিতে হইবে এই ভয়ে সে দিকে কখন যাইতে চাহিতেন না। ই'হার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ব্রাহ্মণ পন্ডিত ছিলেন, কলিকাতায় থাকিয়া শাস্ত্রালোচনা করিতেন, রামকৃষ্ণ কিছুদিন তাঁহার নিকটে ছিলেন। যৎকালে রাণী রাসমণি দক্ষিণেশ্বরে অতি সমারোহের সহিত দেবালয় প্রতিষ্ঠা করেন** তখন রামকৃষ্ণ তাঁহার জ্যেষ্ঠের সঙ্গে তথায় নিমন্ত্রণে গিয়াছিলেন। তখন তাঁহার বয়ঃক্রম অনুমান অষ্টাদশ বর্ষ হইবে। রাসমণির জামাতা মথুরবাবু রামকৃষ্ণের ঔদাস্য ভাব দেখিয়া তাঁহাকে কিছু ভালবাসিতে

* সমসাময়িক দৃষ্টিতে শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস।

** ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত সম্পাদিত সংবাদ প্রভাকর ২৬ চৈত্র ১২৫৯ (১৪ মার্চ ১৮৫৩) তারিখে এই প্রসঙ্গে লেখেন: "আমরা শুনিতেছি শ্রীমতী রাসমণি আগামী বৈশাখীর পূর্ণমাসি তিথিতে দক্ষিণেশ্বরে মহতী কীর্ত্তি স্থাপিত করিবেন, অর্থাৎ ঐ দিবস গুরুতর সমারোহ সহযোগে কালীর নবরত্ন, দ্বাদশ শিবমন্দির, অন্যান্য দেবালয় এবং পুষ্করিণী প্রভৃতি উৎসর্গ করিবেন এতৎ পবিত্র কর্ম্মোপলক্ষে কত অর্থব্যয় এবং কত ব্যক্তি উপকৃত হইবে তাহা অনির্ব্বচনীয়।"

মাহিষ্যকুলোদ্ভবা রাণীর পৌরোহিত্য করিতে প্রথমে কেহ স্বীকৃত না হওয়ায় মন্দিরাদি প্রতিষ্ঠাকার্য্য বিলম্বিত হইয়াছিল। ইহা সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয় ১২৬২ সালের ১৮ই জ্যৈষ্ঠ (৩১মে ১৮৫৫)। বৃহস্পতিবার স্নানযাত্রার দিন। মন্দিরাদি নির্মাণ ও প্রতিষ্ঠা করিতে রাসমণির প্রায় নয় লক্ষ টাকা ব্যয় হইয়াছিল।

লাগিলেন এবং কিছুদিন পরে কালীদেবী মন্দিরে তাঁহাকে পরিচারকের কার্যে নিযুক্ত করিলেন। রামকৃষ্ণ এইরূপে কিছু দিন থাকেন, পুষ্প চন্দনাদি দ্বারা ঠাকুর সাজান আর ঠাকুরবাড়ীর প্রসাদ ভক্ষণ করেন। কিন্তু কোন বিষয়ে স্পৃহা বা স্বার্থপরতা তাঁহার ছিল না। একদিন কালীপূজা করিতেছেন, করিতে করিতে নৈবেদ্য ফুল চন্দন ঠাকুরের মাথায় না দিয়া আপনার মাথায় দিতে লাগিলেন কখন বা কালীর বেদীর উপর উঠিয়া বসিয়া থাকিতেন। মথুরবাবু একদিন ইহা দেখিলেন, দেখিয়া তাঁহার রামকৃষ্ণের উপর আরও ভক্তি বৃদ্ধি হইল। তদনন্তর এই যুবা পরমহংস রিপুদমন ও যোগসাধনে নিযুক্ত হইয়া অতি কঠোর তপস্যা আরম্ভ করিলেন। দক্ষিণেশ্বরের ঠাকুরবাটির পার্শ্বে গঙ্গাতীরে একটি রমণীয় স্থান আছে তথায় তিনি দিবা রাত্রি বসিয়া থাকিতেন। রিপুদমনের জন্য ভৈরবী পূজা করিয়াছিলেন এবং কিছু দিন স্ত্রীলোকের বেশভূষা পরিধান করিয়া থাকিতেন। আপনাকে প্রকৃতি বোধ না হইলে রিপু জয় করা যায় না, এই জ্ঞানে তিনি কখন সখীভাবে কখন বা দাসীভাবে সাধন করিতেন। তাঁহার এক শিষ্য বলেন, দশ বৎসর কাল তিনি নিদ্রা যান নাই, আর শারীরিক সুখের প্রতি একেবারে উদাসীন হইয়াছিলেন, কালী হইতে আরম্ভ করিয়া আল্লা পর্যন্ত জপ করিয়াছেন। শরীর রক্ষার ভার হৃদয় নামক উক্ত শিষ্যের উপর ছিল, তিনিই আহার করাইয়া দিতেন। এখনও তিনি ইঁহার সেবা করিয়া থাকেন। রামকৃষ্ণের ধর্মানুরাগ অত্যন্ত প্রবল। সাধনের বলে এমনি হইয়াছে যে, টাকা অথবা শাল স্পর্শ করিলে তাঁহার হস্ত অসাড় হইয়া যায়। সংসারবাসনাশূন্য জিতেন্দ্রিয় হইয়া এখন সর্বদা ধর্মভাবেই তিনি অবস্থিতি করিতেছেন। উৎসাহ কিঞ্চিৎ অধিক হইলে একেবারে অচেতন হইয়া পড়েন। এতদিন পর্য্যন্ত স্ত্রী পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। সম্প্রতি তাঁহাকে আপনার নিকটে রাখিয়াছেন। যদিও এখন তিনি পরিবারের মধ্যে থাকেন, কিন্তু সাংসারিক ভাবে নহে, জিতেন্দ্রিয় যোগীর ন্যায় অবস্থিতি করেন। এখন বয়ঃক্রম প্রায় চল্লিশ হইয়াছে। শরীর অতি শীর্ণ, দুর্বলতার গতিকে মধ্যে মধ্যে মূর্চ্ছা হয়। অনেক ভাল ভাল গভীর ধর্মকথা তাঁহার মুখে শুনিতে পাওয়া যায়, কোন কোন

দৃষ্টান্ত কথা যদিও আমাদের কর্ণে অতি অশ্লীল এবং কুৎসিত ভাবব্যঞ্জক বোধ হয়, কিন্তু তাঁহার চরিত্রে কোন মন্দভাব না থাকায় সে সকল তিনি অম্লান বদনে বলিয়া থাকেন। তিনি বলেন শরীরের সকল অঙ্গই সমান তাহার মধ্যে মন্দ কি আছে? সঙ্গীত ও সংকীর্তনে তাঁহার বিশেষ ক্ষমতা আছে, স্বর অতি সুমিষ্ট। ব্যবহারে কোন প্রকার বাঁধাবাঁধি নিয়ম নাই। সরল ভাবে সকল কথা বলেন। আবশ্যক হইলে দুই একটি গালাগালিও দিয়া থাকেন, কিন্তু তাহা শুনিতে তত কটু বোধ হয় না। ধর্মবিষয়ে মতামত তাঁহার যাহাই হউক, তিনি একজন সরল সাধক এবং প্রেমিক ভক্ত। উৎসাহ এবং ভাবুকতা যথেষ্ট আছে। এখন এই বলিয়া খেদ করেন যে, ইচ্ছা হয় সর্বদা বিভুগুণ কীর্তন করিয়া আনন্দে নাচিয়া বেড়াই, কিন্তু শরীর রুগ্ন হওয়াতে তাহার বড় ব্যাঘাত ঘটিয়াছে। তথাপি যথেষ্ট উৎসাহের ভাব আমরা তাঁহাতে দেখিতে পাই। তাঁহার স্বভাব অতি বিনম্র ও সরল, দেখিতে পাগলের ন্যায় অথচ ধর্মবুদ্ধি বিলক্ষণ উজ্জ্বল। তাঁহার সহিত আলাপ করিলে অনেক শিক্ষা পাওয়া যায়। তাঁহাকে দেখিলে ঘোর সাংসারিকের মনও টলিয়া যাইবে সন্দেহ নাই। তিনি বলেন, সাধনার অবস্থাতে আমার এত যন্ত্রণা হইত যে তাহা আর বলিতে পারি না। শীতকালে গায়ে মাখন মাখিয়া বাতাস করিতে হইত এত উত্তাপ। কিন্তু তাহার সঙ্গে আবার কিছু কিছু সুখও ছিল। এখন আর আমি ধ্যান করিতে পারি না, ধ্যান করিতে গেলেই মূর্চ্ছা হয়। তিনি যেমন সাধন করিয়াছেন তেমনি তাঁহার যথেষ্ট লাভ হইয়াছে। সংসার এবং সাংসারিক লোকের প্রতি তাঁহার কোন আস্থা নাই। তিনি বলেন, অনেকে আমার নিকট পূর্বে আসিত, কিন্তু ধর্মের জন্য কেহই ব্যাকুল নহে, সকলের মধ্যেই গোলযোগ দেখিতে পাইলাম। মনুষ্যের সাধনের বল এবং ঈশ্বরের করুণাবল সম্বন্ধে তাঁহার একটি দৃষ্টান্ত কথা আমরা এখানে প্রকাশ করিতেছি। ঈশ্বরের কৃপায় যাহার সম্পূর্ণ নির্ভর সে বিড়ালের বাচ্চা, আর সাধনের বলের উপর যাহার নির্ভর সে হনুমানের বাচ্চা। বিড়ালের বাচ্চা কেবল মেও মেও করিয়া ডাকিতে জানে, কিন্তু তাহার মাতা তাহাকে মুখে করিয়া লইয়া কোথায় ফেলিবে তাহা সে জানে না। আর

যে হনুমানের বাচ্চা সে মাতৃবক্ষস্থল প্রাণ-পণ যত্নে ধরিয়া থাকে, তাহার মাতা তাহাকে পেটের নীচে রাখিয়া যেখানে সেখানে দৌড়িয়া যায়। রামকৃষ্ণ বলেন আমি বিড়ালের ছানা কেবল মেও মেও করিয়া ডাকিতে জানি। আর একটি উৎকৃষ্ট কথা এই যে, শিশু যখন রাঙ্গা লাঠি পাইয়া ভুলিয়া খেলা করে মাতা তখন কার্য করিতে থাকেন, যদি সে কাঁদিয়া উঠে অমনি মাতা সকল কাজ ফেলিয়া তাহাকে কোলে গ্রহণ করেন। সংসারমুক্ত মনুষ্য বালক সমান, ঈশ্বর তাহার জননী, যেই সে মাতার জন্য কাঁদিবে অমনি তিনি তাঁহাকে দেখা দিবেন। যখন সে সংসাররূপ রাঙ্গা লাঠি লইয়া খেলা করিতেছে তখন মাতা বলেন—ও খেলা করিতেছে, করুক, আমি এখন অন্য কাজ করি। একজন লোক লেখা পড়া না জানিয়াও কেবল অনুরাগের বলে কতদূর ধার্মিক হইতে পারে রামকৃষ্ণ তাহার দৃষ্টান্ত স্থল। ভাবের ভাবুক পাইলে তিনি মন খুলিয়া অনেক নূতন কথা বলেন। দক্ষিণেশ্বরের দেবালয়ে তাঁহার থাকিবার স্থান, তাঁহার সহিত আলাপ করিলে অনেক আনন্দ পাওয়া যায়। এই স্বার্থপর সংসারে তাঁহার মত একজন বৈরাগী সাধক অতি বিরলদৃশ্য সন্দেহ নাই।

ধর্মতত্ত্ব, ১৬ মাঘ ও ১লা ফাল্গুন ১৮০৭ শক। ভাগ ২১, সংখ্যা ২৩; পৃঃ ৩১-৩২

সংবাদ

আমরা অতিশয় দুঃখের সহিত পাঠকবর্গকে জানাইতেছি, দক্ষিণেশ্বরের পরমহংস মহাশয়ের অত্যন্ত সংকট রোগ। তাঁহার কণ্ঠনালীর ভিতরে ক্ষত হইয়া বক্ষোদেশ পর্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছে। তিনি সময়ে সময়ে রক্ত বমন করিয়া থাকেন। কোন কোন দিন দুই সের আড়াই সের রক্ত মুখ দিয়া পড়িয়াছে। তাঁহার গলার স্বর একেবারে বন্ধ হইয়াছে। দুই তিন মাস ভয়ানক কষ্ট পাইতেছেন। চিকিৎসকগণ নিরাশ হইয়াছেন, সম্প্রতি আর কোনরূপ চিকিৎসা হইতেছে না। দিন দিনই অবস্থা মন্দ দেখা যাইতেছে। পরলোকের জন্য তাঁহাকে এইক্ষণ বিশেষরূপে প্রস্তুত হইতে

হইয়াছে। কিছুকাল হইতে তিনি কাশীপুরস্থ এক বাগানবাটিতে অবস্থিতি করিতেছেন। কতিপয় কৃতবিদ্য যুবক সেই বাটিতে অবস্থান করিয়া পরম যত্নে ও শ্রদ্ধা সহকারে তাঁহাকে সেবা শুশ্রূষা করিতেছেন। প্রতি মাসে প্রায় দুইশত টাকা তাঁহার সেবা শুশ্রূষাতে ব্যয়িত হইতেছে। পরমহংস মহাশয় স্বীয় যোগ ভক্তিপ্রবণ পবিত্র উচ্চ জীবনের দৃষ্টান্তে নরনারীর হৃদয়কে বিশেষরূপে আকর্ষণ করিয়াছেন। বহুসংখ্যক লোক তাঁহার আকর্ষণে আকৃষ্ট হইয়া ঘরবাড়ী ত্যাগ করিয়া চলিয়া আসিয়াছেন। তাঁহারা সাধুভক্তির আশ্চর্য্য দৃষ্টান্তস্থল হইয়াছেন। এই রামকৃষ্ণ পরমহংস আমাদের আচার্যদেবের* অত্যন্ত আদরের পাত্র ছিলেন। পরমহংসজীও তাঁহার নামে অশ্রুপাত করেন। বর্তমান সময়ে ইঁহার ন্যায় সাধুপুরুষ এদেশে নাই। বঙ্গদেশের উপর কি অভিসম্পাত হইয়াছে, ইনিও বুঝি অচিরেই যাত্রা করিবেন। ঈশ্বরের যাহা ইচ্ছা তাহাই পূর্ণ হইবে।

* কেশবচন্দ্র সেন—সম্পাদক।

ধর্মতত্ত্ব, ১লা ভাদ্র, সোমবার, ১৮০৮ শক। ভাগ ২১, সংখ্যা ১৫; পৃঃ ১৭৫

সংবাদ

....আমরা শোকসন্তপ্ত চিত্তে লিখেতেছি যে, পরমযোগী ও ভক্ত দক্ষিণেশ্বরের ভক্তিভাজন শ্রীমৎ রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব গতকল্য রাত্রি ১০ ঘটিকার* সময় কাশীপুরে ঐহিক লীলা সম্বরণ করিয়াছেন। তিনি বহুকাল হইতে রোগযন্ত্রণা ভোগ করিতে ছিলেন। এইক্ষণ সমুদায় রোগ হইতে মুক্ত হইয়া অমৃতধামে চলিয়া গেলেন। বঙ্গভূমি একটি সাধু রত্ন হারাইল। অদ্য অপরাহ্ণ ৫টার সময় বরাহনগরের ঘাটে তাঁহার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া হইবে।

*** শ্রীরামকৃষ্ণ দেবের তিরোভাবের সময় রাত ১টা। ইংরেজী মতে ১৬ই আগষ্ট হয়। — সম্পাদক।**

তত্ত্ব-কৌমুদী*

১৬ ভাদ্র, মঙ্গলবার, ১৮০৮ শক। ব্রাহ্ম সম্বৎ ৫৭। ৯ম ভাগ, ১০ম সংখ্যা; পৃঃ ১১৯।

সাধক প্রবর ৺রামকৃষ্ণ পরমহংস।

গত ৩১শে শ্রাবণ রবিবার দক্ষিণেশ্বরের ভক্ত রামকৃষ্ণ পরমহংস পরলোক গমন করিয়াছেন। ধর্ম বিষয়ে তাঁহার সহিত আমাদের অনেক বিষয়ে অনৈক্য থাকিলেও তাঁহার ধর্মনিষ্ঠা, ঐকান্তিক ধর্মানুরাগ, আশ্চর্য্য ত্যাগ স্বীকার, কঠোর বৈরাগ্য, গভীর প্রেম, প্রভৃতি গুণ সকল দর্শন করিয়া আমরা তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিলাম। যে সকল ধর্মাত্মা বঙ্গদেশকে উজ্জ্বল করিয়া গিয়াছেন রামকৃষ্ণ তাঁহাদের মধ্যে একজন। রামকৃষ্ণ শিক্ষিত না হইয়াও সরলভাবে ধর্মের এমন সকল নিগূঢ় সারগর্ভ কথা সকল বলিতেন যে তাহা শুনিয়া আমরা অনেক সময় মুগ্ধ হইতাম। এ সকল গভীর সাধন ভজনের ফল ভিন্ন আর কিছুই নহে। তাঁহার মৃত্যুতে আমরা বঙ্গের একটি উজ্জ্বল সাধক হারাইয়াছি। তাঁহার মৃত্যুতে ধর্মপিপাসু ব্যক্তি মাত্রেই যে দুঃখিত হইবেন তাহাতে আর কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। আমরা সর্বান্তঃকরণের সহিত সেই শান্তিদাতা পরমেশ্বরের নিকট প্রার্থনা করি যে, তিনি তাঁহার পরলোকগত আত্মাকে দিব্য জ্ঞানালোকে আরও উজ্জ্বল করিয়া চিরদিন সুখে এবং শান্তিতে রক্ষা করুন।

* সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত।

১৬ ভাদ্র, মঙ্গলবার, ১৮০৮ শক।

ভাগ ২১, সংখ্যা ১৬ ; পৃঃ ১৮৭

সংবাদ

....১লা ভাদ্র সোমবার অপরাহ্ণ ৫টার সময় কাশীপুরস্থ গোপালবাবুর বাগানবাটি হইতে পরমহংসদেবের দেহ বরাহনগরের শবদাহ ঘাটে নীত হয়। কলিকাতা হইতে একশত দেড়শত লোক যাইয়া অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় যোগদান করিয়াছিলেন। একটি নূতন খট্টার উপর বিচিত্র শয্যা স্থাপিত ছিল, পুষ্পগুচ্ছ ও পুষ্পমালায় খাটখানা বেশ সাজান হইয়াছিল। নূতন গৈরিক আচ্ছাদন ও পুষ্পমালা দ্বারা শবের শোভা বৃদ্ধি পাইয়াছিল। পরমহংসের শিষ্যবৃন্দ ও বন্ধুবর্গ ভক্তি সহকারে পদধারণপূর্বক প্রণাম করিয়া খট্টা বহনপূর্বক হরিধ্বনি করিতে করিতে উদ্যান প্রাঙ্গণ হইতে বাহির হন। একদল বৈষ্ণব মৃদঙ্গ করতাল সহ সঙ্কীর্তন করিয়া অগ্রে অগ্রে গমন করে। কলিকাতা হইতে ডাক্তার গোপালচন্দ্র বসু, রাজমোহন বসু ও কালিদাস সরকার প্রভৃতি অনেক বিধানবাদী ব্রাহ্ম এবং ভাই অমৃতলাল বসু, ত্রৈলোক্যনাথ সান্ন্যাল ও গিরিশচন্দ্র সেন এবং প্রাণকৃষ্ণ দত্ত এই চারি জন বিধানপ্রচারক শবের সঙ্গে ঘাট পর্যন্ত যাইয়া অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় যোগদান করিয়া ছিলেন। হিন্দু ধর্মের ত্রিশূল ও ওঁ-কার, বৌদ্ধধর্মের স্বস্তি, মোহম্মদী ধর্মের অর্দ্ধচন্দ্র, খৃষ্টধর্মের ক্রুস চিহ্নিত পতাকা সর্বাগ্রে বাহিত হইয়াছিল। ঘাটে খট্টা স্থাপন করিয়া কিয়ংক্ষণ দেহকে প্রদক্ষিণ পূর্বক সঙ্কীর্তন হয়। পরে সঙ্গীতপ্রচারক ভাই ত্রৈলোক্যনাথ সান্ন্যাল কোন কোন বন্ধু কর্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়া তৎসময়োপযোগী ৩।৪টী সঙ্গীত করেন। তাঁহার সুললিত কণ্ঠের সঙ্গীত পরমহংসদেব বড়ই আদর করিতেন। অবশেষে শ্মশানে তাঁহার পবিত্র দেহের পার্শ্বে বসিয়াও ভাই ত্রৈলোক্যনাথকে সঙ্গীত করিতে হইল। চিতাশয্যায় স্থাপন করিবার সময় শবের পদ ধারণ করিয়া ভক্তবৃন্দ ভক্তির সহিত প্রণাম করিলেন। পরমহংসদেবের নেত্রদ্বয় ঈষদুন্মিলিত, মুখমণ্ডল ঈষৎ হাস্যযুক্ত ছিল।

তাঁহাতে বোধ হয় সমাধির অবস্থায় প্রাণ দেহত্যাগ করিয়াছে। শুনিলাম পূর্বদিন রাত্রি দশটার সময় তিনি বলিয়াছিলেন আমার নাভিশ্বাস হইল যে, তৎপর তিনবার কালী নাম করিয়া সমাধিস্থ হন, তাহাতেই দেহত্যাগ করিয়া অমরধামে চলিয়া যান। সন্ধ্যাকালে ঘৃত ও চন্দন কাঠ সমুৎপন্ন প্রজ্জ্বলিত অগ্নি তাঁহার পবিত্র দেহকে গ্রাস করে। তাঁহার অনুগত শিষ্যগণ একে একে সকলেই পুত্রবৎ সেই ধর্মপিতার দেহে অগ্নিপ্রদান করেন। অনেক সুশিক্ষিত যুবকের সাধুভক্তি দেখিয়া আমরা বিশেষ প্রীতি লাভ করিয়াছি। বাবু সুরেন্দ্রনাথ মিত্র ও অন্য কেহ কেহ পরমহংসের চিকিৎসা ও সেবা শুশ্রূষায় অকাতরে অর্থব্যয় করিয়াছেন। এজন্য তাঁহারা সকলের কৃতজ্ঞতার পাত্র। অনেক প্রেরিত সেই দিন হইতে ৩।৪দিন হবিষ্যান্ন গ্রহণ ও শোকচিহ্ন ধারণ করিয়াছিলেন। ৯ই সোমবার পূর্বাহ্নে ডাক্তার শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের কাকুড়গাছিস্থ উদ্যানে পরমহংসের দেহভস্ম মহা সমারোহে প্রোথিত হইয়াছে। সে স্থানে অচিরেই একটি সুন্দর সমাধি স্তম্ভ স্থাপিত হইবার কথা আছে। বহু সংখ্যক ভক্ত সন্তান সংকীর্তন করিতে করিতে কাশীপুর হইতে ভস্ম সেখানে লইয়া যান। মধ্যাহ্নে তথায় তাঁহারা খেচরান্নাদি ভক্ষণ করেন। শুনিলাম প্রায় ৭ শত লোকের আহারের আয়োজন হইয়াছিল। অপরাহ্নে ভাই ত্রৈলোক্যনাথ সান্ন্যালও অপর ২।৩ জন প্রচারক এবং কতিপয় বিধান-বাদী ব্রাহ্ম সেই সমাধিস্থল দেখিতে গিয়াছিলেন। সে স্থানে ভাই গিরিশচন্দ্র সেন পরমহংসের উক্তি পাঠ ও ভাই ত্রৈলোক্যনাথ সান্ন্যাল মাতৃবিষয়ক কয়েকটি সঙ্গীত করেন। শ্রবণে আহ্লাদিত হইলাম। রামচন্দ্র বাবু নাকি স্বীয় উদ্যান পরমহংসদেবের নামে তাঁহার সমাধি স্তম্ভ ও কীর্তির জন্য উৎসর্গ করিয়াছেন।*

---

* সংবাদে আরও লেখা হয় "…বৃহস্পতিবার দিন মন্দিরে সন্ধ্যার পর ভাই ত্রৈলোক্যনাথ সান্ন্যাল স্বর্গগত পরমহংসের জীবন বিষয়ে বক্তৃতা করিয়াছিলেন। সে দিন দেবালয়ে পূর্বাহ্নে ৭টা হইতে পরমহংস সম্বন্ধে বিশেষভাবে উপাসনা প্রার্থনাদি হইয়াছিল। প্রেরিতবর্গ সকলে বিনামাবর্জন ও হবিষ্যান্ন করিয়া বিশেষভাবে সেইদিন যাপন করিয়াছিলেন।

স্বর্গীয় রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের অস্থিপূর্ণ তাম্র কলস লইয়া শোভা-যাত্রার বিবরণ সুলভ সমাচারে ১২ই ভাদ্র ১২৯৩ (২৭-এ আগস্ট ১৮৮৬) সালে প্রকাশিত হয়।*—

গত সোমবার (২৩ আগস্ট ১৮৮৬) প্রাতে নয়টার সময় সিমুলিয়া ষ্ট্রীটের ১৩ নম্বর ভবন হইতে সঙ্কীর্তন সহ অনেকগুলি ভদ্রলোক স্বর্গীয় রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের অস্থিপূর্ণ তাম্র কলস লইয়া সমাদরের সহিত বাহির হইলেন, দলে অনুমান পঞ্চাশ জন ভদ্রলোক ছিলেন। অগ্রে খোল করতাল সিঙ্গা সহ বিডন ষ্ট্রীটে থিয়েটারের কয়েকজন অভিনেতার একটি সঙ্কীর্তনের দল তৎপরে কতকগুলি সৌখীন যুবক পাখোয়াজের সহিত একটি নব রচিত সঙ্গীত করিতে করিতে চলিলেন। পরমহংস মহাশয়ের শিষ্যেরা ক্রমান্বয়ে উক্ত কলসটি মস্তকে করিয়া চলিতে লাগিলেন, ফুলের মালায় কলসীটি সুসজ্জিত করা হইয়াছিল, উপরে বহুমূল্য ছত্র ধরা হইয়াছিল, পার্শ্বে আড়ানী যোগে বাতাস করা হইতেছিল, দুই দিক হইতে চামর ব্যজন করা হইতেছিল, সর্ব পশ্চাতে নববিধানের প্রচারকদ্বয় অবনত মস্তকে গমন করিতে ছিলেন। সিমুলিয়া হইতে কাঁকুড়গাছির ৮০ সংখ্যক উদ্যানে পঁহুছিয়া একটি ইষ্টকনির্মিত সমাধিগহ্বরে কলসটি রাখিয়া পুষ্প অর্পণ পূর্বক অনেকে ভক্তি ভরে প্রণাম করিলেন, উদ্যানটি পত্র পুষ্প ও সামিয়ানায় সুশোভিত করা হইয়াছিল। তৎপরে বাবু যদুনাথ মিত্রের উদ্যানে উৎসব হইল।

ধর্মতত্ত্ব

১৬ ভাদ্র, মঙ্গলবার, ১৮০৮ শক। ভাগ ২১, সংখ্যা ১৬ ; পৃঃ ১৮১-৮৩

স্বর্গগত রামকৃষ্ণ পরমহংস

আমাদের দেশের কি দুর্ভাগ্য উপস্থিত ? ক্রমে ক্রমে পুণ্যাত্মা সাধু মহাপুরুষ সকলেই এদেশ হইতে অন্তর্হিত হইলেন। শ্রীমদাচার্য্যদেবের তিরোধানের পরই তাঁহার সঙ্গে যে কয়জন সাধুর জীবনের গূঢ় যোগ ও

* সমসাময়িক দৃষ্টিতে শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস বইটি থেকে উদ্ধৃত। সম্পাদক।

সম্বন্ধ ছিল, তাঁহারা একে একে তিরোহিত হইলেন। ডোমরাওঁয়ের শিখগুরু নাগাজি মানবলীলা সম্বরণ করিলেন, তৎপর গাজিপুরের গর্ত্তশায়ী পবনাহারী বাবা একেবারে অদৃশ্য হইয়া পড়িলেন, আচার্য্যের তিরোধানের অব্যবহিত সময়েই হলদিবাড়ির নাগাসন্ন্যাসী প্রস্থান করিলেন। যাঁহার সঙ্গে আচার্য্যদেবের সর্বাপেক্ষা অধিক যোগ ও বন্ধুতা ছিল, যিনি বিধানের এক প্রধান অঙ্গস্বরূপ হইয়াছিলেন, সম্প্রতি সেই সাধুরত্ন মহাত্মা রামকৃষ্ণ পরমহংস স্বর্গারোহণ করিয়াছেন। গতবারে আমরা তাঁহার স্বর্গারোহণের সংবাদ মাত্র প্রদান করিয়াছি এবার তাঁহার জীবনের বিশেষ বৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ করা যাইতেছে। সাধু চরিত্রের মাহাত্ম্য সাধু ভিন্ন অন্যলোকে অবধারণ করিতে পারে না, সুতরাং যথাযথ বর্ণনা করিতেও সক্ষম হয় না। আজ আচার্য্যদেব বিদ্যমান থাকিলে পরমহংসের জীবনের সৌন্দর্য্য ও গূঢ় গভীর ভাব লিখিয়া পাঠকবর্গকে উপহার দিতেন, সেরূপ আর তাঁহার জীবন কে বুঝিতে পারিয়াছে যে লিখিতে পারিবে? তবে আমরা আচার্য্যদেবের সংগে পুনঃ পুনঃ পরমহংসদেবের সহবাস করিয়া আচার্য্যের প্রভাবে ও ঈশ্বর করুণায় যতটা বুঝিতে পারিয়াছি ও তাঁহার জীবনের ঐতিহাসিক তত্ত্ব যত দূর অবগত হইয়াছি তাহা সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ করিতেছি।

আমাদের পরম ভক্তিভাজন শ্রীমদ্ রামকৃষ্ণ পরমহংস ১৭৫৬ শকে ১০ই ফাল্গুন বুধবার শুক্লপক্ষে দ্বিতীয়া তিথিতে হুগলী জিলার অধীন জাহানাবাদ উপবিভাগের অন্তর্গত শ্রীপুর কামারপুকুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, গত ৩১শে শ্রাবণ রবিবার রাত্রিতে তিনি ঐহিক লীলা সম্বরণ করিয়াছেন। তাঁহার বয়ঃক্রম ৫১ বৎসর পাঁচ মাস ২০ দিন হইয়াছিল। কণ্ঠনালীর ক্ষতরোগে তিনি বৎসরাধিক কাল ক্লেশ ভোগ করিয়া দেহত্যাগ করিয়াছেন। পরমহংসদেবের পিতার নাম ক্ষুধিরাম ভট্টাচার্য্য,* তিনি একজন সাধক যাজক ব্রাহ্মণ ছিলেন। ১০।১১ বৎসর বয়ঃক্রমের সময় হইতেই রামকৃষ্ণের অসাধারণ ধর্মানুরাগের লক্ষণ প্রকাশিত হইয়াছিল। কোন স্থানে যোগী সন্ন্যাসী দেখিতে পাইলে তথায় যাইয়া

* চট্টোপাধ্যায়। —সম্পাদক।

বসিয়া থাকিতেন। পিতা পরিধানের জন্য বস্ত্র প্রদান করিতেন, তিনি তাহা ছিঁড়িয়া কৌপীন করিয়া পরিতেন। রামকৃষ্ণ লেখা পড়ার চর্চা প্রায় কিছুই করেন নাই। রীতিমত দুইচারি ছত্র লিখিতে বা পড়িতে পারিতেন কিনা সন্দেহ। তিনি পুরাণাদি শাস্ত্রের অনেক তত্ত্ব রাখিতেন, পৌরাণিক অনেক সুন্দর সুন্দর উপাখ্যান সচরাচর বলিতেন, তাহা পুস্তক পাঠ করিয়া শিক্ষা করিয়াছেন এরূপ নহে, শাস্ত্রবিৎ পাঠকদিগের মুখে শ্রবণ করিয়া শিখিয়াছিলেন। তাঁহার অসাধারণ মেধা ও বুদ্ধি শক্তি ছিল, যাহা একবার শ্রবণ করিতেন তাহা কখন ভুলিতেন না। ধর্মের সুকঠিন জটিল বিষয় অতি সহজে হৃদয়ংগম করিতে পারিতেন। শ্রুত হইল, বিদ্যা শিক্ষা করিলে পৌরহিত্য করিতে হইবে বলিয়াই তিনি তাহা হইতে বিরত ছিলেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা একজন পণ্ডিত ছিলেন। কলিকাতায় অবস্থান করিয়া শাস্ত্রালোচনা করিতেন। রামকৃষ্ণ কিছু কাল জ্যেষ্ঠের সংগে কলিকাতায় অবস্থিতি করেন। যখন রাণী রাসমণি দক্ষিণেশ্বরে মহাসমারোহপূর্বক কালীমূর্তি প্রতিষ্ঠা করেন, তখন রামকৃষ্ণ স্বীয় জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার সংগে তথায় নিমন্ত্রিত হইয়া গিয়াছিলেন। তৎকালে তাঁহার বয়ঃক্রম অষ্টাদশ বর্ষ ছিল। রাণী রাসমণির জামাতা মথুরানাথ বাবু, রামকৃষ্ণের সংসারের প্রতি ঔদাসীন্য ও অসাধারণ ধর্মানুরাগ দেখিয়া বিমুগ্ধ হন ও তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধা ও প্রীতি প্রকাশ করিতে থাকেন। কিছুকাল পরে মথুরবাবু তাঁহাকে কালীদেবীর মন্দিরে পূজা ও পরিচর্য্যার কার্যে নিযুক্ত করেন। রামকৃষ্ণ এইভাবে কিছু দিন দক্ষিণেশ্বরের দেবালয়ে অবস্থিতি করেন। পুষ্প চন্দনাদি দ্বারা ঠাকুর সাজাইতেন ও দেবালয়ে প্রসাদ ভক্ষণ করিতেন। একদিন তিনি কালীপূজা করিতে বসিয়া পুষ্প চন্দনাদি বিগ্রহের মস্তকে অর্পণ না করিয়া নিজের মস্তকে স্থাপন করেন। কখন কখন তিনি কালীর বেদীর উপর উঠিয়া বসিয়াছিলেন। এতদ্দর্শনে রামকৃষ্ণের প্রতি মথুরবাবুর ভক্তি আরও বৃদ্ধি হয়। তিনি তাঁহার প্রতি বিশেষ আদর ও যত্ন প্রদর্শন করিতে থাকেন। তদবধি নবযুবক রামকৃষ্ণ রিপুদমন ও যোগসাধনে প্রবৃত্ত হইয়া কঠোর তপস্যা আরম্ভ করেন। উক্ত দেবালয়ের সন্নিহিত ভাগীরথীতীরে পঞ্চবটীমূলে তাঁহার তপস্যাক্ষেত্র।

ক্রমাগত ৮ বৎসর কাল দুঃসহ তপশ্চরণে অনশনে অনিদ্রায় শরীরকে জীর্ণ-শীর্ণ করেন। তিনি যোগশাস্ত্রাদি বিহিত নির্দিষ্ট প্রণালী অনুসারে সাধন করেন নাই। আন্তরিক ব্যাকুলতা দ্বারা পরিচালিত হইয়া রিপুদমন, বৈরাগ্য ও চিত্তশুদ্ধির জন্য এবং যোগসাধন ঈশ্বরদর্শনের জন্য নানা পন্থা ও নানা উপায় অবলম্বন করিয়াছিলেন। কখন নারী সাজিয়া সখীভাবে সাধন করিয়াছেন। কখন প্যাঁজ ভক্ষণ করিয়া মোসলমানের বেশে আল্লা আল্লা জপ করিয়াছেন, কখন বা পুচ্ছ ধারণ করিয়া হনুমান সাজিয়া রাম রাম বলিয়াছেন। তাঁহার কোন সহচর বলিয়াছেন যে দশ বৎসর তাঁহাকে রীতিমত নিদ্রা যাইতে দেখা যায় নাই। তাঁহার শরীরে এরূপে উত্তাপ বৃদ্ধি পাইয়াছিল যে শীতকালের রজনীতেও তাঁহার গাত্রদাহ নিবারণের জন্য গাত্রে মাখন মর্দন করিতে হইত। অনেক দিন তিনি সূর্য্যাস্ত গমনকালে ভাগীরথীতীরে মা, দিন তো চলিয়া গেল, কিছুই যে হইল না। এই বলিয়া ভেউ ভেউ করিয়া কাঁদিতেন। ইদানীং কোন বন্ধু তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন ঈশ্বরলাভের উপায় কি? তিনি বলিলেন যে, ব্যাকুলতাই তাহার উপায়। ঈশ্বরের কৃপা ভিন্ন ব্যাকুলতার সঞ্চার হয় না। এক সময় আমার উপরে ব্যাকুলতার ঝড় বহিয়া ছিল। প্রথম হইতে তিনি কামিনী কাঞ্চনকে ঈশ্বর পথের প্রবল শত্রু জানিয়া এই দুইয়ের ঘোর বিরোধী হন। কঠোর সাধনাবলে কামিনী কাঞ্চনের উপর সম্পূর্ণ জয়লাভ করেন। কামিনীর উপর জয়লাভ করিবার জন্য ভৈরবী পূজা করিয়াছেন, স্বয়ং অলংকার পরিধান করিয়া স্ত্রী সাজিয়া সাধন করিয়াছেন। নারীমাত্রকে দেখিলেই তিনি প্রণাম করিতেন ও তাঁহাদের মধ্যে ভগবতীর আবির্ভাব প্রত্যক্ষ করিতেন। যখন বিবাহ হয়, তখন তাঁহার ভার্য্যার সপ্তম বর্ষ বয়ঃক্রম ছিল। স্ত্রীর নবমবর্ষ বয়ঃক্রমকালে রামকৃষ্ণ চলিয়া আইসেন। এ জীবনে স্ত্রীকে কখন শারীরিকভাবে সাংসারিকভাবে গ্রহণ করেন নাই। বহুকাল পরে পত্নীকে নিকটে আশ্রয় দিয়াছিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার সঙ্গে কিছুমাত্র সাংসারিক সম্বন্ধ স্থাপন করেন নাই, তিনি জিতেন্দ্রিয়-যোগীর ন্যায় থাকিতেন। রামকৃষ্ণ সাধনের অবস্থায় টাকা মাটী, টাকা

মাটী বলিয়া টাকা গঙ্গার জলে ছুড়িয়া ফেলিয়া দিতেন। মথুরবাবুর প্রদত্ত ভাল ভাল বস্ত্র ও শাল দোশালা ছিল, তাহার কিয়দংশ অগ্নিতে দগ্ধ করেন। কতকগুলির মধ্যে থুথু দিয়া মাটি মাখিয়া লোকদিগকে বিতরণ করিয়া ফেলিয়াছিলেন। পরে এরূপ অবস্থা হয় যে, টাকা মোহর স্পর্শ করিলে তাঁহার হস্ত অসাড় হইয়া যাইত। এক দিনও তিনি অন্ন বস্ত্রের জন্য চিন্তা করেন নাই, কখন কিছু সঞ্চয় করিয়া রাখেন নাই। সংসারের প্রতি তাঁহার একান্ত বিরাগ ছিল, সংসারী লোকের প্রতি কিছুমাত্র আস্থা ছিল না। তিনি ধনী, বড় মানুষ, জ্ঞানী পণ্ডিত কাহাকেও বিন্দুমাত্র ভয় করিতেন না, সকলকে স্পষ্ট কথা কহিতেন, অনেক সময় শক্ত শুনাইয়া দিতেন। তাহাতে অনেক বড় লোক তাঁহার প্রতি অসন্তুষ্ট ছিল। একদা একজন বিখ্যাত ধনী তাঁহার নিকট আসিয়া কিছুকাল কথোপকথনের পর পরমহংসদেবকে বলিয়া ছিলেন যে, আপনার অন্ন বস্ত্রের ক্লেশ হয় দেখিতেছি, আমি কয়েক সহস্র টাকার কোম্পানীর কাগজ আপনার জন্য রাখিতে চাহি, তাহার সুদে নিয়মিত ব্যয় নির্বাহ হইবে, তাহা হইলে আর আপনার কোন কষ্ট হইবে না। এইকথা শুনিয়া রামকৃষ্ণ সেই ধনীর মুখের দিকে কটমট করিয়া তাকাইয়া বলিলেন, "দুঃ শ্যালা।" তাহাতে বড় লোকটির মুখ চূণ হইয়া গেল। তিনি বিষন্নভাবে মাথা হেঁট করিয়া রহিলেন। এইরূপ নিঃসম্বল বৈরাগী পুরুষের পীড়ার অবস্থায় চিকিৎসাদির জন্য প্রায় বৎসরাবধি কাল প্রতি মাসে দেড় শত দুই শত টাকা করিয়া ব্যয় হইয়াছে। প্রায় এক শত টাকা ভাড়া করিয়া কাশীপুরে সুন্দর বাগান বাটীতে তাঁহাকে রাখা হইয়াছিল। ইহা অপেক্ষা আশ্চর্য ব্যাপার আর কি আছে? ৮ বৎসর পর রামকৃষ্ণ সিদ্ধিলাভ করেন, তাঁহার জীবনে যেমন যোগ ও সমাধির ভাব, তেমন ভক্তির মত্ততা প্রকাশ পায়। শ্রীমদ্ভাগবতে প্রমত্ত ভক্তের লক্ষণ উল্লিখিত হইয়াছে যে "ক্কচিদ্রুদন্ত্যচ্যুত-চিন্তয়া ক্কচিদ্ধসন্তি নন্দন্তি বদন্ত্যলৌকিকাঃ, নৃত্যন্তি গায়ন্ত্যনুশীলয়ন্ত্যজং ভবন্তি তূষ্ণীং পরমেত্য নিবৃতাঃ।" "ভক্তগণ সেই অবিনাশী ঈশ্বরের চিন্তনে কখন কখন রোদন করেন, কখন হাস্য করেন, কখন আনন্দিত হন, কখন অলৌকিক কথা বলেন, কখন নৃত্য করেন, কখন তাঁহার নাম গান

করেন, কখন তাঁহার গুণানুকীর্ত্তন করিতে করিতে অশ্রু বিসর্জন করেন।"পরমহংস মহাশয়ের জীবনেএ সমুদায় লক্ষণই লক্ষিত হইয়াছিল। তিনি ঈশ্বরদর্শন যোগ ও প্রেমের গভীর কথা সকল বলিতে বলিতে এবং মধুর সঙ্গীত করিতে করিতে প্রগাঢ় ভক্তিতে উচ্ছ্বাসিত ও উম্মত্ত হইয়া পড়িতেন, সমাধিমগ্ন হইয়া জড় পুত্তলিকার ন্যায় নিশ্চেষ্ট হইয়া থাকিতেন, হাসিতেন কাঁদিতেন, সুরামত্তের ন্যায় শিশুর ন্যায় ব্যবহার করিতেন। সেই প্রমত্ততার অবস্থায় কত গভীর গূঢ় আধ্যাত্মিক কথাসকল বলিয়া চমৎকৃত করিয়াছেন। বাস্তবিক তাঁহার স্বর্গীয় ভাব দর্শনে পুণ্যের সঞ্চার হইত, পাষণ্ডের পাষণ্ডতা ও নাস্তিকের নাস্তিকতা চূর্ণ হইয়া যাইত। কত সুরাপায়ী ব্যভিচারী নাস্তিক তাঁহার ভাবের উচ্ছ্বাস, ভক্তির মত্ততা অলৌকিক জীবন দেখিয়া ধার্মিক সচ্চরিত্র হইয়াছে। তিনি একজন নিরক্ষর অশিক্ষিত লোক ছিলেন, তথাপি তাঁহার পবিত্র জীবনের প্রভাবে বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ উপাধিধারী পণ্ডিতগণও তাঁহার পদানত হইয়া শিষ্যত্ব স্বীকার করিয়াছেন। তিনি সামান্য গ্রাম্য ভাষায় ও গ্রাম্য দৃষ্টান্ত যোগে অতি সুন্দর সুন্দর গভীর আধ্যাত্মিক তত্ত্ব সকল প্রকাশ করিতেন। তাঁহার এমন ভাবের মাধুর্য্য ও কথার জমাট ছিল যে, নিতান্ত সন্তাপিত আত্মা ক্ষণকাল তাঁহার নিকটে বসিলে দুঃখ শোক ভুলিয়া যাইত। তাঁহার সহাস্য বদন ও সরল বাল্যভাব মার নামেতে মত্ততা, সমাধি-নিমগ্নতা দেখিলে প্রাণ মুগ্ধ হইত। অনেক সময় ঈশ্বরপ্রসঙ্গমাত্র তাঁহার সমাধি হইত, তদবস্থায় নয়ন পলকশূন্য স্থির, উভয় নেত্রে প্রেমধারা, মুখে সুমধুর হাসি, বাহ্য চৈতন্যশূন্য সর্বাঙ্গ স্পন্দহীন মৃৎপ্রস্তরের ন্যায় হইয়া যাইত, কর্ণে পুনঃ পুনঃ উচ্চৈঃস্বরে ওঁ শব্দ উচ্চারণ করিলে ক্রমে চৈতন্যোদয় হইত। তিনি কোন বাঁধাবাঁধি নিয়ম ও সভ্যতা জানিতেন না। অনেক সময় অশ্লীল কথা উচ্চারণ করিতেন, কিন্তু মনে কোনরূপ কুভাবের লেশমাত্র ছিল না। ধর্মচর্চা ঈশ্বরপ্রসঙ্গ ভিন্ন সাংসারিক কথা বলিতেন না। কথায় তিনি অত্যন্ত রসিকতা ও প্রত্যুৎপন্নবুদ্ধির পরিচয় দিতেন। তাঁহার উপাস্য দেবতা সাকার নিরাকার মিশ্রিত ছিল, তিনি কালী ও মা বলিয়া আনন্দাশ্রু বর্ষণ করিতেন ও মত্ত হইতেন। জিজ্ঞাসা

৬

মতে তিনি বলিয়াছিলেন যে আমি হস্তনির্মিত খড় ও মাটির কালী মানি না, আমার কালী চিন্ময়ী, আমার মা ঘন সচ্চিদানন্দ। যাহা বৃহৎ ও গভীর তাহাই কাল বর্ণ, সুবিস্তৃত আকাশ কাল বর্ণ সুগভীর সমুদ্র কাল বর্ণ। আমার কালী অনন্ত সর্বব্যাপিনী চিদ্রূপিণী। তিনি মূর্ত্তি পূজা করিতেন না। পরমহংসদেব এক দিন পথ দিয়া যাইতে একজন লোককে কুঠার দ্বারা বৃক্ষচ্ছেদন করিতে দেখিয়া কাঁদিয়া উঠেন, এবং বলেন "আমার মা যে এইবৃক্ষে বিরাজ করিতেছেন, তাঁহার উপরে কুঠারের আঘাত লাগিতেছে। তাঁহার যেমন শাক্ত ভাব তেমনি বৈষ্ণব ভাব ও তেমনি ঋষি ভাব ছিল। তাঁহাতে যোগ ভক্তির আশ্চর্য্য সম্মিলন ছিল, তিনি হরিনামে গৌরসিংহের ন্যায় প্রমত্ত হইয়া তালে তালে সুন্দর নৃত্য করিতেন, নৃত্য-কালে অনেক সময় ভাবে বিভোর হইয়া উলঙ্গ হইয়া পড়িতেন। আবার গভীর যোগসমাধিতে, একেবারে স্পন্দহীন বাহ্য জ্ঞানশূন্য হইয়া থাকিতেন, অকপট বাল্যভাব ভক্তিভাব ঋষিভাব সমুদায় তাঁহাতে পূর্ণভাবে লক্ষিত হইয়াছে। সাধনার প্রথম হইতে তাঁহার জীবনে ধর্মসমন্বয় ও নববিধানের পূর্বাভাস প্রকাশ পাইয়াছে। সেই উদার ভাবের ভাবুক না হইলে কি তিনি কখন প্যাঁজ খাইয়া আল্লা নাম জপ করিতেন ? তিনি যে গৃহে বাস করিতেন গৌর নিত্যানন্দ ইত্যাদির ছবির সঙ্গে যিশুখ্রীষ্টের ছবিও প্রাচীরে লটকাইয়া রাখিয়াছিলেন। তিনি গৈরিক বস্ত্র পরিধান করিয়া বাহ্য সাধুতা প্রকাশ করিতেন না, তাঁহাকে অনেক সময় কাল পেড়ে ধুতি পরিতে দেখা গিয়াছে। যজ্ঞোপবীত স্কন্ধে ধারণ করিতেন বটে, কখন কখন তাহা জীবনের বন্ধন বলিয়া দূরে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিতেন। সাধনার সময় হইতে তাঁহার ভাগিনের হৃদয় ভট্টাচার্য ছায়ার ন্যায় তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে থাকিয়া বহু বৎসর শ্রদ্ধার সহিত তাঁহার সেবা করিয়াছেন। তিনি খাওয়াইয়া দিতেন, কাপড় পরাইতেন,' উপবীত ফেলিয়া দিলে গলায় পরাইয়া দিতেন। (ক্রমশঃ)

(গত প্রকাশিতের শেষ)

ধর্মতত্ত্ব, ১লা আশ্বিন ১৮০৮ শক

[২১ ভাগ-১৭ সংখ্যা। পৃঃ ১৯৪-১৯৯]

রামকৃষ্ণ সর্বদা দক্ষিণেশ্বরের দেবালয়ের প্রান্তস্থ ভাগীরথী তীরে একটি একতলা ঘরে অবস্থিতি করিতেন। অন্য কোথাও প্রায় তাঁহার গতিবিধি ছিল না, কদাচিৎ স্বদেশে যাইতেন। পূর্বে একবার মথুরবাবুর সঙ্গে তীর্থ পর্য্যটন করিয়া আসিয়াছিলেন। দক্ষিণেশ্বরে তিনি আপনার ভাবে আপনি মগ্ন, যোগ সমাধি ও ভক্তির মত্ততায় বিহ্বল হইয়া থাকিতেন। লোক জন বড় তাঁহার নিকট যাইত না। প্রায় কাহার নিকটে তিনি বিশেষ পরিচিত ছিলেন না। দক্ষিণেশ্বরের গ্রামের লোক তাঁহাকে উন্মাদগ্রস্ত বলিয়াই জানিত। ভাগিনেয় হৃদয় ভট্টাচার্য্য অনুক্ষণ শ্রদ্ধার সহিত তাঁহার সেবাশুশ্রূষা করিতেন। ১৮৭২ সালে ফাল্গুন কি চৈত্র মাসে একদিন পূর্বাহ্নে ৮।৯ টার সময় পরমহংসদেব হৃদয়কে সঙ্গে করিয়া বাবু জয়গোপাল সেনের বেলঘরিয়াস্থ উদ্যানে উপস্থিত হন। তখন আচার্য্য কেশবচন্দ্র সেন প্রচারকবর্গ সহ উক্ত উদ্যানে সাধন ভজনে রত ছিলেন, তরুতলে রন্ধন করিয়া ভোজন করিতেন, আত্মসংযমন ও বৈরাগ্যসাধনের বিশেষ বিশেষ কঠোর নিয়ম অবলম্বন করিয়াছিলেন। পরমহংস, আচার্য-দেবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিবার জন্য প্রথমতঃ তাঁহার কলুটোলাস্থ বাড়ীতে উপস্থিত হইয়া ছিলেন। তিনি উক্ত উদ্যানে সাধন ভজন অবলম্বন করিয়া বাস করিতেছেন শুনিয়া পরমহংসদেব তথায় গমন করেন। তখন আচার্য্য-দেব বন্ধুবর্গ সহ সরোবরের বাঁধা ঘাটে বসিয়া স্নানের উদ্যোগ করিতে-ছিলেন। ইতিমধ্যে রামকৃষ্ণ একখানা ছেকড়া গাড়ীযোগে সেখানে উপস্থিত হন। প্রথমতঃ হৃদয় গাড়ী হইতে নামিয়া আচার্যদেবকে বলেন যে, আমার মামা হরিপ্রসঙ্গ শুনিতে ভালবাসেন, মহাভাবে তাঁহার সমাধি হইয়া থাকে। তিনি আপনার মুখে ঈশ্বরগুণানুকীর্তন শুনিতে আসিয়াছেন। এই বলিয়া হৃদয় ভট্টাচার্য্য পরমহংসদেবকে গাড়ী হইতে নামাইয়া লইয়া আসেন। তখন পরমহংসদেবের পরিধানে একখানা

পাড়ওয়ালা ধুতিমাত্র ছিল, পিরান বা উত্তরীয় বস্ত্র গায়ে ছিল না। ধুতির কোঁচা খুলিয়া কাঁধে ফেলিয়া ছিলেন। দেহ জীর্ণ ও দুর্বল। প্রচারকগণ দেখিয়া তাঁহাকে একজন সামান্য লোক বলিয়া মনে করিলেন। তিনি নিকটে আসিয়াই বলেন যে বাবু তোমরা নাকি ঈশ্বর দর্শন করিয়া থাক, সে দর্শন কিরূপ আমি জানিতে চাহি। এইরূপে সংপ্রসংগ আরম্ভ হয়। পরে পরমহংস একটি রামপ্রসাদী গান করেন। গান করিতে করিতে তাঁহার সমাধি হয়। তখন এই সমাধির ভাব দেখিয়া কেহই উচ্চভাব বলিয়া মনে করেন নাই, প্রচারকেরা এই এক প্রকার ভেল্কি বলিয়া সিদ্ধান্ত করেন। সমাধি প্রাপ্তির অব্যবহিত পরে হৃদয় ভট্টাচার্য্য উচ্চৈঃস্বরে ওঁ ওঁ বলিতে থাকেন ও সকলকে তদ্রূপ ওঁ শব্দ উচ্চারণ করিতে অনুরোধ করেন। তদানুসারে তাঁহারাও সকলে ওঁ বলিতে থাকেন। কিয়ৎক্ষণ পরে পরমহংস কিঞ্চিৎ চৈতন্য লাভ করিয়া হাসিতে লাগিলেন, তৎপর প্রমত্তভাবে গভীর কথা সকল বলিতে লাগিলেন। দেখিয়া প্রচারকগণ স্তম্ভিত হইলেন। তখন তাঁহারা বুঝিতে পারিলেন যে রামকৃষ্ণ একজন স্বর্গীয় পুরুষ, তিনি সহজ লোক নন। তাঁহার সংগ পাইয়া আমোদে মত্ত হইয়া সকলে স্নান উপাসনা ভুলিয়া গেলেন। সে দিন অনেক বেলায় তাঁহাদিগকে স্নানাদি করিতে হইয়াছিল। সেই দিবস পরমহংস "গরুর পালে অন্য পশু আসিলে গরু সিং দিয়া তাহাকে তাড়াইয়া দেয়, কিন্তু গরু আসিলে স্বজাতি বলিয়া গা চাটাচাটি করে।" "বেংগাচির লেজ খসিয়া পড়িলেই ডাংগায় লাফিয়া বেড়ায়" ইত্যাদি কথা বলিয়াছিলেন। সাধু সাধুকে চিনিতে পারেন। পরমহংসকে দেখিয়া আচার্য্য মহাশয় মুগ্ধ হন, পরমহংসও তাঁহার প্রতি বিশেষ আকৃষ্ট হইয়া পড়েন। তখন হইতে উভয়ের আত্মায় আত্মায় গূঢ় যোগ হয়। সময়ে সময়ে আচার্য্যদেব দলবলে দক্ষিণেশ্বরে পরমহংসের নিকটে যাইতেন, পরমহংসও হৃদয়কে সংগে করিয়া আচার্য্য-ভবনে আসিতেন। পরমহংস পদার্পণ করিলে তাঁহাকে দর্শন করিবার জন্য আচার্য্যদেবের প্রতিবেশী আত্মীয় বন্ধু সকল লোক আসিয়া জুটিত, লোকের ভিড় হইত। পাঁচ ঘন্টা ব্যাপিয়া ধর্ম প্রসংগে কত আনন্দের

স্রোত ও মত্ততার ব্যাপার চলিত। প্রতি উৎসবের পর বাষ্পীয় পোত বা নৌকা আরোহণে ব্রাহ্মমণ্ডলীসহ আচার্য্য মহাশয় পরমহংসদেবের নিকট যাইতেন কখন কখন বেলঘরিয়ার তপোবনে যাইয়া গাড়ী পাঠাইয়া তাঁহাকে লইয়া আসিতেন। উৎসবান্তে তাঁহাকে লইয়া আমোদ করা উৎসবের অঙ্গ মধ্যে পরিগণিত ছিল। পরমহংস দ্বারা আচার্যদেব আচার্য্য দ্বারা পরমহংসদেব জীবনে বিশেষ উপকৃত হইয়া ছিলেন। পরমহংসের জীবন হইতেই ঈশ্বরের মাতৃভাব ব্রাহ্মসমাজে সঞ্চারিত হয়। সরল শিশুর ন্যায় ঈশ্বরকে সুমধুর মা নামে সম্বোধন, এবং তাঁহার নিকটে শিশুর মত প্রার্থনা ও আবদার করা এই অবস্থাটি পরমহংস হইতেই আচার্যদেব বিশেষরূপে প্রাপ্ত হন। পূর্বে ব্রাহ্মধর্ম শুষ্ক তর্ক ও জ্ঞানের ধর্ম ছিল, পরমহংসের জীবনের ছায়া পড়িয়া ব্রাহ্মধর্মকে সরস করিয়া তোলে। পরমহংসও আচার্য্যের জীবনের সাহায্য পাইয়া নিরাকার ঈশ্বরের দিকে অধিকতর অগ্রসর হন, ধর্মের উদারতা ও কিয়ৎ পরিমাণে সভ্যতার নিয়ম নিষ্ঠালাভ করেন। যখন আচার্য্যদেব দলবলে পরমহংসের নিকটে এবং পরমহংসদেব আচার্যের ভবনে পুনঃ পুনঃ গমনাগমন করিতে লাগিলেন, এবং পরমহংসদেবের উচ্চ ধর্মভাব ও চরিত্র পুস্তক ও পত্রিকায় আচার্য্যদেব প্রকাশ করিতে লাগিলেন, মিরার* ও ধর্মতত্ত্বে তাহার বিবরণ সকল লিখা হইল, পরমহংসের ভক্তি নামধেয় ক্ষুদ্র পুস্তক প্রচারিত হইল, তখন হইতে তিনি সর্বত্র পরিচিত হইলেন। সচরাচর ব্রাহ্মগণ তো উপদেশ ও শিক্ষা লাভ করিবার জন্য তাঁহার নিকটে যাইতেন, ব্রাহ্ম ব্যতীত অপর শ্রেণীর নরনারীও দলে দলে গমনাগমন করিতেন। নূতন ধর্ম ও সত্য প্রচার বা একটা নূতন মন্ডলী স্থাপন করা পরমহংসের জীবনের লক্ষ্য ছিল না। কেহ উপদেশ প্রার্থনা করিলে বলিতেন, ইহা এ আধারে নয়, সে আধারে, অর্থাৎ কেশবচন্দ্র। কিন্তু পরে অনেক লোককে তিনি সাধন ভজন সম্বন্ধে রীতিমত উপদেশ দিয়াছেন। অনেক সুশিক্ষিত যুবক অনুগত শিষ্য হইয়া তাঁহা কর্তৃক উপদিষ্ট হইয়াছিলেন। শুনিলাম ন্যূনাধিক

* The Indian Mirror - সম্পাদক।

পাঁচশত স্ত্রী পুরুষ তাঁহার শিষ্য শ্রেণী ভুক্ত হইয়াছে কিন্তু তিনি কাহাকেও শিষ্য বলিতেন না, এবং আপনাকে গুরু বলিয়া স্বীকার করিতেন না। তিনি প্রচলিত পৌরহিত্য ও গুরু ব্যবসায়ের অত্যন্ত বিরোধী ছিলেন।

পরমহংসের মানুষ চিনিবার শক্তি আশ্চর্য ছিল, তিনি কোন লোকের মুখ দেখিয়া ও দুই একটি কথা শুনিয়াই বুঝিতে পারিতেন সে কি ধাতুর লোক। রামকৃষ্ণ বলিয়াছেন যে, "বহুকাল পূর্বে আমি একদিন বুধবারে জোড়াসাঁকোর ব্রাহ্মসমাজ দেখিতে গিয়াছিলাম, তখন দেখিলাম, নব যুবক কেশবচন্দ্র বেদীতে বসে উপাসনা করিতেছেন। দুই পার্শ্বে শত শত উপাসক বসে আছেন। ভাল করে তাকায়ে দেখলাম যে, কেশবচন্দ্রের মনটা ব্রহ্মেতে মজে গেছে, তাঁর ফাতনা ডুবেছে, সেদিন হইতেই তাঁর প্রতি আমার মন আকৃষ্ট হয়ে পড়িল। আর যে সকল লোক উপাসনা করিতে বসেছিল, দেখলাম যেন তারা ঢাল তলওয়ার বর্শা লইয়া বসে আছে, তাদের মুখ দেখিয়াই বুঝা গেল, সংসারাসক্তি রাগ অভিমান ও রিপু সকল যেন ভিতরে কিলু বিলু করছে।" পরমহংসদেবের সেই হইতেই আচার্য্য মহাশয়ের প্রতি অনুরাগের সঞ্চার হইয়াছিল। কিন্তু আচার্য্যদেব তাঁহাকে কিছুই জানিতেন না। অনেক বৎসর পরে শুভক্ষণে বেলঘরিয়ায় দুই জনের গাঢ় সম্মিলন হয়, তখন তাঁহার সঙ্গে যোগ স্থাপিত হওয়া ব্রাহ্ম সাধক-দিগের পক্ষে বিশেষ আবশ্যক হইয়াছিল। উহা বিধাতার কার্য বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। পরমহংসদেবের সমুদায় ধর্মমতে যদিচ আমরা ঐক্য স্থাপন করিতে পারি না কোন কোন মত ব্রাহ্মধর্মের অননুমোদিত বলিয়া জানি, তথাপি তাঁহার যোগ ভক্তিপ্রধান সমুন্নত জীবন যে নববিধানের উন্নতি সাধনে বিধাতা কর্তৃক ব্যবহৃত হইয়াছে তাহাতে কিছুমাত্র আমাদের সন্দেহ হইতে পারে না। পরম ধার্মিক মহাপণ্ডিত জগদ্বিখ্যাত কেশবচন্দ্র সেই নিরক্ষর পরমহংসের নিকটে শিষ্যের ন্যায় কনিষ্ঠের ন্যায় বিনীতভাবে এক পার্শ্বে বসিতেন, আদর ও শ্রদ্ধার সহিত তাঁহার কথা সকল শ্রবণ করিতেন। কোনরূপ তর্কবিতর্ক করিতেন না। পরমহংসের জীবনের মূল্যবান জিনিষ সকল বেশ করিয়া আপন জীবনে আয়ত্ত ও আদায় করিতেন। সাধুভক্তি কিরূপে করিতে হয় সাধু হইতে

সাধুতা কি ভাবে গ্রহণ করিতে হয় কেশবচন্দ্র দেখাইয়া গিয়াছেন। অনেক দিন পরমহংসের নিকট যাওয়ার পূর্বে দেবালয়ে উপাসনার সময় সাধুভক্তি বিষয়ে তিনি প্রার্থনাদি করিয়া প্রস্তুত হইয়া গিয়াছেন। দক্ষিণেশ্বরে গেলে পরমহংস কোনদিন আমাদিগকে কিছু না খাওয়াইয়া ছাড়িয়া দিতেন না। তিনিও আচার্য্য ভবনে আসিয়া অনেক দিন লুচি তরকারী ইত্যাদি ভক্ষণ করিতেন, এমন কি ক্ষুধা হইলে খাবার চাহিয়া খাইতেন। বরফ তাঁহার অতিশয় প্রিয় ছিল, তিনি পদার্পণ করিলে আচার্য্যদেব তাঁহার জন্য বরফ আনাইতেন। কখন কখন দক্ষিণেশ্বরেও বরফ পাঠাইয়া দিতেন। পরমহংস জিলিপি খাইতে ভালবাসিতেন। একদিন মিষ্টান্নাদি খাওয়া হইলে কেহ কেহ আরও খাওয়ার জন্য তাঁহাকে অনুরোধ করেন, তিনি বলেন, "আমার গলা পর্যন্ত পূর্ণ আর একটি সর্ষপ পরিমাণ দ্রব্যের ভিতরে প্রবেশ করিবার পথ নাই। তবে জিলিপির পথ হবে, জিলিপি হলে একখানা খাইতে পারি।" কেহ জিজ্ঞেস করিলেন, "যখন একেবারে পথ নাই, তখন জিলিপির পথ কেমন করে হবে।" তিনি বলিলেন, "যেমন কোন মেলা উপলক্ষে রাস্তায় গাড়ীর অত্যন্ত ভিড় হয়, পথ একেবারে বন্ধ হইয়া যায়। একটি মানুষও কষ্টে সৃষ্টে চলিতে পারে না, তবে এ অবস্থায় যদি লাট সাহেবের গাড়ী আসে, অন্য অন্য গাড়ী সরিয়া স্থান করিয়া দেয়, এইরূপ জিলিপি খাইবার পথ হবে, অন্য অন্য খাদ্য দ্রব্য জিলিপিকে সম্মান করিয়া পথ ছাড়িয়া দিবে।" আচার্য্যদেবের শেষ অবস্থায় সংকট পীড়ার সময় পরমহংসদেব আসিয়া তাঁহাকে একবার দেখিয়া গিয়াছিলেন। তখন দুইজনের পরস্পর খুব ভাবের কথা হইয়াছিল। পরমহংস একদিন অপরাহ্নে কোন প্রচারকের সঙ্গে ব্রাহ্মমন্দির দেখিতে গিয়াছিলেন। মন্দিরের ভিতরে প্রবেশ করিয়া "এখানে তিন শত লোক নিরাকার ঈশ্বরের পূজা করেন, তাঁহার নাম করেন।" এই বলিয়াই ভাবে বিহ্বল হইয়া পড়েন। তিনি উপাসনায় কোনদিন যোগ দেন নাই, যোগ দিবেন কি, পূর্বেই যে বিহ্বল হইয়া পড়িতেন।

আচার্য্যের স্বর্গারোহণের সংবাদ শুনিয়া পরমহংস অত্যন্ত শোকাকুল হন, তিনি বলেন, "কেশব চলে যাওয়াতে আমার জীবনের অর্দ্ধেক চলে

গিয়াছে। কেশব প্রকান্ড বটবৃক্ষের ন্যায় ছিলেন, শত সহস্র লোক তাঁহার আশ্রয় পেয়ে শীতল হয়, সেরূপ বৃক্ষ আর কোথায়? আমরা সুপারি গাছ তাল গাছের মত, শীতল ছায়া দানে একটি লোককেও তৃপ্ত করিতে পারি না।"

কিছু দিন হইল আচার্য্যদেবের একখানা ছবি পরমহংসদেবের গৃহে তাঁহার একজন শিষ্য টাঙ্গাইতে গিয়াছিল, তিনি সেই ছবি দেখিয়া কাঁদিয়া উঠেন, এবং বলেন, "এ ছবি আমার কাছে রেখ না, ছবিতে কেশবচন্দ্রকে দেখতে আমার প্রাণ ফেটে যায়।" আচার্য্যমাতা ও আচার্য্য পত্নী এবং তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীমান করুণাচন্দ্র ও দ্বিতীয় পুত্র শ্রীমান নির্মল চন্দ্র একদিন পীড়িতাবস্থায় পরমহংসদেবকে দেখিতে গিয়াছিলেন। তিনি তাঁহাদিগকে দেখিয়া কাঁদিতে লাগিলেন, তাঁহাদের প্রতি অনেক আদর যত্ন প্রকাশ করিলেন, করুণাচন্দ্র ও নির্মলচন্দ্রকে আপনার পার্শ্বে বসাইয়া গায়ে হাত বুলাইয়া অনেক স্নেহমাখা কথা বলিয়া ছিলেন। তিনি আচার্য্যজননীকে মা ডাকিতেন ও তাঁহার প্রতি অত্যন্ত শ্রদ্ধা প্রকাশ করিতেন।

পরমহংসদেবের বিনয় চমৎকার ছিল, কাহার সঙ্গে সাক্ষাৎ হইলে পূর্বেই তিনি নমস্কার করিতেন। তাঁহার উক্তি সকল মুদ্রিত হইয়া প্রচার হয়, সংবাদ পত্রাদিতে তাঁহার বিষয় কিছু লেখা হয়, তাঁহার ফটোগ্রাফ তোলা হয় তিনি এরূপ ইচ্ছা করিতেন না। সমাধির অবস্থায় বাহ্যজ্ঞানশূন্য না হইলে তাঁহার ফটোগ্রাফ তোলা যাইতে পারিত না। সমাধিকালে তিনি অচৈতন্য হইয়া ভূতলে পড়িতেন না। লম্ফ ঝম্প করিয়া পার্শ্বস্থ লোকদিগের প্রতি কোনরূপ উৎপাত করিতেন না। উপবিষ্ট বা দণ্ডায়মান হইয়া স্পন্দহীন স্থিরভাবে থাকিতেন। ঈদৃশ সাধুপুরুষ ঈশ্বরের কৃপার জ্বলন্ত নিদর্শন, ঘোর তিমিরাবৃত দুস্তর ভবার্ণবে নিমগ্নপ্রায় জীবনতরী পথিকের পক্ষে আশাজনক আলোকস্তম্ভস্বরূপ। আমরা নানক চৈতন্য প্রভৃতি মহাত্মাদিগের জীবন বৃত্তান্ত পুস্তকেই পাঠ করিয়াছি, কিন্তু এই জীবন আমরা স্বচক্ষে দেখিয়া কৃতার্থ হইয়াছি। রামকৃষ্ণ বর্তমান সভ্যতার ধার ধারিতেন না, কোন সভায় যাইতেন না, বক্তৃতাও

দিতেন না। পুস্তক পত্রিকাদির সঙ্গে কোন সম্পর্ক রাখিতেন না, কাহার নিকটে শিক্ষা উপদেশ লাভ না করিয়া কেবল ঈশ্বর কৃপায়, দৈববলে ও সাধনবলে কিরূপ উন্নত পবিত্র জীবন লাভ করিতে হয় তিনি দেখাইয়া গিয়াছেন। হংস যেমন অসার ভাগ পরিত্যাগ করিয়া জল হইতে সার ভাগ ক্ষীর গ্রহণ করে, এই পরমহংস হিন্দুধর্মের সমুদায় অসারতা ছাড়িয়া তাহার সারমাত্র গ্রহণ করিয়াছিলেন। এবার তাঁহার কতকগুলি উক্তি প্রশ্নোত্তরানুসারে লিখিয়া নিম্নে প্রকাশ করা গেল। এই উক্তিগুলি পুস্তকে প্রকাশিত হয় নাই।—

পরমহংসের উক্তি

প্রেম ভক্তি কিরূপে স্থায়ী হয়?

জলপূর্ণ কলস ঘরে সিকার উপর তুলিয়া রাখিলে কিছুদিন পর সেই কলসের জল শুকাইয়া যায়। কলসকে গঙ্গার জলে ডুবাইয়া রাখ তাহার জল কখন শুষ্ক হইবে না। সেইরূপ প্রেমময় ঈশ্বরের সত্তায় যে আত্মা নিমগ্ন তাহার প্রেম কখন শুষ্ক হয় না। একদিন প্রেমভক্তি লাভ হইলে নিশ্চিন্ত হওয়া যায় না, সিকায় তোলা জলের ন্যায় উহা শীঘ্র শুষ্ক হইয়া যায়।

ঈশ্বরে মন স্থির হয় না কেন?

গুয়ে মাছি কখন কখন ময়রার দোকানে মিষ্টান্নের উপর যাইয়া বসে, আবার কোন মেথরাণী নিকট দিয়া বিষ্টা লইয়া যাইতে সেই গন্ধ পাইয়া মিষ্টান্ন ছাড়িয়া বিষ্ঠায় যাইয়া বসে, কিন্তু মৌমাছি মধুপানেই সর্ব্বদা মত্ত থাকে। এইরূপ সংসারাসক্ত মন স্থির হইয়া ঈশ্বরের প্রেমমধু পান করিতে পারে না, বার বার সংসারের দিকে পাপের দিকে দৌড়ে যায়, ভক্ত হরিপাদপদ্ম মধুপানে মগ্ন থাকেন। ঘোর বিষয়ীর মন গোবরে পোকার ন্যায়, গোবরে পোকা গোবরের ভিতর থাকে, গোবর ছাড়া অন্য কিছুই তার ভাল লাগে না, পদ্মের ভিতর জোর করিয়া বসাইয়া দাও সে ছট ফট করিবে। সেইরূপ বিষয়ীমন বিষয় ছাড়া ধর্ম্মের দিকে কখন যায় না।

সাধনের কিরূপ অবস্থা ?

পক্ষিগতি বানরগতি ও পিপীলিকাগতি ত্রিবিধগতির ন্যায় সাধনের ত্রিবিধ অবস্থা। পক্ষীগাছে বসিয়া একটী ফল ঠোকরাল, ফলটি হয়ত পড়িয়া গেল, সে মুখে করে উড়িয়া যাইতে পারিল না বানর ফল মুখে করিয়া লাফ দিয়া চলিয়া যাইতে তাহা পড়িয়া গেল। কিন্তু পিপীড়া ধীরে ধীরে তাহার খাদ্য বস্তুর দিকে গেল, এবং সেই খাদ্য মুখে করিয়া আস্তে আস্তে লইয়া আসিল, কিছুতেই সে তাহা ছাড়িল না, ক্রমশঃ তাহা ভোগ করিতে লাগিল। এই পিপীলিকাগতির ন্যায় সাধনই শ্রেষ্ঠ সাধন, নিশ্চয় লাভ করা ও ভোগ করা চাই। চঞ্চলভাবে সাধন করিয়া কেহ জীবনের সম্বল সঞ্চয় করিতে পারে না।

সংসার কিরূপ ?

সংসার লাল চুসিমের মত, লাল চুসিম কঠিন কাষ্ঠখণ্ড, তাহাকে কোন রস নাই, কিন্তু শিশু রাঙ্গা দেখিয়া আনন্দে তাহা চুসিতে থাকে, মা সময়ে সময়ে আসিয়া তাহাকে দুধ খাওয়াইয়া যান। সেইরূপ অজ্ঞান লোকেরা বাহ্য চাকচক্যশালী নীরস সংসারে ভুলিয়া থাকে। পরম মাতার প্রেম দুগ্ধ ভিন্ন সংসারে তাহার আত্মার ক্ষুধা নিবৃত্তি হয় না।

ব্রাহ্মসমাজের কতগুলি 'লোক নূতন দল করিল, দল করা কি ভাল ?

পরিষ্কার জলে পাটা হয়, তাতে জল পরিষ্কার থাকে ও গুড়ের খাদ কাটে, পচা জলেই দল পানা হয় ও জলকে পচায়। প্রেমের স্রোত বদ্ধ হইয়া মন পচিলেই লোক দল করে ও অন্যকে পচায়, নির্মল হৃদয় অন্যের মনের ময়লা পরিষ্কার করিয়া থাকে।

বাহ্যিক চিহ্ন উপবীত রাখা কি ঠিক ?

আত্মা উন্নত হইলে নারিকেল গাছের বালদের ন্যায় আপনিই পৈতে পড়ে যায়, তাহা ফেলিবার জন্য আর চেষ্টা যত্ন করিতে হয় না।

এখন যে লোক ধর্মপ্রচার করিতেছে, তাহা কিরূপ মনে করেন ?

দুইশত লোকের সঞ্চয়, হাজার লোকের নিমন্ত্রণ, অল্প সাধনে গুরু-গিরি ও প্রচার।

যারা ধর্মের উচ্চ উচ্চ কথা বলে, তাদের কাজ কেন সেরূপ নয় ?

"নাক তোরে কেটে তাক" বোল মুখে বলা সহজ, হাতে বাজান কঠিন যেমন হাতীর দাঁত বাহিরে এক প্রকার ভিতরে অন্য প্রকার, কপট ধার্মিকের অবস্থা এইরূপ।

সাধু মহাজনদিগকে নিকটস্থ আত্মীয় লোকেরা অগ্রাহ্য করে, দূরস্থ লোকদিগের নিকটে তাঁদের আদর হয়, ইহার কারণ কি ?

বাজিকরের বাজি তাদের নিকটস্থ আত্মীয় লোকেরা দেখে না। দূরের লোকে বোকা হয়ে দেখে। বজ্রবাটুলের বীজ গাছের তলায় পড়ে না, উড়ে যাইয়া দূরে পড়ে ও তথায় গাছ হয়। সেইরূপ ধর্মপ্রচারকদিগের প্রচার দূরেতেই কার্য্যকর হয়।

কোথায় সাধন করা চাই ?

সাধন হয় কোণে বনে মনে।

নির্লিপ্ত সংসারী কিরূপ ?

যেমন পদ্মপত্রে জল ও পংকলিপ্ত মদগুর।

ইঁহার অন্তরে কত ভাব খেলিতেছে, অথচ এরূপ গম্ভীর ভাবে আছেন কিরূপে ?

একটা হাতী ছোট ডোবায় নামিলে সেই ডোবা উথলে পড়ে, দীঘীতে দশটা নামিলেও কিছুই হয় না। তাঁহার আত্মা বৃহৎ সরোবরের ন্যায় গভীর।

এক এক বার বেশ ভাব হয়, কিন্তু থাকে না কেন ?

বেঁশো আগুন নিবে যায়, ফুঁ দিয়া রাখতে হয়। সাধন চাই।

অন্নের ভাবনা ভাবতে হয়। সাধন ভজন করি কিরূপে ?

যাঁর জন্য খাটবে তিনিই খেতে দিবেন, যিনি পাঠায়েছেন তিনি আগেই খোরাকির বন্দোবস্ত করিয়াছেন।

আমিত্ব কি সম্পূর্ণ দূর হইবে না ?

পদ্মের পাঁপড়ি খসে যায়, কিন্তু তার দাগ যায় না। আমিত্ব যায়, কিন্তু একটু দাগ থাকে।

সমাধির অবস্থায় কিরূপ সুখ ?

সমুদ্রের কাতলা মাছ পুনরায় সমুদ্রে পড়িলে তাহার যেরূপ সুখ হয় সেই প্রকার সুখ।

মনুষ্যের দেবত্ব কতক্ষণ থাকে?

লোহ যতক্ষণ আগুনে থাকে ততক্ষণই লাল। আগুন থেকে বাহির করিলেই কাল। ঈশ্বরের সঙ্গে যতক্ষণ যোগ ততক্ষণই মনুষ্যের দেবত্ব।

তাঁহাকে উচ্চৈঃ স্বরে ডাকা কি আবশ্যক?

তিনি পিঁপড়ের পায়ের নুপুরের ধ্বনি শুনিতে পান।

আকাশের জল নির্মল ও পরিষ্কার, যেমন ছাত ও যেমন নল দিয়া বাহির হয় সেইরূপ হইয়া থাকে, ঘোলা বা পরিষ্কার।

সংসারের সাধন করিতে কি সম্বল চাই?

শব সাধন করিতে যেমন কড়াই মুড়াখি চাই, শবটা জীবিত হয়ে হা করে উঠলে তার মুখে কড়াই মুড়াখি দিতে হয়। সেইরূপ সংসারের জন্য টাকা পয়সারূপ কড়াই মুড়াখি চাই।

মানবীয় ভাব কেমন করে যায়?

ফল বড় হলে ফুল আপনি উড়ে যায়। দেবত্বের প্রভাব বাড়িলে নরত্ব থাকে না।

জীবাত্মা পরমাত্মার যোগের অবস্থা কিরূপ?

ঘড়ীর ছোট ও বড় কাঁটা দুপুরে সময় যেমন এক হয়ে যায় সেইরূপ।

শরীরের প্রতি আসক্তি কমে কিসে?

মানুষ হাড়ের ঘরকন্না করে, সেই দেহরূপ হাড়ের ঘরখানা কেবল পুঁজ-রক্ত মলমুত্রের আধার, এ সকল ভাবিলে তাহার প্রতি আর আসক্তি থাকে না।

ভক্ত কেন ভগবানের জন্য সব ছেড়ে ছুড়ে দেন?

পতঙ্গ একবার আলো দেখলে আর অন্ধকারে যায় না। পিঁপড়া পুড়ে প্রাণ দেয় তবু ফেরে না। ভক্ত এরূপ।

মা বলিতে ভক্ত এত মত্ত কেন হন?

মার কাছে যে আব্দার বেশী।

বৈরাগ্যাশ্রয় কিরূপে করিতে হয়?

স্ত্রী স্বামীকে বলিলেন, আমার দাদা সন্ন্যাসী হবেন, তিনি অনেক দিন হইতে কিছু কিছু করে তাহার যোগাড় করিতেছেন। স্বামী বলিলেন দূর হ ক্ষেপী, সে কখন সন্ন্যাসী হইতে পারিবে না। আয়োজন উদ্যোগ করিয়া কোন দিন বৈরাগী সন্ন্যাসী হওয়া যায় না। স্ত্রী বলিলেন, তবে কেমন করিয়া হয়? স্বামী বলিলেন দেখবি শ্যালি, কিরূপে হয়? এই বলিয়া তিনি কাপড় ছিঁড়িয়া কৌপিন করিলেন, তৎক্ষণাৎ ঘর ছাড়িয়া চলিয়া গেলেন।

বৈরাগ্য কয় প্রকার?

মোটামুটী দুই প্রকার। তীব্র বৈরাগ্য ও মেদাটে বৈরাগ্য, তীব্র বৈরাগ্য রাতারাতি খাল কেটে পুকুরে জল আনয়নের ন্যায়। মেদাটে বৈরাগ্য হচ্ছে-হবে, তাহা কোন দিন ঠিক হইয়া উঠে না।

সাধকের কোনরূপ ভেক ধারণ করা কি ঠিক?

ভেক ধারণ ভাল, গৈরিক পরিধান করিলে ও খোল করতাল লইলে মুখে খেয়াল টপ্পা আইসে না। কাল পেড়ে ধুতি পরে চুল বাঁকিয়ে ছড়ি হাতে করে বাহির হইলেই নিধুর টপ্পা গাইতে ইচ্ছা হয়।

ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদিগকে কিরূপ মনে করেন?

তাঁহারা শকুনির ন্যায়, শকুনি অনেক উর্দ্ধে উঠে, কিন্তু তার দৃষ্টি ভাগারের দিকে থাকে, সেইরূপ ব্রাহ্মণ পন্ডিতরা ধর্মশাস্ত্রের অনেক উচ্চ কথা বলেন, কিন্তু শ্রাদ্ধের ফলার ও দক্ষিণার দিকে তাদের লক্ষ্য।

ঈশ্বরের কৃপা কিরূপে ধারণ করা যায়?

তাঁহার কৃপাবারি সকল স্থানে বর্ষিত হয়, কিন্তু বিনীত আত্মাতেই কৃপা স্থিতি করে ও কৃপাবারিতে তাহা সরস থাকে, তজ্জন্য সেই আত্মাতে প্রেমভক্তি বিশ্বাসাদি নানা স্বর্গীয় শস্য জন্মে। যেমন আকাশ হইতে সর্বত্র জল বর্ষিত হয়, কিন্তু উচ্চভূমিতে সেই জল দাঁড়ায় না, নিম্নভূমিতে দাঁড়ায় ও তাহাকে শস্যশালিনী করে।

আপনি সৎপ্রসঙ্গ ছাড়তে চাহেন না কেন?

উহা দাদ চুলকানের ন্যায়, ধর্ম কথা বলিতে বলিতে আরও ইচ্ছা হয়।

সংসারাসক্ত কিরূপ?

সংসারাসক্ত লোক ভাঁড়সে নেউলের ন্যায়। যাহারা নেউল পোষে, তাহারা গৃহের দেওয়ালের গায়ে গর্ত করিয়া একটি ভাঁড় বসাইয়া রাখে, নেউলের গলায় এক গাছ দড়ি বাঁধিয়া সেই দড়ির অপর ভাগে ইট বাঁধিয়া রাখা হয়। নেউলটি ঘরের উঠানে ইতস্ততঃ বেড়িয়ে বেড়ায়, তাড়া বা ভয় পাইলে দৌড়িয়া দেয়ালে হাঁড়ির ভিতর উঠিয়া বসিয়া থাকে। সেখানেও অধিকক্ষণ থাকিতে পারে না, গলায় যে ইট ঝুলিয়া থাকে, তাহার ভারে নীচে নামিতে বাধ্য হয়। সংসারাসক্ত লোকের এই অবস্থা, তাহারা সময়ে সময়ে শোক দুঃখের আঘাত ও ভয় পাইয়া ঊর্ধে উঠে, ঈশ্বরের শরণাপন্ন হয়, কিন্তু আসক্তির ইট গলায় ঝুলিতেছে, থাকিতে পারে না, আবার সংসারে নামিয়া আইসে।

শত্রুগণ যিশুর গায়ে প্রেক বিদ্ধ করিল, তিনি তাহাদের মঙ্গল প্রার্থনা করিলেন, এ কেমন ?

সাধারণ নারিকেলে প্রেক বিদ্ধ করিলে প্রেক শাঁস পর্য্যন্ত ভেদ করে, কিন্তু খুড়ির নারিকেলের শাস ভিতরে আলগা হইয়া যায়, সেই নারিকেলের উপরে প্রেক বিদ্ধ করিলে শাঁস ভেদ করে না। যিশুখ্রীষ্ট খুড়ির নারিকেলের ন্যায় ছিলেন। তাঁহার আত্মা দেহ হইতে ভিন্ন ছিল, শত্রুগণ তাঁহার দেহে প্রেক বিঁধাইয়াছিল, কিন্তু আত্মাকে বিদ্ধ করিতে পারে নাই। এইজন্য তিনি দেহে নিদারুণ প্রেকের আঘাত পাইয়াও প্রসন্নমনে শত্রুদিগের মঙ্গল প্রার্থনা করিয়াছিলেন।

প্রকৃতির মধ্যে কি ঈশ্বর স্থিতি করেন ?

যেমন দুগ্ধে ঘৃত আছে চক্ষে দেখা যায় না, চেষ্টা যত্ন করিলে ঘৃত লাভ হয় সেইরূপ প্রকৃতির ভিতর ঈশ্বর গূঢ়রূপে আছেন, সাধন করিলে প্রাপ্ত হওয়া যায়।

ঈশ্বর এক, না বহু ?

ঈশ্বর এক, কিন্তু তিনি বহুরূপী গিরগিটীর ন্যায় বহুরূপ ধারণ করেন। সাধক ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন অবস্থায় তাঁহার ভিন্ন ভিন্ন রূপ দর্শন করিয়া থাকেন। অনেক লোক তাহা বুঝিতে না পারিয়া বহু ঈশ্বর মনে করে।

জীবের কয় প্রকার অবস্থা ?

ত্রিবিধ অবস্থা, বদ্ধ, মুমুক্ষু ও মুক্ত। কতগুলি মাছ আছে যে জালেতে জড়িয়ে পড়ে, মুক্ত হইবার জন্য কিছুই চেষ্টা করে না, কতগুলি মাছ জাল ডিঙ্গাইয়া যাইবার নিমিত্ত লম্ফ ঝম্প করে, কোন কোন মৎস সবলে জাল ডিঙ্গাইয়া চলিয়া যায়। সংসার জালে এইরূপ তিন শ্রেণীর মানুষ দেখিতে পাওয়া যায়।

সাধকের বল কি ?

বালকের ন্যায় সাধকের রোদন বল।

পাপ তাড়ানোর উপায় কি ?

হাতে তালি দিয়া যেমন গাছের কাক তাড়ায়, সেইরূপ হাততালিতে হরি বলে মানববৃক্ষের পাপপাখী তাড়াইয়া দেও।

পৃথিবীর লোকের পূজাও অর্চনাদি কেমন ?

সংসারের লোকে যে সকল পূজা অর্চনা করিয়া থাকে, তাহা বাল্য-ক্রীড়ার ন্যায়, আসল পাইলে তাহারা আর এ সকল পূজা করিত না। বালিকারা বিবাহিতা হইয়া যখন আসল ঘরপ্রাপ্ত হয়, তখন খেলার ঘর ছেড়ে দেয়।

ধ্রুব প্রহ্লাদ কিরূপ ছিলেন ?

ধ্রুব প্রহ্লাদ প্রাতে তোলা মাখনের ন্যায় উৎকৃষ্ট ছিলেন। বেলাতে মাখন তুলিলে তত উৎকৃষ্ট হয় না, অধিক বয়সে সাধনে সেরূপ সুমধুর পবিত্র জীবন হইয়া উঠে না।

নানা দেশে নানা জাতিতে ঈশ্বরের নানা নাম, তাতে কি কিছু দোষ আছে ?

কিছু দোষ নাই, এক গঙ্গার ঘাটে ঘাটে স্বতন্ত্র নাম, এক জল তাহাকে পানি বলে, ওয়াটারও বলে, যে নাম হউক না কেন, সমুদায়ই তৃষ্ণা নিবারণ করে।

ঈশ্বর কোথায় আছেন, তাঁহাকে কিরূপে পাওয়া যায় ?

সমুদ্রে রত্ন আছে। যত্ন চাই, ঈশ্বর সংসারে আছেন, সাধন চাই।

—ক্রমশঃ

ধর্মতত্ত্ব

১৬ আশ্বিন, ১৮০৮ শক।

ভাগ ২১, সংখ্যা ১৮ ; পৃঃ ১০৭-০৮

পরমহংসের উক্তি

ঈশ্বর কিভাবে দেহে স্থিতি করেন ?

তিনি পিচকারীর কাটির মত আলগা থাকেন।

ভক্ত একা থাকিতে ভালবাসেন না কেন ?

একা খেতে গাঁজাখোরের সুখ হয় না, ভক্তও গাঁজাখোরের ন্যায়, একা মা'র নাম করিতে তাঁর মনে তেমন আনন্দ হয় না।

সাধু নামে পরিচিত সকলেই কি সমান ?

সাধু সকলেই, তবে কিনা কোনটা সাধু খাওয়া যায়, কোনটা জল শৌচে আইসে।

কিরূপে জীবন যাপন করিতে হইবে ?

ঝিকনে কাটি দ্বারা যেমন মাঝে মাঝে উনন নেড়ে দিতে হয়, তাহাতে নিব.নিব আগুন উস্কে উঠে, সেইরূপ মাঝে মাঝে সাধুসঙ্গ দ্বারা মনকে সতেজ করা চাই: কামারের জাতার আগুন মাঝে মাঝে তেয়ে রাখতে হয়।

মানুষ সিদ্ধ হলে কি আর সংসারীদের দলভুক্ত হয় না ?

না, যেমন মাটী একবার পুড়িয়ে খোলা হইলে আর কখন মাটির সঙ্গে মিশে না, সেইরূপ। ধান্য সিদ্ধ হইলে যেমন তাহা হইতে আর অঙ্কুরোদ্গম হয় না, সেইরূপ সিদ্ধ মনে আর সংসারাশক্তি জন্মে না।

সিদ্ধ মনের কিরূপ অবস্থা ?

যেমন আলু ইত্যাদি সিদ্ধ হলে কোমল হয়, তদ্রূপ সিদ্ধ মন কোমল হইয়া থাকে।

নির্লিপ্ত সংসারী কেমন ?

নির্লিপ্ত সংসারী রাজার বাড়ীর দাসীর ন্যায়। রাজবাড়ীর দাসী রাজার ছেলেমেয়েকে আদর যত্ন করে, তাহাদিগকে প্রতিপালন করে, তাহাদের সেবা করে, কিন্তু জানে যে সেই ছেলেমেয়ে তার নয়, রাজার।

আমার ছেলে হরিশ বড় হলে তাকে বিয়ে দিয়ে সংসারের ভার তার ওপর রেখে আমি যোগ সাধন করিব, এ বিষয় আপনার কি মত ?

হরিশ গিরিশ ছাড়ে না, বড় নেওটা। তোমার কোন কালে সাধন হবে না। পরে আবার হরিশের ছেলে হওয়া ও তার বিয়ে দেখার সাধ হবে।

তিনি খুব বক্তৃতা করিতে পটু, কিন্তু জীবন তাঁহার বড় খাট, তাঁকে কিরূপ আপনি জানেন ?

হাঁ, তিনি সহজে পরকে উপদেশ দেন। কিন্তু নিজে গচ্ছিত ধন হরণ করেন।

প্রেমাভক্তি কিরূপ ?

প্রেমাভক্তিতে সাধক খুব আত্মীয়ভাবে ঈশ্বরকে ডাকেন, তাঁকে আমার মা বলেন, যেমন গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণকে গোপীনাথ বলিতেন, জগন্নাথ বলিতেন না।

হৃদয়ের কিরূপ অবস্থায় ঈশ্বর দর্শন হয় ?

হৃদর স্থির সমাহিত হইলে। হৃদয় সরোবর যখন কামনাবায়ুতে চঞ্চল থাকে, তখন ঈশ্বরচন্দ্র দর্শন অসম্ভব।

হরির আগমন কিরূপে হয় ?

সূর্যোদয়ের পূর্বে যেমন অরুণোদয় হয়, হরি যখন আইসেন তখন তিনি নিজেই সমস্ত যোগাড় করিয়া ভক্তের বাড়ীতে অগ্রে পাঠান, প্রেমভক্তি বিশ্বাস ব্যাকুলতা সাধকের হৃদয়ে প্রেরণ করেন। যথা রাজা কোন ভৃত্যের বাড়ীতে গমনকালে পূর্বে আপন ভান্ডার হইতে গৃহের সাজসজ্জা ও তাঁহার উপবেশনযোগ্য আসন ইত্যাদি পাঠাইয়া দেন।

সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক পূজা কিরূপ ?

একজনে দুর্গোৎসব অন্তরের ভক্তি ও নিষ্ঠার সহিত করে, লোক দেখাইবার জন্য ও বাহ্যিক আমোদ ও জাঁকজমকের জন্য করে না ইহাকে সাত্ত্বিক দুর্গাপূজা বলা যায়। একজন পূজোপলক্ষে বাড়ী ঘর খুব সাজায়, নৃত্যগীত ফলারের ঘটা করে, ইহাকে রাজসিক পূজা বলা যায়। অন্য একজন পূজায় পাঁঠা মহিষ কাটে এবং অশ্লীল নাচগান মদমাংসে মত্ত হয় এইরূপ পূজাকে তামসিক পূজা বলা যায়। একব্যক্তি তাহার বন্ধুকে

বলিয়াছিল, "এবার পূজো উঠালে কেন ভাই।" সে বলিল, "দাঁত পড়ে গেছে, আর দুর্গাপূজায় সুখ নাই।" অর্থাৎ দাঁত পড়াতে পাঁঠার মাংস খাওয়া যায় না, দুর্গোৎসব করে কি করিব?

পরমাত্মা ও জীবাত্মা কিরূপ?

পরমাত্মা সাগরের ন্যায়, জীবাত্মা সাগরস্থ বুদ্বুদের ন্যায়। সাগর হইতে বুদ্বুদের উৎপত্তি সাগরেতেই স্থিতি। উভয় বস্তুতঃ এক, প্রভেদ এই যে বৃহৎ ও ক্ষুদ্র আশ্রয় ও আশ্রিত।

ঈশ্বরকে কি প্রকারে লাভ করা যায়?

রাঙ্গামুড়ো রুই মাছ ধরতে যেমন ছিপ ফেলে ধৈর্য্য ধরে বসে থাকতে হয়। তদ্রূপ ধৈর্য্যের সহিত সাধন চাই।

মাকে পৃথিবীতে কেন দেখা যায় না?

ইনি বড়লোকের মেয়ে, চিকের আড়ালে থাকেন। ভক্ত সন্তানেরা প্রকৃতিরূপে চিকের ভিতর যাইয়া তাঁকে দেখেন।

তাঁর প্রতি কিরূপ মন চাই?

যেমন কৃপণের ধনে মন, তেমন তাঁতে মন চাই।

তাঁতে মন রাখিয়া কিভাবে সংসার করিতে হয়?

যেমন ছুতোরের স্ত্রী ধান সিদ্ধ করে, উনুনে কাঠ গুঁজে দেয়, সিদ্ধ ধান ঢেকীতে যোগায়, তাহার স্বামী ঢেঁকী দিয়া চাল করে, স্ত্রী হাত দিয়া ধান নেড়ে দেয়, এ দিকে স্বামীর সঙ্গে আবার ঘর কন্নার কথা কয়, কিন্তু তার দৃষ্টি হাতের প্রতি থাকে, সেইরূপ ঈশ্বরেতে দৃষ্টি রেখে সংসারের সমুদায় কাজ কর্ম করতে হয়। কলস মাথায় করে নট যেমন নৃত্য করে, কলসের প্রতি তাহার লক্ষ্য থাকে, তদ্রূপ ঈশ্বরের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া সংসার করিতে হইবে।

ঈশ্বরের চরণাশ্রয় লাভ করিলেও কি আমিত্ব থাকে?

স্পর্শমণির স্পর্শে লোহার তরবার সোণা হয়, কিন্তু তখনও তরবারের আকার থাকে, কেবল তাহার ধার থাকে না। সেইরূপ ঈশ্বরলাভেও মনুষ্যের আমিত্ব থাকে, কেবল মন্দ আমিত্ব থাকে না।

বিরক্ত বৈরাগী কিরূপ?

যে ব্যক্তি পরিবারের সঙ্গে ঝগড়া ক'রে বৈরাগী হয়ে বাহির হয়ে যায়, এরূপ ব্যক্তিকে বিরক্ত বৈরাগী বলে। সে দুই দিনের বৈরাগী, পশ্চিমে চাকুরী জুটলে তাহার আর বৈরাগ্য থাকে না।

হঠাৎ কি প্রচুর উন্নতি হয় না?

ঘরে যে পাঠ মুখস্থ করে, সে-ই হাইকোর্টের জজ হয়, নতুবা অনাহারী ম্যাজিস্টর। একেবারে কেউ হাইকোর্টের জজ হয় না। অনেক পরিশ্রমে ধারি মিত্র হওয়া যায়।

আমি সংসারের হিসাব ভাবিয়াই সর্বদা ব্যস্ত, বলুন আমার আর কি হইবে?

যতক্ষণ গাছ গুণিব ততক্ষণ আম খা, সংসার সংসার না ভাবিয়া ধর্মফল খা।

ভক্তির তম কিরূপ?

বাহু তুলে নৃত্য করে হরিবোল বলা ভক্তির তম।

(ধর্মতত্ত্ব, ১৬ আশ্বিন ১৮০৮ শক।)

*পরমহংসের গান**

এই হরি নাম (নিসে রে,) জীব যদি সুখে থাকবি,
(মধুর হরিনাম) জীবের দশা মলিন দেখে, হরিনাম
এসেছেন গোলোক থেকে, মুখে হরি হরি বল,
হরি বলতে বলতে প্রাণ গেলেও ভাল আকুলেও ভাল।

যতনে হৃদয়ে রেখ আদরিণী শ্যামা মাকে।
ও মন তুই দেখিস আর আমি দেখি আর যেন কেউ নাহি দেখে॥
কামাদিরে দিয়ে ফাঁকি, আয় মন বিরলে দেখি,
নয়নকে প্রহরী রাখি, সে যেন সাবধানে থাকে।
কুরুচী কুমন্ত্রী যত, নিকট হ'তে দিও নাকো,
রসনাকে সংগে রাখ, সে যেন মা বলে ডাকে॥

* পরমহংসদেব সচরাচর যে সকল গান করিতেন, তাহার দুইটি এ স্থানে প্রকাশ করা গেল (ধর্মতত্ত্ব)

The Indian Mirror*

28 March 1975

A Hindu Saint—We met one (a sincere Hindu devotee) not long ago, and were charmed by the depth, penetration and simplicity of his spirit. The never-ceasing metaphors and analogies in which he indulged, are most of them asapt as they are beautiful. The characteristics of his mind are the very opposite to those of Pandit Dayananda Sarasvati, the former being as gentle, tender and contemplative, as the latter is sturdy, masculine and polemical. Hinduism must have in it a deep source of beauty, truth and goodness to inspire such men as these

* শ্রীরামকৃষ্ণ সম্পর্কে সংবাদপত্রে প্রকাশিত এটি প্রথম প্রতিবেদন এবং কেশবচন্দ্র সেন এটি লেখেন।—সম্পাদক

The New Dispensation

26 February 1882

On Thursday last there was an interesting excursion by a steam launch up the river to Dakshineswar. The Rev. Joseph Cook, Miss Pigot, and the apostles of the New Dispensation together with a number of our young men embarked at about 11 o'clock. The revered Paramahansa of Dakshineswar, as soon as he heard of the arrival of the party, came to the river-side, and was taken on board. He successively went through all the phases of spiritual excitement which characterises him. Passing through a long interval of unconsciousness he prayed, sang, and discoursed on spiritual subjects. Mr. Cook represented the extreme culture of Christian theology and thought. The Paramahansa represented the extreme culture of Indian Yoga and Bhakti in short the traditional piety of the East. And the apostles of the Brahmo Somaj in bringing together the two proved that they combined both in the all-inconclusive harmony of the New Dispensation.

The Late Ramakrishna Paramahamsa

(The Indian Mirror, 19 August 1886)

The much respected Ramakrishna Paramahamsa of Dakshineswar who was ailing for some months past from scrofula, breathed his last at about 1 A. M. on Sunday, the 15th* instant. The disease had gradually undermined his health, but it was not expected that the end would come so soon. On the day in question, he had taken his evening meal, and had, as usual, retired to bed. A song which was being sung by some of his attendants awoke him and he joined with them, but a short while after, they did not hear his voice, and thought that he had as was his wont gone into ecstasy (Samadhi). As, however, he continued in this state for a somewhat longer time than usual, they touched his body and felt his pulse, when it was found that he had ceased to breathe and was no longer living The very evening he had asked one of the medical men, who visited him, whether his disease was a curable one but having received no satisfactory reply he was heard to say that he was prepared to die any moment.

The next evening his body was removed to the burning ghat at Cossipore. The funeral procession was followed by a large number of his followers, friends and admirers who had hastened to the spot to have a last look at his face. The party entered the ghat, chanting hymns in praise of Hari. The cot containing the body was then laid down on the side of the river and all the men sat down on the bare ground, forming a circle around the dead body. Babu Troylokhya Nath Sanyal, the singing minister of the Brahmos, sang a few songs suited to the occasion. After the songs had softened to some extent the hearts of the sorrowing multitude, the body was placed on the funeral pyre and in an hour and a half the burning was complete. A few bones only were taken to be interred at a suitable spot.

Ramakrishna began life as a priest in one of the shrines at Dakshineswar. Here he practised devotion, Yoga and austerities, such as is customary with Hindu devotees. The outcome of all this was a religion which is as liberal as possible. Ramakrishna combined in his own person a Hindu, a Mohammedan and a Christian. In fact, he made no distinction of castes and creeds and his constant wish was that the followers of all religions, being freed from mutual jealousies, would all unite in brotherly love, and sing in praise of the Almighty. He was an unlettered man, but his common-sense was strong and his power of observation keen. He had facility for expressing his ideas in such homely language that he could make himself easily understood by all on intricate points of religion and morality. His childlike simplicity and outspokenness, his deep religious fervour and self-denial, his genial and sympathetic nature and his meek and unassuming manners won the hearts of those who came in contact with him, and music from his lips had a peculiar charm on those who heard him sing. Among others the late Babu Keshab Chandra Sen was very fond of his company and used to spend hours with him in religious conversation. The most remarkable feature in his life was that he succeeded in reforming the character of some young men whose morals were very corrupt. Graduates and undergraduates vied with one another in becoming his followers and many of them have already renounced the world and have adopted the life of ascetics. During the last few months of his illness, it was a touching scene to see the tender care and love with which these young men attended him day and night. Now that he is no more, may the spirit of love and kindness and the moral tone which he has imparted last forever, and bear golden fruits.

---

* 16th August—সম্পাদক।

খ্রীষ্টান অনুরাগীদের চোখে
শ্রীরামকৃষ্ণ

শ্রীশ্রী রামকৃষ্ণ*

রামকৃষ্ণ কে? কে তাই জানি না। এই পর্যন্ত জানি যে এই সোনার বাঙলায় এমন সোনার চাঁদ—গোরাচাঁদের পর—আর উদয় হয় নাই। চাঁদেও কলঙ্ক আছে—কিন্তু রামকৃষ্ণ চাঁদে কলংক রেখাটুকুও নাই। আহা—তাঁহার ভাগবতী-তনু পাবকের ন্যায় পবিত্র ও নির্ম্মল ছিল। বনিতা-বিলাস দোষে উহা কখনও কলুষিত হয় নাই। তাঁহার যখন বিবাহ হয় তখন তাঁহার পত্নীর বয়স আট বৎসর। বিবাহের আট বৎসর পরে ঐ সতী লক্ষ্মীর সঙ্গে তাঁহার দেখা হয়। লক্ষ্মী তখন ষোড়শী যুবতী। রামকৃষ্ণ দেব ঐ লক্ষ্মীকে বিধিমতে পূজা করেন ও নিজের জপের মালা তাঁহাকে উৎসর্গ করেন। এই উৎসর্গের পর রামকৃষ্ণ চন্দ্রে ষোড়শ-কল-চন্দ্রিকা ফুটিয়া উঠে। ঐ শোভা ইতিহাসে অতি দুর্লভ। অনেক অনেক সাধু মহাজন সহধর্মিণী ত্যাগ করিয়াছেন বটে কিন্তু রামকৃষ্ণের ত্যাগ—ত্যাগ নয়—অঙ্গীকারের পরাকাষ্ঠা। চন্দ্রমা ছাড়া যেমন চন্দ্রিকা থাকিতে পারে না—তেমতি মা লক্ষ্মী আমাদের সেই ষোড়শী পূজার দিন হইতে রামকৃষ্ণ শশীকে বেষ্টন করিয়া চন্দ্রমণ্ডলিকার ন্যায় বিরাজ করিতে লাগিলেন। যদি তোমার ভাগ্য সুপ্রসন্ন হইয়া থাকে ত একদিন সেই রামকৃষ্ণ পূজিত লক্ষ্মীর চরণ প্রান্তে গিয়া বসিও আর তাঁহার প্রসাদ কৌমুদীতে বিধৌত হইয়া রামকৃষ্ণ শশিসুধা পান করিও—তোমার সকল পিপাসা মিটিয়া যাইবে।

রামকৃষ্ণ কে? রামকৃষ্ণ ব্রহ্মবিজ্ঞানী। রামকৃষ্ণ বলিতেন যে বেদ পুরাণ সমস্ত শাস্ত্রই উচ্ছিষ্ট হইয়াছে—কেন না উহা মানুষের দ্বারা উচ্চারিত হইয়া থাকে। কেবল একমাত্র ব্রহ্মবিজ্ঞান উচ্ছিষ্ট হয় নাই। উহা বোবার স্বপ্নের মত। যে দেখে সে-ই জানে—অপরকে উহা বলিতে পারে না।

রামকৃষ্ণ কে? তিনি সাধক চূড়ামণি। উচ্ছ্বাসময়ী, আবেগময়ী, ভাবময়ী সাধনার বলে তিনি সকল সম্প্রদায়ের বিশেষ বিশেষ ভাব আহরণ

করিয়া তাঁহার ব্রহ্মবিজ্ঞানের পূর্ণতা প্রকট করিয়াছিলেন। তাঁহার চরিত্রে —যোগীর সমাধি গোপীজনের মাধুর্য্যে শাক্তের ভৈরব-ভাব-অভেদ সমন্বয় লাভ করিয়াছিল। তিনি মহম্মদীয় সাধনাও করিয়াছিলেন এমন। কি তিনি যীশুভাবে ভাবিত হইয়াছিলেন।

ভগবান রামকৃষ্ণ নিজ জীবনে অচল-অটল ব্রহ্মবিজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া সনাতন আর্যধর্মের পারম্পর্য্য অক্ষুন্ন রাখিয়া সকল ভেদ-ভাবকে আলিঙ্গন করিয়াছিলেন—নবাগত শক্তির খেলাকে অদ্বৈত বিলাসিনী করিয়া ভারতকে ধন্য করিয়াছেন।

রামকৃষ্ণ—কামিনী কাঞ্চন বিজয়ী—ব্রহ্মবিজ্ঞানী—ভক্ত চূড়ামণি, লোকরক্ষার সেতু, ভাবসমন্বয়ের সাগর নমস্তে রামকৃষ্ণায়।

ভারতেই ব্রহ্মবিজ্ঞানের প্রকাশ হইয়াছে। ভারতেই বেদবিহিত আশ্রম ধর্মের সুদৃঢ় বেষ্টনে উহা সুরক্ষিত হইয়াছে। আর বিধাতার নির্দেশে পৃথিবীতে যত অংশাংশি ভেদ বিরোধ আছে তাহা সমস্তই এই পুণ্যভুমি ভারতে এক অপূর্ব সমন্বয় সূত্রে গ্রথিত হইয়া অদ্বৈত-তত্ত্বে পূর্ণতা লাভ করিবে। এই কারণেই ভারতে নানা শক্তির নানা জাতির মেলা লাগিয়াছে।

শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার গীতোপনিষদে ঐ উদার সমন্বয়ের মন্ত্র শিখাইয়া গিয়াছেন। ঐ মন্ত্রবলে কতই না নব নব ভাব-সংঘর্ষ একতায় পর্য্যবসিত হইতেছে। এখন আবার বিরোধ বাধিয়াছে। নূতন নূতন শক্তির টানে নূতন নূতন ভাববিলাসে ভারত আবার আন্দোলিত হইয়াছে। এই আন্দোলনে—এই আলোড়নে ভারতের প্রতিষ্ঠা কে রক্ষা করিবে? কে আবার ঐ শ্রীকৃষ্ণ—দত্ত মন্ত্র বলে এই ভেদ বৈষম্যের সামঞ্জস্য ঘটাইবে।

রাজা রামমোহন ও কেশবচন্দ্র সমন্বয় বাদী ছিলেন কিন্তু তাঁহাদের ব্রহ্মবিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠা ছিল না। তাঁহারা পরস্ব আহরণ করিতে গিয়া কতকটা নিজস্ব হারাইয়াছেন। কর্ণধারের অভাবে অনেকেই নূতন

ভাবের তরঙ্গে পড়িয়া হাবুডুবু খাইতেছেন। এই বিপ্লবে সমাজভঙ্গ রোধ করিবার জন্য ভগবান রামকৃষ্ণের আবির্ভাব।

রামকৃষ্ণ তাঁহার সাধনের বলে এক অপূর্ব সমন্বয়ের পন্থা খুলিয়া দিয়াছেন। ঐ পন্থা ধরিলে গৃহচ্যুত হইতে হয় না অথচ পরকে আত্মীয় করিয়া লওয়া যায়। নবাগত শক্তি ও ভাবসকলকে অগ্রাহ্য করিলে বাঁচিতে পারা যাইবে না—উহারা তোমায় গৃহ হইতে টানিয়া বাহির করিবে। গৃহস্থ হইয়া অভ্যাগতদিগের যথাবিধি আদর করিতে হইবে। ইহাই খাঁটি হিন্দুর লক্ষণ। ভগবান রামকৃষ্ণ খাঁটি হিন্দু সাধক ছিলেন। আগন্তুক ভাববিরোধগুলি ব্রহ্ম-বিজ্ঞানে মিলিত করিয়া লোকরক্ষার উপায় করিয়া গিয়াছেন। রামকৃষ্ণ এই শতাব্দীর লোকরক্ষার সেতু।···

১২৯৩ সালে রামকৃষ্ণের দেহোপরম হয়। দেহের উপরম হইল বটে কিন্তু তাঁহার শক্তি ও তেজ দেশকে জাগাইতেছে ও মুক্তির দিকে লইয়া যাইতেছে।

একজন আধুনিক হিন্দু সাধু*

সম্প্রতি একটি বাংলা পুস্তকে** ৺রামকৃষ্ণ পরমহংস নামে এই শতাব্দীর একজন অতীন্দ্রিয়বাদী হিন্দু যোগীর বাণী পাওয়া গিয়াছে। তিনি ১৮৩৫*** খৃষ্টাব্দে হুগলী জেলার জাহানাবাদের নিকট কামারপুকুর নামক গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। দক্ষিণেশ্বরে গঙ্গাতীরে সুপ্রসিদ্ধা রাণী রাসমণির দক্ষিণেশ্বর কালীমন্দিরে তিনি বাস করিতেন। কলিকাতা হইতে ছয়মাইল উত্তরে দক্ষিণেশ্বরের দ্বাদশ শিবমন্দিরের উত্তর-পশ্চিমের ঘরখানি ছিল তাঁহার। তাঁহার সাধনার স্থান ছিল পঞ্চবটীবনে বিল্ববৃক্ষের নীচে। তাঁহার তিরোধান স্থান কলিকাতার দুই মাইল উত্তরে কাশীপুর বাগানে। ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে ১৬ই অগাষ্ট ভোর ১টায় তিনি দেহত্যাগ করেন। বরাহনগরের শ্মশানঘাটে তাঁহার শেষকৃত্য সম্পন্ন হয়। একটি বিল্ববৃক্ষ দ্বারা সেই স্থান চিহ্নিত। তাঁহার শিষ্যদের মধ্যে ১৬ জন সুশিক্ষিত বুদ্ধিমান যুবক সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। তাঁহারা কেবল বরাহনগরেই নহে, ভারতের সকল পবিত্র তীর্থ এবং হিমালয়েও তপস্যা করিয়াছেন। মনে হয় তাঁহার শিষ্যদের মধ্যে সমধিক অনুরাগী ভক্তগণ তাঁহাকে পরমেশ্বরের অবতার বলিয়া পূজো করিতেন। বাংলার কলেজগুলিতে শিক্ষাপ্রাপ্ত যুবকদের উপর তিনি যে অতিশয় প্রভাব বিস্তার করিয়াছিলেন তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। বর্তমানে হিন্দুধর্মের পুনর্জাগরণের তথাকথিত আন্দোলনের উপরও তাঁহার শিক্ষার প্রভাব বিশেষভাবেই উল্লেখযোগ্য। তাঁহার বিশিষ্ট শিষ্যদের মধ্যে একজন ছিলেন স্বামী বিবেকানন্দ। তিনি চিকাগো এবং আমেরিকার বহু স্থানেই সবিশেষ অভ্যর্থনা লাভ করিয়াছিলেন।

* বিদেশী ভাষায় শ্রীরামকৃষ্ণের উপর লিখিত প্রথম রচনা।

** পরমহংস শ্রীমদ্ রামকৃষ্ণের উপদেশ। প্রথম ভাগ--শ্রীসুরেশচন্দ্র দত্ত সংকলিত। কলিকাতা।

*** ১৮৩৬ —সম্পাদক।

ফিরিয়া আসিয়া কলিকাতার টাউন হলে এক সভায় তিনি তাঁহার স্বদেশবাসীগণের নিকট হইতেও সাদর অভ্যর্থনা লাভ করেন। বর্তমান ব্রাহ্ম সমাজ আন্দোলনের মহান নেতা বাবু কেশবচন্দ্র সেন ও বাবু প্রতাপ চন্দ্র মজুমদারের উপরও তাঁহার প্রভাব ছিল প্রভূত। তাঁহার মৃত্যুর কয়েক বৎসর পূর্বে বাবু পি. সি. মজুমদার তাঁহার ধর্মমত ও শিক্ষার বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে লেখেন, "ইহা গোঁড়া হিন্দু ধর্ম, তাঁহাব এই হিন্দুধর্ম একটু অপূর্ব ধরনের। এই সাধুর নাম রামকৃষ্ণ পরমহংস, তিনি কোন বিশিষ্ট হিন্দু দেবতার পূজক ছিলেন না। তিনি শৈব নহেন, তিনি শাক্ত নহেন, তিনি বৈদান্তিকও নহেন। তবুও তিনি এই সকলই ছিলেন। তিনি রামের পূজা করিতেন কৃষ্ণেরও পূজা করিতেন। আবার তিনি বেদান্ত ধর্মের সকল নীতিরও দৃঢ় সমর্থক ছিলেন। তিনি সকল ধর্মের সকল নীতি, সকল কৃত্য সকল প্রথা ও সকল ধর্মের নীতি ও ভক্তি মূলক প্রার্থনার রীতিই মানিতেন। তাঁহার কাছে ইহার প্রত্যেকটিই অভ্রান্ত। তিনি একজন মূর্তি-উপাসক ছিলেন, অথচ নিরাকার ও অসীম পরমাত্মার একনিষ্ঠ উদ্গাতাও ছিলেন তিনি—যাহাকে তিনি অভিহিত করেন অখন্ড সচ্চিদানন্দ নামে।"

ইনিই আমাদের বলিয়াছেন রামকৃষ্ণ শিবকে যোগ সমাধির অবতাররূপে যোগিদিগের আদর্শরূপে ধ্যান করিতেন। কৃষ্ণকে তিনি প্রেমের অবতার মনে করিতেন। তাঁহার মতে কালী পরমেশ্বরের শক্তির প্রকাশ। রামকে তিনি মনে করিতেন কর্তব্যপরায়ণ পুত্র, জনকের ন্যায় রাজা এবং স্নেহানুরাগী পরম বন্ধু। তাঁহার ধর্মমতের উদারতার বিশেষ প্রমাণের জন্য আমরা বাবু পি. সি. মজুমদারের নিম্নোক্ত বিবৃতির উল্লেখ করিতে পারি—"তাঁহার ঐশ্বরীয় শ্রদ্ধা কেবলমাত্র হিন্দু ধর্মের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না। তিনি মুসলমানদিগের সর্বশক্তিমান আল্লার উপলব্ধির জন্য নানাভাবে তপস্যা করিয়াছিলেন। তিনি মুসলমানদিগের প্রথায় দাঁড়ি রাখিয়াছিলেন, মুসলমানী খানা খাইতেন এবং কোরাণের বাণী মন্ত্রের মত সর্বদা জপ করিতেন। যীশু খৃষ্টের প্রতিও তাঁহা শ্রদ্ধা গভীর এবং অকৃত্রিম ছিল। তিনি যীশুর নাম শুনিলেই মাথা নত করিয়া নমস্কার

করিতেন, এবং তাঁহার ঈশ্বর-পুত্রত্বের মতবাদকে সম্মান জানাইতেন। আমাদের বিশ্বাস তিনি দুই একবার খৃষ্টান প্রার্থনা সভায়ও যোগদান করিয়াছেন।"

সুতরাং যে ক্ষুদ্র পুস্তিকার কিছু বিবরণ প্রকাশ করার চেষ্টা করিতেছি সেই পুস্তকে তাঁহার দ্বিতীয় বাণীতে আমরা বিস্মিত হই নাই। সেই বাণীটি নিম্নে উদ্ধৃত করা হইল।

"জল এক হইলেও বিভিন্ন দেশে তাহা বারি, পাণি, ওয়াটার, অ্যাকোয়া প্রভৃতি নানা নামে অভিহিত হয়। অনুরূপভাবে সদেকস্বরূপ অখন্ড সচ্চিদানন্দ পরমেশ্বর বিভিন্ন দেশে আল্লা, গড, হরি, ব্রহ্ম প্রভৃতি নামে অভিহিত হন।" কোন ধর্ম বিষয়েই তাঁহার কোন বিরূপ সংস্কার ছিল না। তিনি বলিতেন, "একটা বাড়ীর ছাদে উঠিতে আমরা যেরূপ নানা সিঁড়ি ও নানা মই-এর সাহায্য গ্রহণ করি সেইরূপ ঈশ্বরের রাজ্যে প্রবেশ করিতেও নানা পথ আছে, বিভিন্ন ধর্ম বিভিন্ন পথেরই সন্ধান দেয়।" বিষয় উদাহরণ সহ বুঝাইতে গিয়া তিনি দুই বন্ধুর গল্প বলেন; তাহারা দুইজনই বাগানে একটি বহুরূপী দেখিয়াছিল। তাহাদের এক-জনের মতে বহুরূপীটি লাল এবং অপরজনের মতে উহা নীল, তাহারা উভয়েই বাগান রক্ষকের শরণাপন্ন হইল। সে দুইজনকেই সমর্থন করিল। ঈশ্বরকেও অনুরূপভাবে সাকার এবং নিরাকার উভয়ই বলা যায়। বিশ্বাসেই তাঁহাকে পাওয়া যায়। প্রকৃত ঈশ্বর-ভক্তের গুরুর প্রয়োজন হয় না। কিন্তু সাধারণ মানুষদিগের সাধারণত এই ধরনের একজন সাহায্যকারীর প্রয়োজন হয়।

প্রকৃত গুপ্ততত্ত্ববিশারদগণের ন্যায় রামকৃষ্ণও আন্তর ধ্যানের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করিতেন। এই জন্য তিনি ব্যাধ এবং মৎস্য শিকারীদিগের নিকট হইতেও শিক্ষা গ্রহণ করিতে দ্বিধা করেন নাই। এই সম্বন্ধে একটি গল্প আছে। একজন ভক্ত দেখিলেন মাঠের মধ্য দিয়া একটি বিবাহের মিছিল যাইতেছে। একজন ব্যাধ তাহাতে ভ্রুক্ষেপ না করিয়া অবিচলিত ভাবে একটি গর্তের দিকে তাহার শিকারের উদ্দেশ্যে নিবিষ্টচিত্তে লক্ষ্য করিতেছে। সেই ভক্তটি ইহা দেখিয়া সেই

শিকারীকে গুরু বলিয়া প্রণাম ও অভ্যর্থনা করিলেন। ছিপধারী মৎস্য শিকারীর গল্পও অনুরূপ। একজন মৎস্য শিকারী ছিপ দিয়া মাছ ধরিতেছিল। এক ভক্ত তাহার নিকট গিয়া বলিল, "বন্ধু, অমুক স্থানে কোন পথে যাইতে হইবে?" এই সময়ে ছিপে একটি মাছ পড়িয়াছিল, কাজেই সে একাগ্রভাবে মাছের দিকেই লক্ষ্য রাখিয়াছিল। মাছ ধরার কাজ শেষ হইলে সে ঘুরিয়া তাকাইল ও জিজ্ঞাসা করিল, "আপনি কি বলিতেছিলেন?" ভক্তটি মস্তক নত করিয়া তাহাকে প্রণাম করিল ও বলিল, "আপনি আমার ধর্মগুরু। পরমাত্মার ধ্যানের সময় আমি আপনাকে অনুসরণ করিব এবং আর কোন দিকে লক্ষ্য রাখিব না। আমার কাজ শেষ না হওয়া পর্যন্ত আমি অন্যদিকে মন দিব না।" রামকৃষ্ণের বাণীতে এই ধরণের ঘরোয়া উদাহরণ আছে প্রচুর। ঘুঘু, বক, চিল, কাক, আমগাছ এবং বাংলাদেশের প্রাত্যহিক জীবনের আরও বহু জিনিসের উদাহরণের মাধ্যমে তিনি বিভিন্ন নীতিকথা প্রচার করিয়াছেন। সারি সারি মালগাড়ি টানা ইঞ্জিনের সহিত পার্থিব বিবিধ প্রলোভনের সঙ্গে সংগ্রামরত ধর্মযোদ্ধা সাধকগণেরও তিনি তুলনা করিয়াছেন। গঞ্জিকাসক্ত গঞ্জিকাসেবীর মাধ্যমেও তিনি নৈতিক উন্নতি-সাধক বহু উপদেশ দিয়াছেন। গঞ্জিকাসেবী যেমন একাকী গঞ্জিকা পান করিয়া সুখ পায় না তদ্রূপ একজন প্রকৃত ভক্ত উপাসক অন্য ভক্তের সঙ্গ চাহে।

এই মহাত্মা ইউরোপীয় বিলাস-বহুল একটি বস্তুর উদাহরণ দিয়া বলিয়াছিলেন, "স্প্রিং-এর আসনে বসিবামাত্র আসনখানি চাপে নীচু হইয়া যায়, কিন্তু আসন হইতে উঠিবামাত্র সেইখানি পূর্বাবস্থা প্রাপ্ত হয়। তদ্রূপ কোন সংসারী লোক ধর্মকথা শুনিলে তাহার মন ধর্মভাবাপন্ন হয়, কিন্তু সে পুনরায় সংসারে প্রবেশ করিলেই সেইভাব অন্তর্হিত হয়।" লোক-কাহিনীপ্রিয় ব্যক্তিদের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য আর একটি উদাহরণের উল্লেখ করা যাইতে পারে। "সমুদ্রে জলমগ্ন চুম্বক-সম্বলিত পাহাড় সমুদ্রস্থ জাহাজের পেরেক ও লোহজাত অন্যান্য উপাদান টানিয়া লইলে জাহাজ-খানি যেরূপ টুকরাটুকরা হইয়া ডুবিয়া যায় তদ্রূপ প্রকৃত অধ্যাত্মজ্ঞান হইলে

মানুষের অভিমান ও স্বার্থপরায়ণতা চলিয়া যায় এবং সাধক পূর্বোক্ত জাহাজের ন্যায় অখণ্ড সচ্চিদানন্দ সাগরে নিমজ্জিত হয়।"

একথা সকলেই ভালভাবে জানেন যে আমাদের গ্রন্থ Imitation of Christ আমাদের স্থাপিত স্কুল ও কলেজে শিক্ষিত বাঙালীরা সাধারণত পাঠ করিয়া থাকেন। সেই গ্রন্থের প্রভাব পরবর্তীকালের এই হিন্দু সাধকের উপর যে পড়িয়াছে অনুসন্ধানে হয়ত সে কথা প্রকাশ পাইতে পারে। তিনি তাঁহার শিষ্যদের তর্কবিতর্ক, ছোটখাটো ঝগড়া-বিবাদ এড়াইতে, পুঁথিগত শিক্ষার উপর অত্যধিক আস্থা স্থাপন না করিতে এবং স্ত্রীলোকের নিকটসঙ্গ ত্যাগ করার উপর বিশেষ জোর দিতেন। তিনি দেশীয় সংস্কার সম্বন্ধে প্রত্যক্ষভাবে কোন বিরোধিতা করেন নাই, কিন্তু তিনি নিজে তাহার উর্দ্ধে ছিলেন। তাঁহার মতে, সিদ্ধ পুরুষদের কোন প্রকার জাতিভেদ জ্ঞান থাকে না, কিন্তু সাধারণ লোকের তাহা মানিয়া লওয়া প্রয়োজন। অনুরূপভাবে সন্ন্যাসীর জন্য গৈরিক বসনের প্রয়োজন অপরিহার্য বলিয়া তিনি মনে করেন নাই। তবে উহার ব্যবহার ভক্তিভাব বৃদ্ধির অনুকূল হইতে পারে যেমন ক্যানভাসের জুতা এবং ছিন্ন কাপড় পরিধানে চিত্তে দৈন্যের উদয় হয় কিন্তু হ্যাট, বুট, কোট, জুতায় চিত্তে আত্মগর্ব ও দম্ভ প্রকাশ পায়।" তাঁহার বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে নিম্নোক্ত উদ্ধৃতিগুলি উল্লেখযোগ্য।

"এই পৃথিবীতে এইরূপ বহুলোক আছেন যাহারা বরফ এই পদার্থটির নাম শুনিয়াছেন, কিন্তু তাঁহাবা উহা কখনও চোখে দেখেন নাই। সেইরূপ বহু ধর্মপ্রচারক আছেন যাঁহারা ভগবানের প্রকৃতি সম্বন্ধে অনেক কথা ধর্মশাস্ত্রে পড়িয়াছেন, কিন্তু জীবনে কখনও তাঁহারা ভগবানকে দেখেন নাই। আর একদল লোক আছেন যাঁহারা বরফ দেখিয়াছেন, কিন্তু কখনও তাহার আস্বাদ গ্রহণ করেন নাই; অনুরূপভাবে একদল ধর্মপ্রচারক আছেন যাহারা দূর হইতে ভগবানকে দেখার মতন অস্পষ্ট আভাষ পাইয়াছেন, কিন্তু ঈশ্বরতত্ত্ব সম্বন্ধে প্রকৃত কোন জ্ঞান তাঁহারা লাভ করেন নাই। যে ব্যক্তি স্বয়ং বরফের আস্বাদ গ্রহণ করিয়াছেন তিনিই বরফের প্রকৃত বিবরণ বলিতে পারেন। সেইরূপ যিনি

সেবা-ভক্তিদ্বারা অনুরূপভাবে ভগবানকে উপলব্ধি করিতে পারিয়াছেন, তিনিই তাঁহার প্রকৃত গুণকে বর্ণনা করিতে সক্ষম।"

"পুস্তক পড়া বিদ্যার উপর নির্ভর করিয়া ভগবান সম্বন্ধে কিছু শিক্ষা দেওয়া আর মানচিত্রে বারাণসী দেখিয়া ঐ জিলা সম্বন্ধে শিক্ষা দেওয়া একই কথা।"

নিম্নোক্ত নীতিমূলক গল্প হইতে ধর্মজীবনে অধ্যবসায়ের প্রয়োজনীয়তা দেখানো হইয়াছে। "এক ব্যক্তি একটি পুকুর খনন করিতে গেল। সে দুই হাত মাটি খুঁড়িলে একজন লোক সেখানে আসিয়া তাহাকে বলিল, 'বন্ধু, তুমি বৃথা পরিশ্রম কেন করিতেছ? এই মাটির নীচে কোথাও তুমি জল পাইবে না। এখানে তুমি বালি ছাড়া আর কিছুই পাইবে না।' সেই ব্যক্তি তৎক্ষণাৎ সেই স্থান পরিত্যাগ করিয়া অন্যত্র খনন কার্যে প্রবৃত্ত হইল। তারপর আর একজন লোক সেখানে আসিয়া তাহাকে বলিল, 'বন্ধু, এখানে পূর্বে একটি পুকুর ছিল। এখানে তুমি নিরর্থক কেন পরিশ্রম করিতেছ? একটু দক্ষিণ দিকে সরিয়া গিয়া যদি তুমি খনন কার্য কর, তাহা হইলে হয়ত তুমি উৎকৃষ্ট জল পাইতে পার।' খননকারী তৎক্ষণাৎ তাহার উপদেশমত কাজ করিল। কিন্তু সেই স্থানেও আর একজন লোক আসিয়া তাহাকে নিরুৎসাহ করিল। এইভাবে যেখানেই সে পুকুর খনন করিতে গেল সেখানেই কেহ না কেহ আসিয়া তাহাকে নিবৃত্ত করিল। ফলে তাহার আর পুকুর খনন করা হইল না। ঠিক অনুরূপ-ভাবেই বহুলোক ধর্মজীবন লাভের চেষ্টায় দেউলিয়া হইয়া যায়। যে ব্যক্তি আজ বিশ্বাস অর্জন করে, পরীক্ষা ও প্রলোভনে পড়িয়া কালই সে বিশ্বাস হারায়। অবশেষে সে একেবারেই নাস্তিক হইয়া যাইতে পারে, অথবা তাহার দৃঢ় ধারণা হইতে পারে যে এই জীবনে ধার্মিক হওয়া সম্ভব নয়।"

এই ক্ষুদ্র পুস্তিকায় আত্মোন্নতি লাভের কতকগুলি সার্থক তত্ত্ব বিশ্লেষণ দেখিয়া আকৃষ্ট হইতে হয়। এইরূপ ব্যাখ্যা ইউরোপেও অজ্ঞাত নহে। সাধু রামকৃষ্ণের শিক্ষা সংস্কৃতি যাহাই থাকুক না কেন তাঁহার এই সকল বাণী পড়িয়া তাঁহার প্রতি প্রকৃত শ্রদ্ধাবোধ জাগ্রত না

হইয়া পারে না। এই গ্রন্থপাঠে সর্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় যে বিষয়টি মনে আসে তাহা হইল যে আচার্যের চিন্তাধারায় এমন কিছু রহিয়াছে যাহা তাঁহার শিক্ষিত দেশবাসীগণকে গভীরভাবে প্রভাবান্বিত করিয়াছে। স্মরণ রাখিতেই হইবে যে, এইখানি একজন ভারতীয় ভারতীয়দিগের জন্য লিখিয়াছেন—ইউরোপীয়দিগের পরিবেশনের জন্য ইহা নহে। এই ধরনের বই-এর ইংরাজী ভাষায় আক্ষরিক অনুবাদ হওয়া উচিত। এই জাতীয় পুস্তক হইতে হিন্দুদিগের প্রকৃত ভাবধারা সম্বন্ধে যাহা জানা যায় তাহা বোধহয় ভারত ভ্রমণকারীদিগের লিখিত ভ্রমণ বৃত্তান্ত পাঠেও জানা যায় না। কারণ এই ভদ্রলোকগণ রেলের গতিতে ভারত পরিভ্রমণ করেন এবং কেবলমাত্র ইউরোপীয় কর্মকর্তা ও সেই সব 'বুট ও প্যান্টুলন' ধারী ইউরোপীয়ভাবে পরিচালিত ভারতীয়দিগের সঙ্গ করেন যাহাদের এই বাঙ্গালী কোন স্বীকৃতিদান করেন নাই।

রামকৃষ্ণ জীবন আলেখ্য*

রামকৃষ্ণের নামটি সম্প্রতি ভারতীয়, মার্কিন ও বিটিশ সংবাদপত্রে প্রায়শ উল্লেখিত হওয়ায় আমার মনে হইয়াছে যে তাঁহার জীবন ও শিক্ষা বিষয়ে একটি সম্পূর্ণ আলেখ্য সেই সকল মহলে সমাদৃত হইবে যাঁহারা ভারতীয় মনীষা ও নৈতিক জগত সম্পর্কে কৌতুহলী এবং যাঁহাদের নিকট দেশ বিদেশের ধর্ম ও দর্শনের ক্রমবিকাশের ধারা কখনোই মনোযোগের অযোগ্য বলিয়া বিবেচিত হয় না। সুতরাং সদ্য পরলোকগত এই ভারতীয় সন্ত (দেহান্তর ১৮৮৬) সম্পর্কে আমি যতদূর সম্ভব তথ্য সংগ্রহে সচেষ্ট হইয়াছি এবং এই তথ্য অংশতঃ সংগ্রহ করিয়াছি রামকৃষ্ণের ভক্ত-শিষ্যদিগের মারফৎ এবং অংশতঃ ভারতীয় সংবাদপত্র, সাময়িক পত্র এবং তাঁহার জীবনের উল্লেখযোগ্য ঘটনা সম্বলিত পুস্তকাদি হইতে। স্থান-কাল-অবস্থা নির্বিশেষে তাঁহার দেওয়া নৈতিক ও ধর্মীয় শিক্ষা যে রূপে বর্ণিত হইয়াছে তাহাও সংগ্রহ করিয়াছি।

ভারতীয় সম্প্রদায়ের, যাঁহাদের সঙ্গে রামকৃষ্ণ যুক্ত ছিলেন, নৈতিক অধঃপতন সম্পর্কে যাহা কিছুই প্রচার করা হউক না কেন, ইহা অনস্বীকার্য যে তাঁহাদের মধ্যে এরূপ ব্যক্তি আছেন যাঁহারা আমাদের ভালবাসা ও সহানুভূতি পাওয়ার যোগ্য। ভারতের জটিল সমাজ ব্যবস্থায় এরূপ অনেকে আছেন যাঁহাদের ঠিক সন্ন্যাসী বলা যায় না —যাঁহাদের যাদুকর অথবা হঠযোগী আখ্যা দেওয়া যায়। তাঁহারা আত্মনিগ্রহ ও কঠোর সংযমরীতি প্রয়োগ করিয়া রিপুদমন করিয়া থাকেন এবং স্নায়বিক উত্তেজনা সৃষ্টি মারফৎ এরূপ এক স্তরে পৌঁছাইয়া থাকেন যে তাহার ফলে তাঁহারা বাহ্যজ্ঞান হারাইয়া থাকেন এবং দীর্ঘসময় সংজ্ঞাহীন অবস্থায় থাকেন। যাঁহারা দীর্ঘদিন ভারতে বসবাস করিয়াছেন তাঁহারা কেবলমাত্র রাজা-মহারাজাদিগের সঙ্গে পরিচিত হন নাই এই সকল বিচিত্র চরিত্রের ব্যক্তিদিগের সম্বন্ধেও অবগত হইয়াছেন। শরীর ও আত্মনিগ্রহকারী এই সকল শহীদদিগের সম্বন্ধে অনেক ঘটনা অতি-

রঞ্জিত হওয়া সত্ত্বেও এরূপ অসংখ্য বাস্তব ঘটনা বর্তমান যাহা সকল অবস্থায় আমাদের কৌতুহল জাগ্রত করিতে সক্ষম। কোনো কোনো প্রকৃত সন্ন্যাসী যখন দর্শন ও ধর্মীয় সমস্যা সম্পর্কে তাঁহাদের সুচিন্তিত অভিমত ব্যক্ত করিয়া থাকেন তখন তাঁহাদের মুখ নিঃসৃত বাণী, যাহা শ্রবণের জন্য তাঁহাদের দেশে অসংখ্য মানুষ তাঁহাদের ঘিরিয়া থাকে এবং শুনিয়া মুগ্ধ হয়, আমাদের হৃদয়ের মনোযোগ ও সহানুভূতি আকর্ষণে ব্যর্থ হইতে পারে না যদি রামকৃষ্ণের ন্যায় তাঁহাদের উপদেশ উৎসাহী প্রচারকদিগের মাধ্যমে কেবল মাত্র ভারতেই নহে, আমেরিকা ও ইংল্যাণ্ডে প্রসার লাভ করে।

আমাদের এই আশঙ্কার কোন কারণ নাই যে ভারতীয় সন্ন্যাসীগণ ইউরোপে তাঁহাদের অনুগামী অথবা অনুকারীদিগকে খুঁজিয়া পাইবে—সেরূপ কোন বাসনা তাঁহাদের পক্ষে কাম্যও নহে—এমন কি মানসিক গবেষণা অথবা শারীর-মনো-বিজ্ঞান পরীক্ষাগারে গবেষণার প্রয়োজনেও নহে। এই প্রসঙ্গ ব্যতীত, এই সন্ন্যাসীদিগের কোন একজনের শিক্ষা সম্পর্কে জ্ঞান সঞ্চয় করা নিশ্চয়ই বাঞ্ছনীয় বিশেষ করে সেই সকল কূট-নীতিবিদ্‌গণের যাঁহাদের ভারতীয় সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষদিগের সংস্পর্শে আসিতে হয় অথবা সেই সকল খ্রীষ্টান ধর্মপ্রচারকদিগকে যাঁহারা ভারতীয় চরিত্র উপলব্ধি করিতে ব্যগ্র এবং ঐ দেশের অধিবাসীদিগের উপর প্রভাব বিস্তারে আগ্রহী অথবা শেষতঃ দর্শন ও ধর্মের সেই সকল ছাত্রদিগকে যাহাদের জানা উচিত সাম্প্রতিককালে কী উপায়ে ঈশ্বর-প্রেমী ভক্তগণ পৃথিবীর প্রাচীনতম দর্শনশাস্ত্র বেদান্তের শিক্ষা দিয়া থাকেন এবং কেবলমাত্র মুষ্টিমেয় দার্শনিকদিগের উপর নহে দার্শনিকদিগের দেশ সমগ্র ভারতবর্ষের বিশাল জনসাধারণের উপর ইহার গভীর প্রতিক্রিয়া। যে দেশে পরিব্যাপ্ত হইয়াছে এরূপ চিন্তাধারা যাহার প্রকাশ রামকৃষ্ণের বাণীর মাধ্যমে সেই দেশকে অজ্ঞ পৌত্তলিকদিগের দেশ বলিয়া গণ্য করা সম্ভবত সমীচীন নহে এবং মধ্য আফ্রিকার অধিবাসীদিগের ক্ষেত্রে অবলম্বিত পদ্ধতির মাধ্যমে তাহাদের ধর্মান্তরিত করা যাইবে না।

যেহেতু রামকৃষ্ণ-বাণীর পশ্চাৎপটে রহিয়াছে বেদান্ত, সুতরাং ঐ

দর্শনের প্রধান বৈশিষ্ট্যের একটি সংক্ষিপ্ত রূপরেখা সংযোজন যুক্তিযুক্ত বলিয়া আমার মনে হয়। ইহা ব্যতীত অনেক পাঠকগণের পক্ষে রামকৃষ্ণ ও তাঁহার শিষ্যবর্গের আদর্শ হৃদয়ঙ্গম করা সম্ভব হইবে না।

আমি সম্পূর্ণ সচেতন যে তাঁহার বাণীর কয়েকটি আমাদের নিকট কেবল মাত্র অদ্ভুতই নহে পরন্তু অশ্লীল বলিয়া মনে হইতে পারে। উদাহরণ স্বরূপ, ঈশ্বরকে মাতৃরূপে কল্পনা করা আমাদের নিকট বিস্ময়কর বলিয়া মনে হইতে পারে কিন্তু আমরা যখন তাঁহার বাণী অধ্যয়ন করি ইহার তাৎপর্য আমরা উপলব্ধি করিতে সক্ষম—

'মা বলতে ভক্ত এত মত্ত হন কেন ?'

'মার কাছে যে আব্দার বেশী। সন্তানের কাছে মা আর মায়ের কাছে সন্তান যত প্রিয় যত আপন নিঃসংকোচ এমন আর কেউ না, কোথাও না।'

কখনো কখনো এই হিন্দুভক্তেরা ঈশ্বর সম্বন্ধে এমন ভাষায় কথা বলেন যাহা আমাদের নিকট অতি সাধারণ এমন কি অসম্মানজনক বলিয়া মনে হইতে পারে। এই বিষয়ে তাঁহারা নিজেরাও হয়তো সচেতন এবং অজুহাত দেখাইয়া বলেন—

'যে খাঁটি ভক্ত দিব্য প্রেমের অমৃত আকুণ্ঠ পান করেছে সে তো খাঁটি মাতালের তুল্য, আর সেজন্যই তো বিহিত নিয়ম কানুন মেনে চলা তার পক্ষে সব সময় সম্ভব হয় না।'

অথবা পুনরায়—

'সাধকের বল কি ?'

'শিশুদের মতো সাধকের কান্নাই বল।'

যদি আমরা স্মরণে না রাখি যে হারেমের মূল অর্থ একটি পবিত্র ও সুরক্ষিত স্থান তাহা হইলে নিম্নোদ্ধৃত বাণীটি নিশ্চিতরূপে কানে লাগিবে—

'জ্ঞান—পুরুষ। ভক্তি—স্ত্রীলোক।

ঈশ্বরের বাহির বাটিতে জ্ঞান যেতে পারে, কিন্তু অন্তঃপুরে ভক্তি ছাড়া আর কেউ যেতে পারে না।'

পরবর্তী বাণী হইতে আমরা সম্যক বুঝিতে পারি ঈশ্বর জ্ঞান ও ভক্তির রহস্য কত গভীরভাবে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন রামকৃষ্ণ'—ঈশ্বরের জ্ঞান ও ঈশ্বরের ভক্তি শেষ পর্যন্ত অভিন্ন। জ্ঞান ও শুদ্ধা ভক্তি একই।'

পরবর্তী উক্তিগুলি তাঁহার সমুন্নত বিশ্বাসের প্রকাশ—

'যার প্রাণ ব্যাকুল হয়েছে তার ঈশ্বর দর্শন হবেই।'

'যার বিশ্বাস আছে তার সব আছে। যার বিশ্বাস নেই তার কিছুই নেই।'

'শিশুর মত সরল না হ'লে দিব্যজ্ঞান হয় না। বিষয়-বুদ্ধি ত্যাগ ক'রে শিশুর মতো অবোধ হও তো সত্যকে পাবে ?

'সাধকের বল কোথায় ?'

'তার চোখের জলে। নাছোড়বান্দা সন্তানের কান্না শুনে মা যেমন তার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করেন, তেমনি যে সাধক সরল শিশুর মতো ব্যাকুল অন্তরে কাঁদেন তাঁকে ভগবান দেখা না দিয়ে থাকতে পারেন না।'

'তেল ছাড়া দীপ জ্বলে না, ঈশ্বর ছাড়া মানুষ বাঁচে না।'

'ঈশ্বর সকলকার ভেতর আছেন, কিন্তু সব মানুষ তাঁর ভেতর নেই, এজন্যেই লোকের এত দুঃখ।'

এই সকল বাণী হইতে আমরা জানিতে পারি যে ভারতের ন্যায় অন্য কোথাও মানবাত্মা ও প্রকৃতিতে ঐশী সত্তার অস্তিত্ব এরূপ তীব্র ও বিশ্বজনীন রূপে অনুভূত হয় নাই এবং যদিও ভগবৎ-প্রেম এবং ঈশ্বরের মধ্যে সম্পূর্ণ বিলীন হওয়ার অনুভূতিটিও রামকৃষ্ণের মুখনিঃসৃত বাণীর মাধ্যমে যেরূপে প্রতিফলিত হইয়াছে অন্য কোথাও এরূপ গভীরভাবে প্রকটিত হয় নাই তথাপি ঐশী প্রকৃতি ও মানব-প্রকৃতির মধ্যে বিচ্ছেদ সৃষ্টিকারী প্রতিবন্ধকগুলি সম্পর্কে তাঁহার সঠিক ধারণা ছিল।

আমরা যদি একথা স্মরণে রাখি যে রামকৃষ্ণের উচ্চারিত বাণীর মাধ্যমে কেবলমাত্র তাঁহার নিজস্ব চিন্তারই প্রতিফলন হয় নাই, লক্ষ লক্ষ মানুষের বিশ্বাস ও আশার বাণীও ব্যক্ত হইয়াছে, তাহা হইলে ঐ দেশের ভবিষ্যত সম্পর্কেও আমরা আশান্বিত হইতে পারি। মানুষের চেতনা

ঐ দেশে বর্তমান এবং সকলেই ঐ চেতনার অংশীদার এমন কি তাহারাও যাহারা মূর্তিপূজা করে। ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্পর্কে নিত্য উপলব্ধি প্রকৃতপক্ষে একটি সাধারণ ভিত্তি যাহার উপর, আমরা আশা করিতে পারি, অদূর ভবিষ্যতে অনাগত দিনের মহান মন্দির স্থাপিত হইবে যথায় হিন্দু ও অ-হিন্দু হৃদয়ের সঙ্গে হৃদয় ও হাতে হাত মিলাইয়া উপাসনা করিবে সেই সর্বশক্তিমান পরমাত্মার যিনি আমাদের সকলের অন্তরে বিদ্যমান—তাঁহাতেই আমাদের জীবন, আমাদের কর্ম ও অস্তিত্ব।

---

* জার্মান ভারততত্ত্ব-বিদ্ মাক্সমুলার ১৮৯৬ সালে প্রকাশিত 'নাইনটিনথ্ সেঞ্চুরী'-র অগাস্ট সংখ্যায় 'এ রিয়েল মহাত্মান' ('একজন প্রকৃত মহাত্মা') এই শিরোনামায় শ্রীরামকৃষ্ণ সম্পর্কে একটি প্রবন্ধ লেখেন। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল ভারতের সাধু-সন্ন্যাসীদের নিয়ে ভারতে, ইংলণ্ড ও আমেরিকার সংবাদপত্রে যে সমস্ত আজগুবি ও অতিরঞ্জিত ঘটনার প্রচার চলছিল তার প্রতিবাদ করা এবং সঙ্গে সঙ্গে তাঁদের সম্পর্কে প্রকৃত তথ্য প্রকাশ করা। এই প্রবন্ধ প্রকাশিত হওয়া মাত্র ভারত ও বিদেশে প্রচণ্ড বিতর্কের সৃষ্টি হয়। স্বামী বিবেকানন্দ এই প্রবন্ধের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেন। তাঁর সমালোচকদের উত্তর দেওয়া এবং আরও তথ্য পরিবেশন করার উদ্দেশ্য নিয়ে মাক্স মূলার ১৮৯৮ খ্রীস্টাব্দে 'রামকৃষ্ণ—হিজ লাইফ্ এ্যাণ্ড সেইংস্' (রামকৃষ্ণ—জীবন ও বাণী) এই নামে একটি বই প্রকাশ করেন। বিদেশী ভাষায় সম্ভবতঃ এই বইটি রামকৃষ্ণদেবের উপর লিখিত প্রথম জীবনী। স্বামী বিবেকানন্দ এই জীবনী গ্রন্থেরও ভূয়সী প্রশংসা করেন। —সম্পাদক

রামকৃষ্ণ পরমহংস

কোন ব্যক্তি যদি কলিকাতা হইতে হুগলী নদীর উপর দিয়া ভ্রমণ করেন তাহা হইলে নদীতীরস্থ বহু মন্দির তাঁহার দৃষ্টি আকর্ষণ করিবে। মন্দিরগুলির অধিকাংশ একই ধাঁচে নির্মিত—সারি সারি চওড়া সিঁড়ি গঙ্গারতীর পর্যন্ত বিস্তৃত হইয়া স্নানের ঘাটে পরিণত হইয়াছে—শ্লেটের মত ধূসর বর্ণের মন্দির সমূহে স্থপতি শিল্পের পরিচয় পাইতে কাহারও কোন কষ্ট হইবে না। বর্তমানেও বাংলা দেশের অনেক গ্রামে ঐরূপ বক্রছাদ বিশিষ্ট কুটীর দেখা যায়। ঐ মন্দিরগুলি শিবের উদ্দেশ্যে উৎসর্গীকৃত। সৃষ্টি রহস্যের প্রতীক যোনী লিঙ্গ ইহাতে বর্তমান। এই সকলই কাল পাথরে একই আকারে একই গঠনে নির্মিত। সারিবদ্ধভাবে তাহাদের বারোটি বর্তমানে নদীর তীরেই স্নানের ঘাটের শীর্ষস্থানে দেউরির উভয়পার্শ্বে স্থাপিত। তাহার পিছনে আছে আঙ্গিনা। এই আঙ্গিনার কেন্দ্রস্থলে রহিয়াছে প্রধান মন্দির। সেই মন্দির কালী কিংবা অন্য কোন দেব মূর্তির উদ্দেশ্যে উৎসর্গীকৃত। এইমন্দির সাধারণভাবে চিত্তাকর্ষক। প্রধান মন্দিরের পার্শ্বে সারি সারি বক্রছাদ বিশিষ্ট কুটীর আছে এবং ইহার শিরোভাগ সারি সারি সুন্দর গম্বুজদ্বারা শোভিত।

কলিকাতার কয়েকমাইল দূরে দক্ষিণেশ্বরের মন্দির। যে কেহ নদীর স্রোত ধরিয়া উপরের দিকে অগ্রসর হইলে সারি সারি দীর্ঘ ক্যাজুরিনা বৃক্ষেরমধ্যে মন্দিরের জমিতে দণ্ডায়মান এই মন্দিরটি চিনিতে পারিবেন। এইগুলি দূর হইতেও দেখা যায়। ১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দে রানী রাসমণি নামে এক ধর্মশীলা মহিলা এইটি নির্মাণ করেন। এইখানেই দক্ষিণেশ্বরের সুপ্রসিদ্ধ সাধু তাঁহার জীবনের অধিকাংশ সময় কাটাইয়াছেন। বর্তমান যুগে শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস নামে ইতিহাস প্রসিদ্ধ গদাধর চ্যাটার্জী এবং তাঁহার প্রধান শিষ্য নরেন্দ্রনাথ দত্ত, স্বামী বিবেকানন্দ নামে সুপরিচিত, বাংলার জনগণের মনে যে প্রভাব বিস্তার করিয়াছেন তদপেক্ষা অধিক প্রভাব আর কেহ বিস্তার করিতে পারেন নাই। যে সময় পাশ্চাত্যের আদর্শ

এবং চালচলন মানুষকে উন্মত্ত করিয়া তুলিয়াছিল এবং যখন যন্ত্র বিজ্ঞানের আবিষ্কারে মানুষের জীবন হইয়া উঠিয়াছিল খুবই জটিল নিজেকে শ্রেষ্ঠ প্রতিপন্ন করার সেই যুগে এই দুই ব্যক্তি প্রাচ্যের ত্যাগ ও সারল্যের প্রাচীন আদর্শ প্রচারে তৎপর হইয়া উঠিয়াছিলেন।

জানুয়ারী মাসের এক সূর্যালোকিত দিনে যখন ছায়াঘন স্থানটির উপর স্থাপিত মন্দির সংলগ্ন গৃহগুলি এক অতি মনোমুগ্ধকর সৌন্দর্য সৃষ্টি করিয়াছিল সেই সময় যে সকল পদার্থ প্রয়াত সাধুর সাহচর্যে বিশেষ পবিত্র বলিয়া পরিগণিত হইয়াছিল সেই সকল বস্তু আমাকে দেখানো হইয়াছিল। এখানে প্রাঙ্গণের উত্তর-পশ্চিম কোনে যে ঘরটিতে তিনি জীবনের অধিকাংশ সময় কাটাইয়াছিলেন সেই ঘরটি অবস্থিত। উত্তর প্রান্তের জমিতে বট, অশথ, নিম, আমলকী ও বেল—এই পাঁচটি বৃক্ষ রামকৃষ্ণের অনুরোধে রোপিত হইয়াছিল—এই দিকেও আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করা হইয়াছিল। বলা হয়, এই স্থানে তিনি ধ্যান ও বিবিধ ধর্মীয় সাধন ক্রিয়ায় বহুসময় অতিবাহিত করিয়াছিলেন। ইহার পর আমাকে বুঝাইয়া বলা হইয়াছিল যে প্রাঙ্গণের কেন্দ্র স্থলে দুইটি মন্দিরের একটি দিব্য প্রেমের প্রতীক রাধা-কৃষ্ণ এবং অপরটি অনন্ত ঈশ্বরের প্রতীক বিশ্বজননী কালীর উদ্দেশ্যে উৎসর্গীকৃত। ইহার আকর্ষণ ছিল রাম-কৃষ্ণের নিকট সর্বাধিক।

মন্দিরের সংলগ্ন স্থানে ঐ সাধুর ভারতীয় ভক্তবৃন্দের দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া আমি দণ্ডায়মান অবস্থায় ঐ সাধুর জীবনী ও শিক্ষার আবেগময় বর্ণনা শুনিতেছিলাম এবং অতিশয় প্রভাবান্বিত হইয়া পড়ি। শিষ্যগণ পরিবেষ্টিত আচার্য আত্মত্যাগ ও ঈশ্বর ভক্তি মাধ্যমে মুক্তিপথ ব্যাখ্যারত—এই মূর্তি কল্পনা করিতে আমার সামান্যতম অসুবিধাও হয় নাই।

সকলই আমি যেন চক্ষুদ্বারাই প্রত্যক্ষ করিতেছিলাম। অতএব ঘটনার পুনঃ সংযোজনে আমার কল্পনার কোন সাহায্যই প্রয়োজন হয় নাই। সান্ধ্যস্নিগ্ধ পরিবেশে পদচারণা করিতে করিতে এবং মাঝে মাঝে, আসিয়া শিষ্যদের সঙ্গে কথোপকথনরত প্রসন্ন আচার্যের মূর্তি কোন

একজন বর্ণনায় রূপায়িত করিয়াছিলেন। প্রাঙ্গণে সান্ধ্যছায়া নামিয়া আসার সঙ্গে সঙ্গে যে কেহ কল্পনা নেত্রে দেখিতে পাইবে মন্দিরটি আলোকোজ্জ্বল হইয়াছে এবং মন্দিরের সেবকগণ ধূপ জ্বালিয়া দেওয়ায় ধূপের গন্ধে বাতাস আমোদিত হইয়া উঠিয়াছে। তখন তাহার মনে হইবে সান্ধ্য উপাসনা সুরু হইয়াছে—নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া শঙ্খ, ঘণ্টা, কাঁসর, মৃদঙ্গের ঐকতানের ধ্বনি পবিত্র নদীর কলস্রোতে দূরে প্রতিধ্বনিত হইতেছে। রৌপ্যোজ্জ্বল চাঁদ আকাশে উদিত হয় এবং বৃক্ষরাজি ও মন্দিরসমূহে সন্ধ্যার অন্ধকার ভেদ করিয়া নক্ষত্রখোচিত রাত্রির পটভূমিকায় প্রকাশিত হয়। এইরূপ অপূর্ব উপযুক্ত পরিবেশেই দেখা যাইত এক মহিমাময় মূর্তি জগজ্জননীর পদতলে আনত হইয়া প্রণাম করিতেছেন, সুরেলা স্বরে জগজ্জননীর নাম কীর্তন করিতেছেন, মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত তাঁহার জীবন নিয়ন্ত্রিণী দেবীর মন্ত্র জপ করিতেছেন আর বলিতেছেন ব্রহ্ম আত্মা ভগবান পরম সত্যস্বরূপ; যোগীগণারাধ্য, ভক্তগণারাধ্য সকল রূপেই তুমি একস্বরূপ ; শরণাগত আমি তোমার, শরণাগত আমি তোমার, ব্রহ্মই শক্তি, শক্তিই ব্রহ্ম, পরমেশ্বর এবং জগজ্জননী এক। তাহার পর সমবেত হইতে থাকেন তাঁহার ভক্তগণ উৎসাহী ও সহানুভূতিশীল বাঙ্গালী যুবকবৃন্দ তাহাদের কালো চোখ আবেগে উজ্জ্বল—সকলেরই পরিধানে সাদা দেশীয় ধুতি চাদর—তাহাদের মাঝখানে আচার্য যোগাসনে উপবিষ্ট। ইহার পর সুরু হইত কথোপকথন।

ব্রাহ্মণ মাতাপিতার ঘরে ১৮৩৪* খৃষ্টাব্দে ২০ শে ফেব্রুয়ারী গদাধর চ্যাটার্জী জন্মগ্রহণ করেন। বাল্যকাল হইতেই তিনি ধর্মের দিকে আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দে দক্ষিণেশ্বরের মন্দির প্রতিষ্ঠার সময় তিনি সেখানকার সহকারী পুরোহিত হিসাবে কাজ করিতেছিলেন। তিনি পণ্ডিত ছিলেন না, কিন্তু কেশব চন্দ্র সেন, পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, বঙ্কিম চ্যাটার্জী, প্রতাপ চন্দ্র মজুমদার এবং আরও অনেক সুপণ্ডিত চিন্তানায়কদিগের আকর্ষণ করিবার ক্ষমতা তাঁহার ছিল। তাঁহাদের অন্যতম কেশব চন্দ্র সেনের পরমভক্ত প্রতাপ চন্দ্র শিক্ষিত মানব সমাজে

* ১৮৩৬ —সম্পাদক।

রামকৃষ্ণের প্রভাব দেখিয়া অবাক এবং অভিভূত হইয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন, "তাঁহার আর আমার মধ্যে মিল কোথায়? আমি ইউরোপীয় শিক্ষায় শিক্ষিত, সভ্য, আত্মকেন্দ্রিক, অর্দ্ধসংশয়বাদী এবং তথা-কথিত শিক্ষিত, যুক্তিবাদী, আর তিনি হইলেন, একজন দরিদ্র অশিক্ষিত অসভ্য, অর্দ্ধপৌত্তলিক, বান্ধবহীন হিন্দু ভক্ত। যে আমি ডিজরেলী এবং ফাউসেট, ষ্ট্যানলী এবং মাস্ক ম্যুলার এবং সমস্ত ইউরোপীয় পণ্ডিত ও ধার্মিক-দিগের কথা শুনিয়াছি সেই আমি তাঁহার কথা শুনিবার জন্য ঘণ্টার পর ঘণ্টা কেন বসিয়া থাকি? এবং কেবল আমি একা নই, আমার মত অনেকেই এইরূপ করে।" বিশেষভাবে বিবেচনার পর তিনি এই সিদ্ধান্ত উপনীত হন যে, তাঁহার ধর্মপরায়ণতাই তাঁহার একমাত্র গুণ। তবে তাঁহার ধর্মও ছিল একটি ধাঁধাঁর মত। "তিনি পূজা করিতেন শিবের, কালীর, রামের, কৃষ্ণের, এবং প্রচার করিতেন বিশুদ্ধ অদ্বৈত ধর্মবাদ। তিনি ছিলেন পুতুল পূজায় বিশ্বাসী অথচ এক নিরাকার অনন্ত ব্রহ্মের ধ্যানে তাঁহার ছিল ঐকান্তিক নিষ্ঠা। তাঁহার ধর্ম হইল আনন্দ, তাঁহার পূজার অর্থ হইল দেহাতীত অন্তর্দৃষ্টিলাভ। তাঁহার সমগ্র প্রকৃতিতে এক অদ্ভুত বিশ্বাস ও ভক্তি নিত্য অনির্বাণভাবে জ্বলিত।"

তিনি তোতাপুরী নামে এক ব্যক্তির নিকট বেদান্ত শিক্ষা লাভ করেন, তোতাপুরী ছিলেন এক সাধু এবং তিনি প্রায় একবৎসর দক্ষিণেশ্বরের মন্দিরে অবস্থান করেন। কিন্তু রামকৃষ্ণ জ্ঞানের পথে নহে, ভক্তির পথে বিশ্ব রহস্যের সমাধানে সচেষ্ট হন। স্বভাবে তিনি দার্শনিক ছিলেন না—ছিলেন অতীন্দ্রিয়বাদী। তাঁহার জীবনকথা ও শিক্ষা চৈতন্যের ভাবময় মূর্তি স্মরণ করাইয়া দেয়। নদীয়ার বৈষ্ণব মহাপ্রভুর ন্যায় তিনিও তাঁহার হৃদয়ের আবেগ নৃত্য ও কীর্তনযোগে প্রকাশ করিতেন। ভক্ত শিষ্যগণের স্তোত্রগান শ্রবণে তাঁহার চোখে অশ্রুজল ঝরিত এবং প্রায়ই তাঁহার ভাব সমাধি হইত। তাঁহার বাল্যকাল হইতেই এইরূপ ভাব সমাধি হইত। এগারো বৎসর বয়সে তাঁহার এই অভিজ্ঞতা প্রথম হয়। তাঁহার নিজের বিবৃতি অনুসারে ঐসময় মাঠের মধ্যে চলিতে চলিতে ঈশ্বরমহিমাসূচক দৃশ্য দেখিয়াই তিনি বাহ্যজ্ঞান হারাইয়া ছিলেন।

ঈশ্বর জ্ঞান হইল তাঁহার অন্তর প্রসূত এবং এইজন্য পদ্ধতিমত লেখাপড়ার প্রয়োজন তিনি কখনও বোধ করেন নাই। শাস্ত্র সম্বন্ধে আলোচনারত শিষ্যদের একবার তিনি বলিয়াছিলেন, "এই বিষয়ে আমি কি মনে করি তোমরা কি তা জান? গ্রন্থ,—শাস্ত্র-গ্রন্থ—ভগবানের দিকে যাওয়ার পথ দেখাইয়া দেয়। এই পথের সন্ধান একবার যদি পাও তাহা হইলে বই-এর আর প্রয়োজন কি?" মধ্যবিত্ত ঘরের এক শিক্ষিত যুবক এই সাধুর ক্রমবর্ধমান খ্যাতির কথা শুনিয়া একদিন তাঁহার সহিত দেখা করিতে যাইতেছিল, তাহার স্বভাবতই পাণ্ডিত্যের এবং বিভিন্ন মানব এবং গ্রন্থ সম্বন্ধে জ্ঞানের গর্ব ছিল। সে যখন শুনিল যে ঐ সাধু পণ্ডিত নহেন, এবং বই-এর পরোয়া করেন না তখন সে অত্যন্ত আশ্চর্য হইয়াছিল। প্রথম সাক্ষাতেই সে তাঁহার সহিত মূর্তিপূজা সম্বন্ধে তর্ক তুলিয়াছিল। রামকৃষ্ণ তাঁহার সকল শাস্ত্রযুক্তি উড়াইয়া দিয়া বলিয়াছিলেন, "যাহা তোমার জ্ঞানের বাইরে এবং যাহা তুমি বুঝ না তাহা লইয়া মাথা ঘামাইতেছ কেন? বিশ্বেশ্বর কি প্রত্যেক মানুষের হৃদয় মন্দিরে থাকেন না এবং তাহার অন্তরস্থিত চিন্তাধারার সংবাদ রাখেন না? তাই যদি হয় তবে তাঁহার অনুসন্ধান তুমি কর—তাঁহাকে শ্রদ্ধা কর ঈশ্বরকে ভালবাসো ইহাই তোমার আসন্নতম কর্তব্য।"

বাহ্য বিভেদ দৃষ্টির কোন মূল্যই তাঁহার নিকট ছিল না। ঈশ্বর এক এবং অদ্বিতীয়, তিনিই সব, তিনিই বস্তু জগতের দার্শনিকদিগের ব্রহ্ম। কিন্তু তাহার ফলে বস্তু জগতের সহিত সম্বন্ধ প্রকাশ করিতে তাঁহার বিভিন্ন অভিব্যক্তিতে কোন বাধা থাকিতে পারে না। কৃষ্ণ তাঁহার দিব্য প্রেমের অভিব্যক্ত মূর্তি, কালী তাঁহার বিশ্বসৃষ্টি ও রক্ষার অভিব্যক্ত রূপ। ভগবানকে জানিতে পারিলে এই সকল আর কোন সমস্যার সৃষ্টি করিতে পারে না। সেই শিক্ষিত ভদ্রলোকটি জিজ্ঞাসা করিল, "মহাশয়, ভগবানকে দেখা কি সম্ভব?" তখনই উত্তর হইল, "নিশ্চয়ই সম্ভব। আকুল হৃদয়ে ভগবানের নিকট প্রার্থনা কর, তাহা হইলেই তুমি তাঁহাকে দেখিতে পাইবে।" তাঁহার শিষ্যদিগের কথায় ইহা স্পষ্টভাবেই জানা যায় যে তিনি প্রায়ই সেই চরম আনন্দময় পর্যায় পোঁছাইতেন যাহা হিন্দুগণের

মতে সমাধি—ঈশ্বরোপলব্ধির অবস্থা। অনন্ত অক্ষয় ব্রহ্মজ্ঞানের এই অবস্থাকে জীবাত্মা পরমাত্মার পূর্ণযোগ বলা হয় এবং এই ব্রহ্মানন্দময় অবস্থায় পুরাকালে ঋষিগণ সর্বদাই আত্মস্থ থাকিতেন বলিয়া অধ্যাপক বি. এন. সেন অভিমত ব্যক্ত করিয়াছেন।

সর্বত্র ঈশ্বর আছেন ভারতের এই সর্বাস্তিত্ববাদ তাঁহার সহজাত প্রবৃত্তিতে ছিল। বাল্যকালে মন্দিরের দেবতার পূজার জন্য পুষ্পচয়ন ছিল তাঁহার প্রাত্যহিক অন্যতম কর্তব্য। শোনা যায়, একদিন বেলপাতা সংগ্রহকালে বেলগাছের কিছু ছাল ছিঁড়িয়া যায়। ইহাতে তাঁহার মনে হইয়াছিল যে, যে অন্তর্যামী দেবতা তাঁহার ভিতর আছেন এবং যিনি সকল পদার্থে সমানভাবে অবস্থান করেন তিনি অত্যন্ত গুরুতরভাবে আঘাত পাইয়াছেন। ভগবানের বিশ্বব্যাপী অস্তিত্ব তাঁহার মনে এমনই দৃঢ়বদ্ধ ছিল যে ইহার পরে তিনি আর কখনও কোন গাছের পাতাচয়নে প্রবৃত্ত হন নাই। মানুষের যুক্তিবোধ যে সকল প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করে তাহা তাঁহার ধুইয়া মুছিয়া গিয়াছিল। যদি যুক্তি দ্বারা কিছু বোঝান না যায় তবে তাহাকে বিশ্বাস বলিয়া মানিয়া লইতে হইবে। তর্কশাস্ত্রের দিক হইতে তাঁহার অনেক ব্যাখ্যায় যুক্তির দৃঢ়তার অভাব ছিল। যদি সকলই ঈশ্বরের অভিব্যক্তি হয় তবে কোন কোন স্থলে কোন জিনিস অনিষ্টের কারণ হইতে পারে কিনা এই প্রশ্নের উত্তরে তিনি একজন যুবক সাধুর কাহিনী বলেন। একজন মত্ত হস্তীর সম্মুখ হইতে তাহাকে দূরে যাইতে বলায় সে সেইকথা শুনিল না। মাহুত চীৎকার করিয়া তাহাকে সরিয়া যাইতে বলে, কিন্তু সেই যুবকটি মনে মনে ভাবিল "হাতী ভগবানের এক রূপ," অতএব সে পলায়ন না করিয়া তাহার স্তুতি করিতে লাগিল। পরে সেই আহত সাধুকে তুলিয়া আনা হইলে এবং তাহার জ্ঞান ফিরিয়া আসিলে সে তাহার সরিয়া না যাওয়ার কারণ ব্যক্ত করিল। কিন্তু তাহার গুরু তাহাকে তিরস্কার করিয়া বলিলেন, "ভগবান সর্বভুতে বর্তমান ইহা সত্য। তিনি যেমন হস্তীর মধ্যে বর্তমান তেমনি মাহুতের মধ্যেও কি তিনি বর্তমান নহেন? তাহা হইলে বল, তুমি মাহুতের সতর্কবাণী কেন শোন নাই?"

ইহা অপেক্ষাও দুর্বল যুক্তিতে তিনি ভগবানের আপাত পক্ষপাতিত্ব দোষ কাটাইয়া দেন। পণ্ডিত বিদ্যাসাগর তাঁহাকে একবার জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "মহাশয়, তাহা হইলে কি আমাদের বিশ্বাস করিতে হইবে যে, আমরা অসমান গুণ লইয়া এই পৃথিবীতে সৃষ্ট হইয়াছি? ভগবান কি ব্যক্তি বিশেষের উপর পক্ষপাতী?" উত্তরে ঠাকুর বলিয়াছিলেন, "দেখ, জগতের ঘটনা যেভাবে ঘটে তাহাই আমাদের মানিয়া লইতে হইবে। বিশ্ব বিধানের সকল ব্যবস্থা মানুষকে পরিষ্কার ভাবে বুঝিবার ক্ষমতা দেওয়া হয় নাই?"

যুক্তি ও অনুপ্রেরণার মূল্য তিনি কি ভাবে আরোপ করিতেন একটি দৃশ্যদ্বারা তাহা দেখানো যায়। একদিন সন্ধ্যাকালে মন্দির প্রাঙ্গণে বহু শিষ্যের সম্মুখে ইহা ঘটিয়াছিল। তিনি পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত তাঁহার এক ভক্তকে জিজ্ঞাসা করেন, "ইংরাজী ভাষায় তর্কশাস্ত্র সম্বন্ধে কোন বই আছে কি?" তাঁহাকে বলা হইল এই সম্বন্ধে ইংরাজী ভাষায় অনেক বই-ই আছে এবং উদাহরণস্বরূপ তর্কশাস্ত্রের সেই অংশের কথা বলা হইল যাহাতে সাধারণ তর্কবাক্য হইতে বিশেষে যাওয়ার অবরোহ-মূলক পদ্ধতি রহিয়াছে। এই সম্বন্ধে তিনি বিশেষ মনযোগ দিলেন না, মনে হইল এই যুক্তি তাঁহার কানে পেঁাছায় নাই। তাঁহার সেই যুক্তিশাস্ত্র ব্যাখ্যাতা কিছুক্ষণ তাঁহার দিকে তাকাইয়া বিস্ময়ে হতবাক হইলেন। তাহারই ভাষায় আমি এই দৃশ্যটি উপস্থাপিত করিতেছি। "ঠাকুর স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। তাঁহার দৃষ্টি স্থির। তাঁহার শ্বাস-প্রশ্বাস চলিতেছে কিনা তাহা বলা কঠিন।...তাঁহার অধর প্রান্তের মৃদু হাসিতে তাঁহার মুখমণ্ডল এক দিব্যানন্দের অনুভূতির আলোকে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছিল। নিশ্চয়ই তিনি এমন কিছু দর্শনের আনন্দ উপভোগ করিতে ছিলেন যাহা লক্ষ লক্ষ চন্দ্রের স্নিগ্ধ দীপ্তিদ্বারা মণ্ডিত এক অনুপম সৌন্দর্য দর্শন জনিত আনন্দকে ম্লান করিয়া দিয়াছিল। ইহাই কি ঈশ্বর দর্শন? যদি তাহাই হয় তবে কত গভীর ও প্রবল সেই ভক্তি বিশ্বাস, কত কঠোর সেই সাধনা যাহার ফলে নশ্বর মানুষ এই দর্শন লাভ করিতে পারে?" লেখক আমাদের আরও বলিয়াছেন গৃহে প্রত্যাবর্তনের পথে

তাহার সেই সমাধির অনুপম চিত্র এবং দিব্য প্রেমানন্দের অপূর্ব উচ্ছ্বাস এমন স্পষ্টরূপে তাহার মনে ফুটিয়া উঠিয়াছিল যে মনে মনে তিনি বলিতে বলিতে চলিয়াছিলেন, "মন আমার, এইরূপ প্রেম এবং আনন্দের মাধুর্য-রসে ডুবিয়া যাও। হ্যাঁ, ঈশ্বর আনন্দে প্রমত্ত হও।"

বিশ্ব সম্বন্ধে অদ্বৈতবাদীদিগের সহিত রামকৃষ্ণের কোন মত বিরোধ ছিল না। আপন প্রকৃতি অনুসারে তিনি ভগবানের সাকাররূপের উপর বেশী মূল্য আরোপ করিতেন। শঙ্করের অদ্বৈততত্ত্ব একমাত্র পূর্ণ সমাধিতে লাভ করা যায়। একবার সমাধি হইতে চেতনার জগতে প্রত্যাবর্তনকালে তাঁহাকে বলিতে শোনা গিয়াছিল "হ্যাঁ, আমার মা কালী অদ্বৈত ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন নহেন। ষড় দর্শন তাহাদের যুক্তি তর্কদ্বারা তাঁহার সন্ধান পায় না।" কিন্তু সমাধি ভঙ্গ হইলে মানুষের নূতন করিয়া এক আঁমিত্ববোধ জাগে এবং মায়ার জগৎকে তাহার আপেক্ষিক সত্য বলিয়া মনে হয়। ইহার কারণ কি? কারণ হইল, তাহার সেই আমিত্বজ্ঞানে তাহার ব্যষ্টি অহং-বোধ সত্য বলিয়া মনে হয়। সুতরাং "যতক্ষণ তাহার নিকট ব্যষ্টি অহংবোধ সত্য (আপেক্ষিক সত্য) জাগতিক জ্ঞানও ততক্ষণ সত্য। অদ্বৈতজ্ঞানই (আপেক্ষিক জ্ঞানে) মিথ্যা"। তিনি সর্বদা এই বিষয়ের উপর খুব জোর দিতেন।

নির্বিকল্প সমাধি ভঙ্গ হইলে অদ্বৈত তত্ত্ব সম্বন্ধে কিছুই বলিতে পারিতেন না। "ভেদজ্ঞানে অভেদজ্ঞান সম্বন্ধে তিনি মূক হইয়া যান। আপেক্ষিক জগদজ্ঞানে দ্বন্দ্বাতীত অদ্বৈতজ্ঞান বিষয়ে তাঁহার মুখ বন্ধ হইয়া যায়।" সাধারণ লোকের সমাধি হয় না। তাহাকে ভগবানের মূর্তরূপ ধ্যান করিতে হইবে এবং তাঁহার সহিত যুক্ত হইতে হইবে। কারণ, "যতক্ষণ তুমি ব্যক্তি বিশেষ মাত্র ততক্ষণ তুমি ভগবানের ব্যক্তরূপ ছাড়া স্বরূপ ধারণা করিতে পারিবে না।"

রামকৃষ্ণের নিজের ক্ষেত্রে এই শেষোক্ত অন্তরায় কোন বাধা সৃষ্টি করিতে পারে নাই, কেননা প্রকৃতিগতভাবে তিনি ছিলেন ভাববাদী, যুক্তিবাদী নহেন, তিনি ঘোষণা করিয়াছেন, "কোন ভক্ত নিয়মানুগভাবে নিরাকার পরমাত্মাকে উপলব্ধি করিতে চায় না। সে চায় তাহার সমস্ত

অহংজ্ঞান যেন সমাধিতে নিশ্চিহ্ন না হইয়া যায়।” তিনি ইহার সপক্ষে যে যুক্তি দেখাইয়াছেন তাহা তাঁহার মত স্বভাবের ব্যক্তির নিকট হইতেই আশা করা যায়। “মূর্তরূপে দিব্যদর্শন করার মত অহংবোধ তাহার আছে। সে চিনির সংগে এক না হইয়া চিনি আস্বাদনেই বেশী আনন্দ লাভ করিবে।”

১৮৮৪ খৃষ্টাব্দের এক অপরাহ্নে পণ্ডিত শশধরের সঙ্গে কলিকাতায় সাক্ষাৎকারের সময় তিনি তাঁহার মতবাদকে সংক্ষেপে প্রকাশ করিয়াছিলেন। জ্ঞান, কর্ম আত্মসমর্পন এবং ভক্তি প্রভৃতি বহু পথেই ভগবানের নিকট যাওয়া যায়। দার্শনিকদিগের জ্ঞানের পথ। তাঁহার উদ্দেশ্য হইল নির্বিশেষ ব্রহ্মের অনুভূতি। তিনি এক একটি করিয়া পদার্থকে “নেতি নেতি” বলিয়া পরিহার করেন এবং এমন অবস্থায় আসিয়া পেঁছান যে অবস্থায় অস্তি নাস্তি ভেদজ্ঞান থাকে না। কর্মযোগের কথা গীতায় আছে—সর্বাবস্থায় এক দেহাতীত আনন্দের মধ্যে থাকা—সংসারে থাকিয়াও সংসারের উর্ধে থাকার নিরত অভ্যাস করা। বর্তমান যুগে এই দুই পথের একটি পথও সহজসাধ্য নয়। এই জড় বিজ্ঞানের যুগে বাস করিয়া ‘আমি দেহ’ এই দৃঢ় সংস্কার হইতে মুক্ত হওয়া প্রায় অসম্ভব। এই অবস্থায় সে কি করিয়া আপনাকে নির্বিশেষ দ্বন্দ্বাতীত ভাবাতীত বিশ্বাত্মার সঙ্গে এক বলিয়া বুঝিবে? কর্মের পথেরও সেই একই অবস্থা। মানুষ সংকল্প করিতে পারে যে, সে এই জগতে বা পরজগতে কোন পুরস্কারের আশা কিংবা শাস্তির ভয় ছাড়াই কাজ করিতে পারে, কিন্তু জ্ঞাতসারে হউক বা অজ্ঞাতসারে হউক কর্মফলে তাহার আসক্তি থাকিয়া যাওয়ার সম্ভাবনা রহিয়াই যায়। অতএব মানুষ মূর্ত ভগবানের সহিত মিলনের আশায়ই তাঁহার উপাসনা করুক, কারণ, ভগবানকে ভালবাসা, পূজা করা এবং তাঁহার নিকট আত্মসমর্পণ করাই সর্বাপেক্ষা সুগম পথ। ইহার জন্য প্রয়োজন অবিরাম প্রার্থনা। এই যুগে ভগবানকে লাভ করার ইহাই সর্বাপেক্ষা সরল পথ।

১৮৮৬ খৃষ্টাব্দের প্রথম ভাগে রামকৃষ্ণ অত্যন্ত অসুস্থ হন। অধ্যাপক গুপ্ত হৃদয়স্পর্শীভাবে এক অধ্যায়ে কাশীপুর বাগানে শিষ্যগণ পরিবেষ্টিত

তাঁহার অন্তিম দিনগুলির বেদনাদায়ক অসুস্থতার বিবরণ দিয়াছেন।* তাঁহার বায়ান্ন বৎসর পূর্তি'র অনতিবিলম্বেই মহাপ্রয়াণ ঘটে।

গত শতাব্দীর আশী দশকে যে সকল যুবক দক্ষিণেশ্বরের মন্দিরে সমবেত হইতেন তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই তাঁহাদের আচার্যের বাণী প্রচার করিতেছেন। যাঁহারা তাঁহার ত্যাগের পথ অবলম্বন করিয়াছেন তাঁহাদের দ্বারাই এক সন্ন্যাসী সম্প্রদায় গঠিত হইয়াছে যাহার প্রধান কেন্দ্র হইল হুগলী নদীর তীরে দক্ষিণেশ্বরের অপর পাড়ে বেলুড় মঠ। ইহার শাখা মঠ বাংলা দেশ, যুক্তপ্রদেশ ও মাদ্রাজে রহিয়াছে। এই মঠ সংশ্লিষ্ট সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারী লইয়াই গঠিত। তাঁহাদের দুই দলেরই উদ্দেশ্য যথাক্রমে ত্যাগ ও লোক সেবাব্রত গ্রহণ। স্বামী বিবেকানন্দের মতে, এই দুইটি ধর্মই হইল ভারতের জাতীয় আদর্শ। এই সমিতি বা মঠ সকল প্রকার সমাজ সেবা, দাতব্য কার্য ও শিক্ষাপ্রসারের কার্য করিয়া থাকে। যে আদর্শ ও অনুভূতিকে নিজের জীবনে শ্রীরামকৃষ্ণ মূর্ত করিয়াছিলেন আত্মিক উন্নয়নের মাধ্যমে এইগুলিকে চিরস্থায়ী করার কার্যে এই মঠসমূহ উৎসর্গীকৃত। মায়াবতী আশ্রম নামে ইহাদের একটি শাখা বিশাল হিমালয়ের রহস্যময় অঞ্চলে যেন জগতের বাহিরে লুক্কায়িত। ইহা আলমোরা হইতে পঞ্চাশ মাইল উত্তর পূর্বে অবস্থিত। সেখানে মাত্র অদ্বৈত বেদান্ত চর্চাই হয় শঙ্করাচার্য প্রবর্তিত নির্বিশেষ ব্রহ্ম জ্ঞান অর্জনের নিমিত্ত।...

বেলুড় মঠে সন্ন্যাসীগণের মধ্যে কাহারও কাহারও সঙ্গে আমার দেখা হইয়াছে। তাঁহাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া আমার এই ধারণা হইয়াছে যে, বিতৃষ্ণার জন্যই কেবল তাঁহারা সংসার ত্যাগ করেন নাই। তাঁহাদের মতে সগুন অথবা নিগুর্ন ব্রহ্ম যাহাই বলা হউক না কেন তিনিই একমাত্র সত্য বস্তু। তিনিই মানবজাতির চরম আশ্রয়স্থল এবং আগেই হউক অথবা পরেই হউক মানুষকে তাঁহার নিকট যাইতে হইবে।

* অধ্যাপক এম. এন. গুপ্ত, যিনি পরবর্তীকালে রামকৃষ্ণের একজন অনুরাগী ভক্তে পরিণত হন এবং "শ্রীম" এই ছদ্মনামে তাঁহার (রামকৃষ্ণের)

জীবন ও উপদেশ সম্বলিত একটি পুস্তক, "'শ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত", প্রকাশ করেন, তিনি এখনও কলিকাতায় বাস করেন। বেদান্তের কয়েকটি নীতি বুঝিতে আমার অসুবিধা হওয়ায় তিনি "কথামৃতের" কয়েকটি অনুচ্ছেদের প্রতি আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। এই পুস্তকটিতে রামকৃষ্ণের উপদেশ অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এই অধ্যায়ে রামকৃষ্ণের জীবনী ও উপদেশ সম্পর্কে যে উল্লেখ করিয়াছি তাহা অধ্যাপক গুপ্তের বিবরণীর উপর ভিত্তিশীল।

জীবই শিব

শোনা যায় তোতাপুরীর প্রস্থানের পর শ্রীরামকৃষ্ণ যখন মোহাবিষ্ট অবস্থা হইতে পার্থিব চেতনার জগতে ফিরিয়া আসেন একদিন তিনি দেখিলেন দুইজন মাঝি পরস্পর ঘৃণাবশতঃ কলহ করিতেছে। এই বিদ্বেষ লক্ষ্য করিয়া তাঁহার হৃদয় হইতে যেন রক্ত-ক্ষরণ হইতে লাগিল এবং যন্ত্রণায় তিনি চীৎকার করিয়া উঠিলেন। জগতের দুঃখ-কষ্ট তাঁহাকে পীড়িত করিতেছিল। তাঁহার পুনরুত্থিত চেতনাশীল দেহে জগতের সকল দুখ-কষ্ট ফুটিয়াছিল।

আজ যখন সকল পৃথিবী হিংসায় উন্মত্ত, জাতি-ধর্ম-শ্রেণী সমূহের মধ্যে সর্বত্র যুদ্ধ ছড়াইয়া পড়িতেছে অথবা ধূমায়িত হইয়া উঠিতেছে সেই সময় তিনি জীবিত থাকিলে তিনি কি কষ্ট অনুভব করিতেন—কি নিদারুণ বেদনা বোধ করিতেন!

শক্তিমান পরমহংস তাঁহার ডানার সাহায্যে দৈনন্দিন জীবনের ঊর্ধ্বে উঠিয়া যাইতে পারিতেন কিন্তু তিনি অন্যান্য যোগীগণের ন্যায় জীবন হইতে নিজেকে বিচ্ছিন্ন রাখিয়া জগতের দুঃখ এড়াইতে চাহেন নাই। ইহার কারণ তাঁহার বিশ্বপ্রেম। মানুষের দুঃখ-দুর্দশা তাঁহার অন্তর্দৃষ্টির সম্মুখে মুহূর্তে প্রকাশ করিয়াছিল "জীবই শিব"—যত্র জীব তত্র শিব—যে ঈশ্বরকে ভালবাসে সে তাঁহার সঙ্গে দুঃখে-কষ্টে, এমন কি ভ্রান্তি ও আতিশয্যে এবং মানব প্রকৃতির ভয়াবহ প্রকাশেও মিলিত হইবে।

আমরা সকলেই জানি যে তিনি তাঁহার প্রধান শিষ্য বিবেকানন্দকে অনন্ত ঈশ্বর লাভের মোহ হইতে দূরে সরাইয়া জীব সেবায় নিযুক্ত করেন। আপনারাও তাঁহার প্রদর্শিত পথ অনুসরণ করিয়া রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের প্রতীক হংসের ন্যায় দীন দুঃখীদিগকে আপনাদের পক্ষপুটে আশ্রয় দান করিতেছেন এবং ভ্রাতার ন্যায় সাহায্য করিতেছেন। আপনারা আপনাদের গুরুদেবের তাৎপর্যপূর্ণ উপদেশ পালন করিয়া চলিয়াছেন

—"মনের শান্তি চাও তো অপরের সেবা কর····যদি ঈশ্বরলাভ করিতে চাও তো মানুষের সেবা কর।"

তাঁহার এই উপদেশ বিস্মৃত হওয়া জন্য বহু ধর্ম দুর্বল ও ধ্বংসোম্মুখ হইয়াছে। তাহারা মানুষকে ভুলিয়াছে। অপরপক্ষে মানুষও তাহাদের ভুলিয়াছে। সে ঈশ্বর বিনাই নিজেকে সাহায্য করিতে শিখিয়াছে—(আমাদের ইউরোপের একজন শিল্পী এবং অতি ধর্ম-পরায়ণও বটেন, বিটোফেন, যাহারা ঈশ্বরের সাহায্য প্রার্থনা করে, তাহাদের উদ্দেশ্যে যেমন বলেন—"হে মানব! তুমি নিজেকে সাহায্য কর!····)। সে নিজেকে সাহায্য করিতে শিখিয়াছে সেই ঈশ্বরের বিরুদ্ধেও যে ঈশ্বরকে সে অবিচ্ছেদ্যভাবে সামিল করিয়াছে সেই সকল যাজকীয় কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যাহারা শাসককুলের দালাল অথবা গৃহপরিচারিকার ন্যায় নিপীড়িত জনগণের বিরোধিতা করিয়াছে। ইউরোপের শক্তিমান যাজক সম্প্রদায়গুলির অন্যতম ক্যাথলিক যাজকগোষ্ঠী কি সেই বিজয়ী শক্তির পক্ষ অবলম্বনের ঘৃণ্য নীতি অনুসরণ করেন নাই যে শক্তি তাঁহাদের ধর্মীয় সুযোগ-সুবিধাগুলির প্রতি শ্রদ্ধা জানাইয়াছে? সুতরাং শক্তির সাহায্যে প্রতিষ্ঠিত অন্যায় অবিচারের সঙ্গে তাহারা নিজেদের জড়িত করিয়াছে। যাজক সম্প্রদায়ের বিস্মিত হওয়া উচিত নহে যখন নিপীড়িত জনগণ তাহাদের গোষ্ঠীভুক্ত করে সেই শক্তির সহিত যাহাদের অপশাসন হইতে মুক্তিলাভের জন্য তাহারা বিদ্রোহ করে। এই বিক্ষুব্ধ জনগণকে জীবন্ত ঈশ্বর বলিয়াই গণ্য করিতে হইবে যদিও তাহারা বিশ্বাস করে ঈশ্বর তাহাদের জন্য নহে অথবা তাহাদের বিরুদ্ধে কারণ তাহাদের এই চৈতন্যবোধ নাই যে অন্যায়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধের মাধ্যমে তাহারা জীবই শিব এই জ্ঞানালোকের প্রতি অগ্রসর হইতেছে। আমাদের উচিত এই সত্য স্বীকার করিয়া লওয়া।

আমরা এক বিপর্যস্ত জগতে বাস করিতেছি। এবং প্রকৃতপক্ষেই জনসাধারণ পদদলিত। এই সার্বিক অত্যাচার সম্পর্কে তাহাদের জ্ঞান ও চেতনা এই পর্যন্ত ছিল না। কিন্তু যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি ও আন্তর্জাতিক সংহতির প্রগতির ফলে তাহাদের নিকট এই ঘটনা উদ্ঘাটিত

হইয়াছে। বর্তমানে যে সকল জাতি তাহাদের শৃঙ্খল মোচন এবং সাম্য ও মানবতার নীতি প্রতিষ্ঠার জন্য মরণপণ সংগ্রাম করিতেছে তাহাদের প্রতি আমরা আর উদাসীন থাকিতে পারি না। এবং বিশেষ করে আমাদের পক্ষে, আপনাদিগের পাশ্চাত্য বন্ধুগণের পক্ষে, ইহা শোভনীয় নহে কারণ—আপনাদের ন্যায় মৃত্যুর পর জীবন আছে (অর্থাৎ পুনর্জন্মবাদ) ইহা আমরা বিশ্বাস করি না। কাল আমাদের উপর চাপ সৃষ্টি করিতেছে। মানব জাতির দুঃখতরঙ্গ আমাদের স্রোতের ন্যায় নিমজ্জিত করিতেছে। তাহাদের সাহায্যের জন্য আমাদের উড়িয়া যাইতে হইবে। আমাদের মৃত্যুর পর যদি অনন্ত জীবনও থাকে তথাপি প্রতিটি জীবন প্রাণ চঞ্চল এবং প্রত্যেকটি জীবনেই আছে স্ব স্ব কর্তব্য ও নীতি যাহার জন্ম সময় ও পরিবেশ উপযোগী হয়। প্রত্যেক মানুষের ক্ষমতা অনুযায়ী মঙ্গলময় কার্য না করিয়া যেমন মুক্তি নাই তেমনি কালের মানদণ্ডে অসাম্যের বিরুদ্ধে সর্বশক্তি প্রয়োগ কবিয়া সংগ্রাম করা ব্যতীত পথ নাই। পাশ্চাত্যে রামকৃষ্ণ ভক্তগণের একজন হইয়া আমি ইহা স্বীকার করি না যে নিজের মুক্তির জন্য কর্ম হইতে বিরত থাকা উচিত যখন নিপীড়িত মানবজাতির সাহাযোর জন্য কর্মের গুরুত্ব রহিয়াছে। একজন গুরুভ্রাতা বর্তমান জগতের দুঃখদৈন্যের জ্বালা হইতে মুক্তিলাভের আকাঙ্ক্ষায় পরমানন্দ দিব্য সমাধিরাজ্যে প্রবেশ করিবার ইচ্ছা যখন প্রকাশ করেন তখন সেই মহান শিষ্যের পবিত্র ক্রোধ প্রকাশের কথা মনে পড়ে—"বেদান্ত পাঠ ও ধ্যান পরজন্মের জন্য তুলে রাখো। ইহজন্মের এই শরীর পরের সেবায় উৎসর্গ কর"—এবং অবিস্মরণীয় প্রার্থনা : "আমি যেন বার বার আসি, বার বার জন্মগ্রহণের দুঃখ সইবো আমার ঈশ্বরের উপাসনার জন্য —আমার ঈশ্বর সর্বজীবের সমষ্টি, পাপী-তাপী, দরিদ্রই আমার ঈশ্বর।"

ঈশ্বর প্রেমিক ধার্মিকগণের কি বিস্ময়কর ভ্রান্তি আমরা প্রায়ই লক্ষ্য করি। তাঁহারা মনে করেন যে সাধারণ মানুষদিগের সংস্পর্শে আসিলে তাঁহাদের ভগবৎ-প্রেম হ্রাস পায় এবং আত্মার অধঃপতন হয়। পক্ষান্তরে ধাবমানা গঙ্গার স্রোতের ন্যায় চালমান অগণিত সত্তার সঙ্গে সংযোগের ফলে ইহা প্রসারিত ও প্রাণবন্ত হয়।

এইরূপ একাত্মবোধ অনুভব করিলে আপনারা জীবন্ত ঈশ্বরের প্রতিটি রূপকেই সেবা করিবেন অথচ হারাইবেন না সেই সর্বশক্তিমান ঐক্য স্বরূপের অনুভূতি ও অস্তিত্ব—যেখানে মিলিত হয় অসংখ্য পরস্পর বিরোধী সত্তা। জীবনসংগ্রামে লিপ্ত মানুষদিগের সাহায্যে হস্ত প্রসারিত করিলে—সকল সংগ্রমের ঊর্দ্ধে অবস্থিত সেই অপরিবর্তনীয় স্বর্গীয় শান্তিময় সত্তার প্রতি কোন অন্যায় করা হয় না। বিবেকানন্দ তাঁহার সন্ন্যাসীগণকে বারংবার বলিতেন যে তাঁহারা দুইটি ব্রত গ্রহণ করিয়াছেন—প্রথমটি হইল "সত্যকে উপলব্ধি করা" এবং দ্বিতীয়টি "জগৎকে সাহায্য করা"....."মানুষকে নিজের পায়ে সোজা হ'য়ে দাঁড়াতে সাহায্য করা"—আসুন আমরা তাহাদের সাহায্য করি "যারা নিজেরা নিজেদের সাহায্যে বীরের মত সোজা হ'য়ে দাঁড়াতে চেষ্টা করছে।" আসুন আমরা তাহাদের প্রয়াসে সাহায্য করি। এইরূপে পরবর্তীকালে হয়তো আমাদের পক্ষে সম্ভব হইবে বিবদমান শক্তিগুলির মধ্যে মিলন-সেতু রচনায় সাহায্য করা।

এই ঝঞ্চা-বিক্ষুব্ধ পৃথিবীতে পরম-সমন্বয় ধর্মের দূত আপনারা—আপনাদিগের মধ্যে মিলিয়া মিশিয়া এক হইয়া যাইবে সকল বিবাদ ও বিরোধিতা। ইহাই আপনাদিগের যথার্থ ভূমিকা। আপনাদিগের সুযোগ এবং পবিত্র কর্তব্য। যে বিশৃংখলার মধ্যে মানুষ অন্ধের ন্যায় পরস্পরের সঙ্গে বিরোধে লিপ্ত সেই বিপর্যয়ের মধ্যে আপানাদিগকে শান্তি, শৃংখলা ও ঐক্য প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে। শ্রীরামকৃষ্ণের মত হউন—যিনি ছিলেন বিশাল বটবৃক্ষের ন্যায় যাঁহার ছায়াতলে সহস্র সহস্র শ্রান্ত এবং সংসার যুদ্ধে ক্ষত-বিক্ষত আত্মা আশ্রয় ও শান্তিলাভের জন্য আসিত। যুক্তি ও ভালবাসার ফল স্বরূপ সমন্বয়-নির্যাস তাঁহাদের উপর বর্ষণ করুন। আমরা ইহা ভালভাবেই জানি যে ভুলপথে পরিচালিত ব্যক্তিগণই দুর্বৃত্তে পরিণত হয়। তাহারা বুঝিতে পারে না তাহারা কি করিতেছে। মুক্ত জনগণের শ্রেষ্ঠ নেতা লেনিন, ঘৃণ্য আক্রমণের স্বীকার হইয়াও, তাঁহার বন্ধুদিগের প্রতিহিংসাপরায়ণতাকে শান্ত করিবার জন্য বুদ্ধিদীপ্ত হাসিভরা মুখে বলেন —'কি করা যাবে প্রত্যেকে তার জ্ঞান অনুযায়ী কাজ করে।"

জগতের সকল দুর্ভাগ্যের উৎস জ্ঞানের অভাব। জ্ঞানলাভ কি করিয়া করা যায়—আসুন আমরা তাহা শিখাই। অপরের অনিষ্ট সাধনের অর্থ নিজের ক্ষতি সাধন—সেই কাজ হইতে বিরত থাকিবার জ্ঞান আমরা বিতরণ করি—আসুন। কারণ যে প্রতিবেশীর ক্ষতিসাধন করে সে ইহা জানে না যে সে নিজের অনিষ্টই করিতেছে। আমাদের ইউরোপের একজন অন্যতম মহান ব্যক্তি, প্রত্যাদিষ্ট কবি ভিক্টর হুগো, যাহারা তাঁহার ক্ষতিসাধনে উদ্যত হইয়াছিল, তাহাদের উদ্দেশ্যে সুন্দর উক্তি করেন যাহা ভারতীয় জ্ঞানের অনুরূপ—"ওহে! মূর্খ, কে বলে তুমি আমি নও ?...."

রামকৃষ্ণের শ্রেষ্ঠ অলৌকিকত্ব হইল তাঁহার নিকট "তুমি-ই" "আমি"। সমগ্র মানব হৃদয়ে কেবল মাত্র প্রতিফলিতই নহে মূর্তও বটে—পৃথিবীতেই ঈশ্বর দর্শন সম্ভব তাঁহার সার্বজনীন ও বৈচিত্র্যময় রূপে—"জীবই শিব।"

তাঁহার ও আমাদের পবিত্র ঐক্যবোধের মধ্যেই রামকৃষ্ণের লীলা খেলা চলিতেছে।

রামকৃষ্ণ ও সর্বধর্ম সমন্বয়

আবহমান কাল ধরিয়া মানবজাতির স্বীকৃতি লাভ করিতে সচেষ্ট বহু ধর্মমত ধর্মপরায়ণ ব্যক্তিদিগের মন অধিকার করিয়া রহিয়াছে। মানুষ যতই গভীরভাবে ধর্ম চর্চা করিবে ততই সে লক্ষ্য করিয়া বিচলিত হইবে যে, যে ধর্মের সঙ্গে সে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত এবং যে ধর্মে সে চরম এবং সর্বোচ্চ সত্য নিহিত আছে বলিয়া বিশ্বাস করে সেই ধর্ম পৃথিবীর স্বল্পসংখ্যক অধিবাসীদিগকে ঐক্যবদ্ধ করে এবং আমাদের গ্রহের অধিকাংশ মানুষ অন্য ধর্মমত অনুসরণ করে। সুতরাং যে ধর্মকে সে একমাত্র সত্য বলিয়া গ্রহণ করিয়াছে অন্যেরা কেন তাহাকে গ্রহণ করে না তাহার ব্যাখ্যা অনুসন্ধান তাহাকে করিতে হয়।

যাহারা যুক্তিহীন মতবাদে বিশ্বাসী তাহারা এই সমস্যার সমাধান করে অতি সরল এবং সুবিধাজনক উপায়ে ইহা কল্পনা করিয়া যে ভিন্ন-মতাবলম্বীগণ ভ্রান্ত। এই দৃষ্টিভঙ্গী স্পষ্টই দেখা যায় পাশ্চাত্যের মহান ধর্মসমূহে বিশেষতঃ ইহুদী ধর্মে এবং তাহার দুহিতাদ্বয় খ্রীষ্টান ও ইসলাম ধর্মমতে। গোঁড়া ধর্মশাস্ত্রবিদ্‌গণের মতে বাইবেল তথা ওল্ড্ এবং নিউ টেস্টামেন্ট্ একমাত্র পবিত্র ধর্মশাস্ত্র যাহার মধ্যেই কেবল নিহিত রহিয়াছে অতীন্দ্রিয় সত্য, কারণ একমাত্র বাইবেলকে দৈব্যসত্যের প্রকাশ বলিয়া গণ্য করা হয়। সুতরাং বাইবেল হইতে ঐশীজ্ঞান আহরণ করা উচিত এবং ইহার প্রামাণিকতার উপর ভিত্তি করিয়া সকল ধর্মতত্ত্ব গড়িয়া উঠিয়াছে।....গোঁড়া খ্রীষ্টানদিগের মতে যে শিক্ষা বাইবেলের দৈব্যসত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত নহে উহা ভিন্ন। উহা মানুষদিগের দ্বারা সৃষ্ট সুতরাং সম্পূর্ণ ভ্রান্ত। তাঁহাদের দৃষ্টিতে উহাই একমাত্র সত্য যাহা ঈশ্বরের প্রত্যাদেশ এবং জগৎ সৃষ্টির পর মানবজাতির নিকট জ্ঞাপন করা হয়। আদিম পাপের জন্যই মানবজাতি ইহা হারাইয়াছে এবং তাহার ফলস্বরূপ জন্মলাভ করিয়াছে অবিশ্বাস এবং পৌত্তলিকতা। যেহেতু প্রকৃত বিশ্বাসের পথ অনুসরণ করা একান্ত প্রয়োজন —বাইবেল যেরূপ পরিত্রাণের পথ

দেখাইয়া দিয়াছে—তাই অবিশ্বাসীদিগের জন্য প্রতীক্ষা করিতেছে অনন্ত নরক। এই ধারণা অবশ্যই ঈশ্বর করুণাময় এবং ন্যায়পরায়ণ তত্ত্বের বিরোধী।

বিভিন্ন অ-খৃষ্টান সম্প্রদায়গুলিও যুক্তিহীন মতবাদের দৃষ্টিকোণ হইতে বিশ্বাস করে তাহাদের ধর্মগ্রন্থ সকল সত্যের একমাত্র ভিত্তি। অবশ্য এমন অনেক সম্প্রদায় আছে যাহারা প্রকৃত ধর্ম অনুসরণ করে না তাহাদের সম্পর্কে উদার দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণ করে। যাহারা জন্মান্তরবাদে বিশ্বাসী তাহাদের মতে বিধর্মীগণ প্রকৃত সত্য ও মুক্তির উপায় সম্বন্ধে পরজন্মে সম্ভবত বুঝিতে পারিবে। যাঁহারা দিব্যজ্ঞানের অধিকারী বলিয়া গর্ব করেন তাঁহারাই অন্যধর্ম অনুগামীগণকে সমালোচনা করিয়া থাকেন। ঐরূপ অসহিষ্ণুতা তাঁহাদের মধ্যেও পরিলক্ষিত হয় যাঁহারা বিশ্ব-দর্শন সম্বন্ধে ধারণা অর্জন করিয়াছেন যুক্তি প্রমাণের অথবা প্রকৃত চর্চার মাধ্যমে অথবা সেই সকল গুরুদিগের নিকট যাঁহারা নিরীশ্বরবাদী অথবা যুক্তিবাদী। এমন এক সরল বিশ্বাসও প্রচলিত আছে যে জ্ঞানের প্রকৃত শিক্ষাই চরম লক্ষ্য এবং এই সত্যই সকল মানুষদিগের নিকট বাধ্যতামূলক এবং ইহাই অনুগ্রহলাভের পথ।

যুক্তিবাদহীন দৃষ্টিভঙ্গী কোন এক বিশেষ ধর্মাবলম্বীদিগকে কয়েকটি সুবিধা দিয়া থাকে। জগৎ ও জীবন সম্পর্কে বিবেচনায় সে লাভ করে এক দৃঢ় ভিত্তি এবং ইহা নির্মাণ করে এক সুদৃঢ় বাঁধ যাহাতে প্রতিহত হয় তাহার সকল সংশয়ের ঢেউ। এই দৃষ্টিভঙ্গী তাহার আচরণবিধি স্থির করিয়া দেয়।

বিশ্বের ইতিহাস নিঃসংশয়ে প্রমাণ করে যে, যে সকল মহাপুরুষ মানবসমাজের চিন্তাধারার উপর বিশেষ প্রভাব বিস্তার করিয়াছেন তাঁহাদের দৃঢ়বদ্ধ ধারণা ছিল যে তাঁহাদের মতবাদ প্রয়োগের উপযুক্ত এবং অপরের মতবাদ ভ্রান্ত এবং উহা সংশোধনের প্রয়োজন। সেণ্ট পল যদি দৃঢ়-ভাবে বিশ্বাস না করিতেন যে খৃষ্ট পুনরুজ্জীবিত হইয়াছেন এবং তাঁহার প্রায়শ্চিত্তমূলক মৃত্যুবরণ তাঁহাতে বিশ্বাসী সকল মানুষদিগকে মুক্তিবিধান করিয়াছে তাহা হইলে ভূমধ্যসাগরের চারিপার্শ্বে অবস্থিত

দেশসমূহে তাঁহার পক্ষে খৃষ্টধর্ম প্রচার করা কি সম্ভব হইত ? এমন কি যে ইসলাম অল্প সময়ে পৃথিবীর এক বিস্তীর্ণ এলাকা জয় করে তাহার জয়যাত্রা সম্ভব হইত না যদি তাহার সমর্থকগণ এই বিশ্বাস না করিত যে ঈশ্বর তাহাদের এই কার্যে নিযুক্ত করিয়াছেন। সকল বাধা-বিপত্তি সত্বেও যদি কোন দার্শনিক মানবজাতির চিন্তাধারার ইতিহাসে তাঁহার শিক্ষার অস্তিত্ব অটুট রাখিতে চাহেন তাহা হইলে তাঁহাকে দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করিতে হইবে যে জগতের রহস্য ব্যাখ্যায় তাঁহার তত্ত্ব সর্বশ্রেষ্ঠ এবং কর্মের সর্বোৎকৃষ্ট ভিত্তি।

ইহা ঘটনা যে বিভিন্ন ধর্মীয় শিক্ষা, যাহা বাস্তবিকই অংশতঃ সম্পূর্ণ পরস্পর বিরোধী, প্রায় সমভাবে সফল ; অপরপক্ষে তাহাদের একটিতে চরম ও সুনিশ্চিত সত্য নিহিত। যখন কেহ ইতিহাস চর্চা করিয়া জানিতে পারে যে কয়েকটি দেশ তাহাদের ধর্ম পরিবর্তন করিয়াছে তখন তাহার পক্ষে ইহা আন্তরিকভাবে বিশ্বাস করা কি সম্ভব যে ঈশ্বর সম্পর্কে কোন একটি ধর্মের শিক্ষা একমাত্র সত্য বলিয়া পৃথিবী গ্রহণ করিবে ? যদিও এক সময় উত্তর আফ্রিকা এবং নিকট প্রাচ্যে প্রচলিত ছিল খ্রীষ্টান ধর্ম আজ ইসলাম ধর্ম সেখানে প্রাধান্যলাভ করিয়াছে। দক্ষিণ স্পেন সাতশো বৎসরের উপর ইসলাম ধর্মের প্রভাবে ছিল এবং পরে বলপূর্বক উহা উচ্ছেদ করা হয়। বৌদ্ধধর্ম তাহার জন্মভূমি, আফগানিস্তান, তার্কিস্তান, জাভা এবং সুমাত্রা হইতে নিশ্চিহ্ন হইয়াছে।

কালক্রমে সকল ধর্মেরই এমন বিরাট পরিবর্তন ঘটিয়াছে যে যদিও তাহাদের বাহ্যিক রূপ অপরিবর্তনীয় রহিয়াছে তথাপি তাহাদের অন্তর্নিহিত তাৎপর্যের সম্পূর্ণ পরিবর্তন ঘটিয়া গিয়াছে। প্রত্যেক ধর্মীয় শিক্ষা এমন বিভিন্নরূপে ব্যাখ্যা করা হইয়াছে যে আপাত দৃষ্টিতে নির্দিষ্ট কোন একটি ধর্মের ঐক্য সংরক্ষিত হইলেও কখনো ঐ ধর্মের অনুগামীদিগের মধ্যে প্রকৃত এবং সম্পূর্ণ ঐক্যমত দেখা যায় নাই। যদি এই সকল বিষয় বিবেচনা করা হয় তাহা হইলে একটি বিশেষ ধর্মের মাধ্যমেই ঈশ্বরের করুণা লাভ করা সম্ভব এবং অদূর ভবিষ্যতে ইহা পৃথিবীব্যাপী ছড়াইয়া পড়িবে এই ধারণা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন বলিয়া

প্রমাণিত হইবে। বহুসংখ্যক ধর্মের অস্তিত্ব দেখিয়া আমরা এই সিদ্ধান্তে পেঁছাইতে পারি যে প্রত্যেক ধর্মেই চিরন্তন সত্যের অংশবিশেষ বর্তমান এবং বিভিন্ন ব্যক্তির প্রকৃতি এবং চারিত্রিক বৈষম্যের জন্যই ধর্মীয় শিক্ষায় এত বৈচিত্র।

যদিও একথা সত্য যে পৃথিবীর সকল মানুষকে কোন একটি ঐতিহাসিক ধর্মে দীক্ষিত করা সম্ভব হইবে না তথাপি অনেক চিন্তাবিদ্‌-গণ একটি সার্বজনীন ধর্ম প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব এই ধারণা ত্যাগ করিতে পারেন নাই। যেহেতু কোন একটি ঐতিহাসিক ধর্ম এই সার্বজনীন ধর্মের রূপ গ্রহণ করিতে পারিবে না সে-হেতু এই ধর্ম হইবে এই সকল ধর্মের উদ্ধে। এই ধর্মে সকল ধর্মের অনন্ত সত্যের অস্তিত্ব থাকিবে কিন্তু মানব প্রবর্তিত বিষয় থাকিবে না। প্রাচ্যে এবং পাশ্চাত্যে এই এক ধর্মের প্রতিষ্ঠার চেষ্টা হইয়াছে; উদাহরণ স্বরূপ আধুনিক যুগে অজ্ঞেয়বাদী তত্ত্বের কথা উল্লেখ করা যায়। আকবর, কবীর ও নানক ইসলাম এবং হিন্দুধর্মের সমন্বয় এবং ব্রাহ্মসমাজ এবং অন্যান্য সমাজ সকল ধর্মের মিলন সংঘটিত করিয়া এক উচ্চতর ধর্মের প্রতিষ্ঠায় প্রয়াসী হন। যাহা হউক এই প্রচেষ্টা যতই প্রশংসনীয় হউক না কেন কোন স্থায়ী ফল অর্জিত হয় নাই। বিভিন্ন ধর্মের সার লইয়া একটি নূতন ধর্মমতের প্রবর্তনে কাল্পনিক অংশ থাকিবেই কারণ কোন ধর্মের সত্যতা নিরূপণের কোন নির্দিষ্ট মান নাই। অভিনব ব্যাখ্যা অথবা পরস্পর বিরোধী বিশ্বাসের দুর্বল একীকরণের মাধ্যমে বিভিন্ন মতের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান সম্ভব নহে কারণ প্রকৃতিগত দিক হইতে ইহারা সম্পূর্ণ পরস্পরের বিপরীত। ওল্ড্‌ টেস্টামণ্টের প্রতিহিংসাপরায়ণ ঈশ্বরের সঙ্গে নিরাকার ব্রহ্মের, যাহা প্রকৃতিগতরূপে সচ্চিদানন্দ, সামঞ্জস্য বিধান করা কষ্টকর। পুনরুত্থান সম্পর্কে খ্রীষ্টান ও ইসলাম ধর্মের শিক্ষা বৌদ্ধ মতবাদের 'আমি'-র অনস্তিত্ব এবং সকল সৃষ্ট উপাদানের চিরন্তন পরিবর্তন পরস্পর বিরোধী। ধর্মসমূহের এইরূপ কৃত্রিম মিলন কোন একটি বিশেষ শ্রেণীর জনগণের সমর্থন লাভ করিতে পারে। ইহার স্বরূপ হইবে কৃত্রিম 'এসপ্যারেন্টো' ভাষার ন্যায় যাহা ব্যবহার করিত একটি

নির্দিষ্ট শ্রেণী কিন্তু ইহা পুরাতন ভাষার অলাভিভিসক্ত হইতে পারে নাই। ধর্ম কখনই প্রকৃতিগতভাবে প্রাণহীন বস্তু হইতে পারে না। ধর্মকে তাহার উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য তাহার অনুগামীদিগকে বাস্তব কিছু মিলাইয়া দিতে হইবে যেমন উহাতে রহিবে—দৃঢ় ধর্মীয় শিক্ষার খসড়া যাহা চিন্তাবিদ্‌গণকে জগৎ ও জীবনের সমস্যা সমাধানের পথ দেখাইবে, চিত্তাকর্ষক ভক্তি যাহা ধর্মের প্রেরণা যোগাইবে, ইচ্ছাশক্তি নিয়ন্ত্রণের নীতিশিক্ষা। ধর্মের অন্তর্নিহিত শক্তির প্রকাশ তখনই হয় যখন অন্ধ বিশ্বাসের মাধ্যমে তাহার প্রতিষ্ঠার ও অসীম সম্ভাবনা প্রকাশের চেষ্টা কতকগুলি বাধা-বিপত্তি ও শর্তের সম্মুখীন হয়। একটি ধর্ম যতই ব্যাপক এবং সার্বজনীন এবং বিভিন্ন বিশ্বাস ও উপাসনার মিলন ক্ষেত্র হউক না কেন ইহা তখনই ফলপ্রসূ হইতে পারে যদি সকল বস্তুর উপর ইহা একটি স্বাতন্ত্র্যের স্বাক্ষর রাখে যাহাতে ইহার সকল রহস্য সমরূপ দৃষ্টিভঙ্গী অবলম্বনে উদ্‌ঘাটন করা যায়। ইহা তখনই সম্ভব যদি সেই ধর্মের একটি বিশেষ রূপ পরিস্ফুট হয় যাহা উহাকে অন্যগুলি হইতে পৃথক করিবে, কারণ ইহাই একমাত্র বোধগম্য বস্তু যাহা ধর্মীয় ভাব, চিন্তা ও ইচ্ছার প্রেরণা সঞ্চার করে। অতএব যে সকল ধর্ম অন্যান্য ধর্মের বন্ধন মুক্ত করিয়া তাহাদের অন্তর্নিহিত সত্য উদ্‌ঘাটন করিতে সচেষ্ট হইয়াছিল কালক্রমে ঐ সকল ধর্ম অন্যরূপ পরিগ্রহ করিয়াছে। তাহারা তাহাদের শিক্ষার নির্দিষ্ট রূপ দিয়াছিল এবং নির্দিষ্ট আচার-অনুষ্ঠানের পত্তন করিয়াছিল (প্রতিষ্ঠাতা ও তাঁহার দেহাবশিষ্টের প্রতি শ্রদ্ধা) ও স্থির করিয়াছিল নৈতিক অনুশাসন ও বিধি-নিষেধ যাহা অনুগামীদিগের উপর বাধ্যতামূলকভাবে প্রযোজ্য ছিল। এইরূপে তাহারা স্বতন্ত্র ধর্মের রূপ পরিগ্রহণ করে যেমন শিখধর্ম যাহা নব-বিধান ও অন্যান্য আচার-অনুষ্ঠান পালন করে।

উপরোক্ত আলোচনা হইতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে বিভিন্ন ধর্মের মধ্যে সামঞ্জস্যবিধান করিয়া ঐক্য স্থাপন করা সম্ভব নহে। এই বিষয়ে সকল প্রচেষ্টার ফল ক্ষণস্থায়ী হইয়াছে এবং ধর্মের প্রবর্তক এবং তাঁহার অনুগামীদিগের তিরোধানের পর উহা শেষ হইয়া গিয়াছে অথবা কালের

অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের রূপান্তর ঘটিয়াছে। তাহারা ক্রমান্বয়ে অন্ধবিশ্বাসে পরিণত হয় এবং আচার-অনুষ্ঠান ও শিক্ষার বৈশিষ্ট্যের দিক হইতে অন্যান্য ধর্মের সঙ্গে তাহাদের পার্থক্য পরিলক্ষিত হইলেও প্রকৃতিগতভাবে কোন পার্থ্যকের অস্তিত্ব দেখা যায় না।

সুতরাং এ কথা কি কাহারও বিশ্বাস করা উচিত যে এমন কোন সত্য নাই যাহা সকল ধর্মে অন্তর্নিহিত আছে এবং এমন সত্যের অস্তিত্ব থাকিলেও তাহার উপলব্ধি সম্ভব নহে? অবশ্যই নহে। আমাদের সুনিশ্চিত হইতে হইবে যে আমরা সত্যের অনুসন্ধানে এমন কোন স্থানে করিতেছি না যথায় উহাকে পাওয়া যাইবে না। ভারতীয়দিগের এই কৃতিত্ব প্রাপ্য যে অতি প্রাচীনকালেই উহারা ইহা স্বীকার করিয়াছে যে কোন ধর্ম অথবা দর্শনই জীবন রহস্য ও ঈশ্বরের অস্তিত্ব ব্যাখ্যা করিতে পারে না এবং মুক্তিলাভের কোন সন্তোষজনক পথ দেখাইতে পারে না। সকল শিক্ষাই একপ্রকার দৃষ্টিভঙ্গী (দর্শন) ব্যতীত আর কিছুই নহে। তাঁহার নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গী অনুসারে কোন এক ধীসম্পন্ন ব্যক্তি "সত্তা" সম্বন্ধে ব্যাখ্যা করিতে চেষ্টা করিতে পারেন। জগৎ ও মুক্তিপথ সম্বন্ধে সর্বজনগ্রাহ্য ব্যাখ্যা দিতে সক্ষম এমন দাবী কোন ধর্মীয় শিক্ষাই করিতে পারে না। প্রত্যেক ধর্মীয় শিক্ষাই কতকাংশে মশালের ন্যায় যাহা অন্ধকারে ব্যক্তিবিশেষকে পথ আলোকিত করিয়া দেখাইতে পারে। কিন্তু সূর্য্যের ন্যায় সকল মানবজাতিকে রশ্মি বিতরণ করিতে পারে না। আরো একটি দৃষ্টান্ত লইতে পারি। কোন এক ব্যক্তি একটি বিশেষ দিক হইতে পর্বত দেখিলে সে কেবল মাত্র পর্বতের একটি পার্শ্বের বর্ণনা করিতে সক্ষম হইবে। যে ব্যক্তি পৃথিবীর উপর হইতে পর্বত দর্শন করিবে কেবলমাত্র সেই ব্যক্তি পর্বতের সম্পূর্ণ বর্ণনা করিতে সক্ষম। যে ব্যক্তি নিজস্ব দৃষ্টিকোণ হইতে ঈশ্বর ও জগতের প্রকৃতি দর্শন করে সে সত্য উপলব্ধি করিতে পারে না। যে ব্যক্তি তাহার চেতনাকে সকল ভেদবুদ্ধির উর্দ্ধে লইয়া যাইতে পারে কেবলমাত্র সে-ই সত্য উপলব্ধি করিতে পারে। যে ব্যক্তি পর্বত আরোহণের চেষ্টায় বিভিন্ন অংশ বিভিন্ন সময় আরোহণ করে সেই ব্যক্তি সফল হয় না। যে ব্যক্তি একটি সঠিক

পথ স্থির করিয়া সকল শক্তি ও ধৈর্য্য সহকারে তাহা অনুসরণ করে কেবলমাত্র সেই ব্যক্তিই গন্তব্যস্থলে পৌঁছাইতে সক্ষম। অনুরূপভাবে বিভিন্ন ধর্ম তাহাদের অনুগামীদিগকে কোন পথ অনুসরণ করিবে সে সম্পর্কে বিভিন্ন উপদেশ দেয় এবং তাহাদের চিন্তাধারা, অনুভূতি ও ইচ্ছাশক্তি বিবেচনা করিয়া তাহাদের পথ স্থির করিয়া দেয়। যে ব্যক্তি গন্তব্যস্থলে পৌঁছাইয়াছে সে স্পষ্টই বুঝিতে পারিবে যে সে সর্বোচ্চ সীমায় পৌঁছাইয়াছে কিনা অথবা তাহাকে লক্ষ্যস্থলে পৌঁছাইতে আরো পথ আরোহণ করিতে হইবে। সে তখনই উপলব্ধি করিবে যে সে নিজে শেষ পথ খুঁজিয়া পাইবে কিনা অথবা যাত্রার প্রাক্কালে তাহাকে সঠিক উপদেশ দেওয়া হইয়াছে কি না। ইহার তাৎপর্য সে তখনই মাত্র উপলব্ধি করিবে যখন সে পর্বত শীর্ষে পৌঁছাইবার পথে বেশ কিছু অংশ অতিক্রম করিয়াছে।

যে মহাত্মার (শ্রীরামকৃষ্ণ) জন্মশতবার্ষিকী আমরা এই বৎসর উদযাপন করিতেছি তিনি বৈদিক ঋষিগণ ও মহান আচার্যগণের গভীর জ্ঞান নূতন আলোকে দেখাইয়া ও নিজের জীবনে উপলব্ধি করিয়া তাহা তাঁহার বিখ্যাত বাণীর মাধ্যমে প্রকাশ করিয়া মানব জাতির ও ধর্মপরায়ণ-ব্যক্তিগণের পরম উপকার সাধন করিয়াছেন। কোন নির্দিষ্ট ধর্ম ও বিশ্বাসের অনুশাসন সঠিকরূপে মানিয়া চলিলে যে সত্য উপলব্ধি করা সম্ভব এই জ্ঞান অর্জন করিয়া তিনি সর্বোচ্চ চেতনার জগতে প্রবেশ করিতে কৃতকার্য হইয়াছিলেন। মুক্তিলাভের বিভিন্ন পথ পরিক্রমায় সঞ্চিত জ্ঞানের সুনিয়ন্ত্রিত প্রয়োগ করিয়া তিনি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে বিভিন্ন ধর্মই সমভাবে গ্রহণযোগ্য এবং তিনি তাহাদের দোষত্রুটি অতিক্রম করিয়াছিলেন।

এইরূপে তিনি নিজেকে সকল ভেদবুদ্ধির উর্দ্ধে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন এবং সর্বধর্মে সমন্বয় সাধন করিয়াছিলেন যাহা আমাদের সীমিত জ্ঞানের মাধ্যমে উপলব্ধি করা সম্ভব নহে।

শ্রীরামকৃষ্ণ

(দিনপঞ্জীর পাতা)

আমরা মঙ্গোলিয়ায় মরুভুমির মধ্যে আছি। গতকাল ছিল উত্তপ্ত বালুকাময় দিবস। দূর হইতে বজ্রধ্বনি আসিতেছিল। আমাদের কয়েকজন বন্ধু প্রস্তরময় পবিত্র 'সিরেট ওরো' পর্বতমালা আরোহণ করিতে করিতে শ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছিল। তাঁবুতে ফিরিয়া আসিয়া আমরা দূরে মাত্র একটি বৃহৎ কড়া গাছকে সেই অসীম মরু প্রান্তরে শির উন্নত করিয়া দণ্ডায়মান দেখিলাম। বৃক্ষের আয়তন এবং ইহার কিছু পরিচিত অবয়বরেখা আমাদের তাহার ছায়াতলে আকর্ষণ করিল। বৃক্ষের প্রকৃতি বিচারে আমাদের মনে বিশ্বাস হইল এই দৈত্যসম বৃহৎ বৃক্ষের ছায়ায় নিশ্চয়ই কিছু কৌতুহলোদ্দীপক লতাগুল্ম আছে। কিছুক্ষণের মধ্যেই সমস্ত সহকর্মীবৃন্দ সেই কড়াগাছগুলির বিশাল দুইটি গুঁড়ির চারিদিকে আসিয়া সমবেত হইল। বৃক্ষটির সুগভীর ছায়া পঞ্চাশ ফুট হইতেও অধিক স্থান জুড়িয়া বিস্তৃত ছিল। শক্ত গাছের গুড়িগুলি কিছু অদ্ভুত কাঁটাগাছ ও লতা দ্বারা আবৃত ছিল। সেই বৃক্ষের সমৃদ্ধ পর্ণরাজিসমূহে পাখিরা গান গাহিতেছিল। বৃক্ষের শাখাগুলি যেন তীর্থযাত্রীদের আশ্রয়দান করার জন্যই চতুর্দিকে সুন্দরভাবে প্রসারিত ছিল।

শিকর সমূহের চতুর্দিকে বালুকারাশির উপর অসংখ্য প্রাণীর পদচিহ্ন দেখা যাইতেছিল। নেকড়ে বাঘের পদচিহ্নের পার্শ্বে জেরেন নামক স্থানীয় কৃষ্ণসার মৃগের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খুরের চিহ্নও ছিল। একটি ঘোড়াও এই স্থানের উপর দিয়া গিয়াছিল এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গে ছিল একটি ষাঁড়ের ভারী পদচিহ্ন। সেখানে সকল প্রকার পাখীও ছিল। আপাত-দৃষ্টিতে মনে হয় সকল প্রকার প্রাণীই এই মহাবৃক্ষের প্রশস্ত ছায়ায় আশ্রয় লইয়াছিল। এই এলুম্ কড়াগাছটি বিশেষভাবে ভারতীয় বিশাল বটবৃক্ষের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। এই ধরণের বৃক্ষসমূহ ছিল সমবেত

জনতার মিলন স্থল। বহু পথিকই ঐ স্থানে শারীরিক ও আত্মিক স্বাচ্ছন্দ্য লাভ করিত। এই অতিথি বৎসল বটবৃক্ষের ছায়ায় অনেক ধর্মীয় কাহিনী গানের সুরে পরিবেশিত হইত। আর মঙ্গোলিয়ার এই সুবৃহৎ কড়াগাছ সেই বটবৃক্ষের ছায়ার কথাই স্মরণ করাইয়া দেয়। কড়াগাছের বৃহৎ শাখাগুলি ভারতের অন্যান্য মহৎ কীর্তির কথাও মনে করাইয়া দেয়। ভারতের কথা ভাবিতেও কি আনন্দই না হয়!

ভারতের তেজোদ্দীপ্ত মহাত্মা শ্রীরামকৃষ্ণের কথাও মনে উদয় হয়। এই মহিমাময় নামের আরও কতই না সশ্রদ্ধ-প্রদত্ত বিশেষণ রহিয়াছে। শ্রীভগবান পরমহংস এবং আরও অনেক সুন্দর সুন্দর বিশেষণ আছে যাহার দ্বারা মানুষ তাহার হৃদয়ের প্রগাঢ়তম শ্রদ্ধা ও প্রীতিজ্ঞাপন করিয়াছে। জাতীয় চেতনাবোধ জানে কি করিয়া নামের উপাধি দ্বারা শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করা যায়। এবং শেষ পর্যন্ত জগতের সকল সশ্রদ্ধ উপাধির উপরে আছে যে মহান নাম তাহা হইল রামকৃষ্ণ। এই একটি ব্যক্তিগত নাম পরিবর্তিত হইয়াছে বিশ্বের সর্বজনীন ভাবাদর্শে। কে এই নাম শুনে নাই! ভালবাসা এবং করুণার এই ভাবাদর্শ সত্যসত্যই তাঁহারই উপযুক্ত। যে সকল পাষাণ-হৃদয় কল্যাণ-বিরোধী তাহাদের কথা অবশ্য স্বতন্ত্র!

রামকৃষ্ণের জ্বলন্ত শিক্ষা ও উপদেশ বিভিন্ন দেশে কিভাবে বিস্তার লাভ করিয়াছে তাহা আমরা জানি। লজ্জাজনক ঘৃণা এবং পরস্পর-বিধ্বংসী মনোভাবের উর্দ্ধে বিরাজ করে আনন্দ—ইহা সকলেরই অন্তরতম অভীষ্ট। এই আনন্দ পবিত্র বটবৃক্ষের সুবিশাল শাখাসমূহের ন্যায় নিজেকে সুপ্রসারিত করিয়া অবস্থিত। মানুষের গবেষণার পথে তাঁহার এই সদিচ্ছার বাণী পথপ্রদর্শক আলোকরেখার মত শোভা পাইয়া থাকে। আমরা স্বয়ং প্রত্যক্ষ করিয়াছি এবং বহুবার শুনিয়াছি যে, রামকৃষ্ণের উপদেশপূর্ণ গ্রন্থগুলি প্রকৃত সত্যানুসন্ধিৎসু ব্যক্তিদের নিকট কিরূপ অপ্রত্যাশিতভাবে প্রকাশিত হইয়াছিল। আমরাও অত্যন্ত অদ্ভুত উপায়ে এই বইয়ের সন্ধান পাইয়াছিলাম।

শত সহস্র এমন কি লক্ষ লক্ষ তীর্থযাত্রী সেই চিরস্মরণীয় দিনে আনন্দময় ভগবানের নামকে কেন্দ্র করিয়া সমবেত হইয়াছিল। অন্তরের

অন্তরতম প্রেরণায় সদিচ্ছা-প্রণোদিত হইয়া তাহারা সমবেত হইয়াছিল এবং তাঁহার আনন্দময় স্মৃতি ও আন্তরিক কার্যাবলী তাহাদের নবজীবনের উদ্দীপনা যোগাইয়াছিল। জনসাধারণের ভাষার ইহাই কি সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য প্রকাশ নহে? ইহাই জাতীয় জীবনের বিবেকবুদ্ধি, জনগণের শ্রদ্ধাবুদ্ধি যাহাকে জোর করিয়া আনা যায় না বা জোর করিয়া দাবীও করা যায় না। বিচিত্র আলোক সমূহের মত তাহারা এক হইতে আরেকের মাঝে ছড়াইয়া পড়ে এবং এক অনির্বাণ শিখায় পরিণত হয়। সুতরাং এই জাতীয় শ্রদ্ধাবোধ কখনও ম্লান হয় না—সমসাময়িক জগতের সকল আলোড়নের উপরই ইহার শিখা বিস্তৃত হয়।

বর্তমানে মানুষ অসংখ্য সমস্যায় জর্জরিত। হইতে পারে মানবাত্মা ধর্মের মূল নীতি সম্বন্ধে সন্দিগ্ধ এবং বিভ্রান্ত। ভিত্তি ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে বলিয়া বর্তমানে বিলাপ ধ্বনি প্রায়ই শোনা যায়। কিন্তু যে সকল লক্ষ লক্ষ তীর্থযাত্রী স্বেচ্ছায় সম্মিলিত হইয়াছে তাহাদের দ্বারা কি প্রমাণিত হয় না যে, বর্তমানের এই বিভ্রান্তির উর্দ্ধে বহু হৃদয়েই ধর্মভাব এবং সাধু হইবার প্রয়াস অক্ষুণ্ণ আছে? আমারা আশাবাদী এবং সদিচ্ছা দ্বারা সকল অন্তরায় জয় করিয়া থাকি।

দেখ, অসহ্য গরমের দিনে, দূরত্বকে ভয় না করিয়া তীর্থযাত্রীগণ রামকৃষ্ণ স্মৃতিকে সম্মান দান করিবার জন্য দ্রুত অগ্রসর হইতেছে। ইহা কি একটি অবিস্মরণীয় ঘটনা নহে? কেননা, সরকারী কোন কর্তব্য সম্পাদনের জন্য এত বিভিন্ন শ্রেণীর পথিকেরা একত্র হয় নাই। বিশুদ্ধ আত্মা এবং অকপট প্রচেষ্টা স্বতই তাহাদিগকে রামকৃষ্ণ নামের পবিত্র স্মৃতিক্ষেত্রে চালাইয়া আনিয়াছে। আমাদের যুগে এই পবিত্র ধর্মসম্মেলন একটি অতি মূল্যবান ঘটনা। ইহা বিস্ময়কর যে, কঠিন পরিশ্রম, বহু সংশয় এবং হতাশার মধ্যেও মানবগণ কৃতজ্ঞতা ও শ্রদ্ধাবোধেই আলোকিত হইতে পারে। তাহাদের অন্তরের আহ্বানই তাহাদের সমবেত করে। ধ্বংসের জন্য, কলহের জন্য কিংবা অপমানের জন্য নহে—তাহারা সমবেত হইয়াছে ঈশ্বরের চিন্তায় ঐক্যবদ্ধ হওয়ার প্রেরণায়।

সম্মিলিত মঙ্গল চিন্তার মধ্যে এক মহাশক্তি নিহিত থাকে। মানবতার এইরূপ পবিত্র অভিব্যক্তিকে উপযুক্ত মূল্য দেওয়া উচিত, কারণ ইহাই হইল সকল প্রকার সমবেত সার্থক সৃষ্টির পরিকল্পনার উৎস। সৃষ্টিতে আছে মঙ্গল চিন্তা। মঙ্গলের কখনও ধ্বংস নাই. ইহাতে, আছে অবিশ্রান্ত উন্নয়ন চিন্তা ও সৃষ্টি। যে সকল শাশ্বত ভিত্তি মানবতার মধ্যে প্রতিষ্ঠিত আছে মঙ্গলের অনুশাসনই তাহার সর্বোৎকৃষ্ট উপাদান। আনন্দময় ভগবানের মঙ্গল সৃষ্টির আহ্বান চিরকালই মানবের মহান ধর্ম-বোধের ঐতিহ্যরূপে বর্তমান থাকে।

অন্ধকারাচ্ছন্ন সময়ে আলোক সবিশেষ মূল্যবান। এই আলোক চিরস্থায়ী হউক! মঙ্গল সম্বন্ধে তাঁহার উপদেশাত্মক রূপক কাহিনীতে রামকৃষ্ণ কখনও কাহাকেও ছোট করেন নাই। কেবল শিক্ষা ও কাহিনীতে নহে, নিজের জীবনের কার্যেও তিনি কখনও কিছুই ছোট করিয়া দেখা সহ্য করিতেন না। সকল ধর্মসম্বন্ধে তাঁহার সশ্রদ্ধ মনোভাব স্মরণ-যোগ্য। এই উদার উপলব্ধিতে পাষাণ হৃদয়ও দ্রবীভুত হয়। আনন্দময় ভগবানের উদার দৃষ্টিভঙ্গী সহজ সরল সত্যজ্ঞান মণ্ডিত ছিল। তাঁহার শান্তিদানশক্তি তিনি মুক্তহস্তেই বিতরণ করিতেন। প্রয়োজনীয় কিছুই তিনি গোপন রাখিতেন না। তাঁহার অগণ্য করুণার দানে তিনি তাঁহার শক্তি নিঃশেষ করিয়াছিলেন। তাঁহার অসুস্থতার কারণই ছিল স্বার্থচিন্তা ত্যাগ করিয়া অপরকে শান্তিদানের জন্য নিয়ত অজস্রধারে আধ্যাত্মিক শক্তি বিতরণ করা। আর এই মহৎ দানের মাধ্যমে তিনি আপনার মহত্ব প্রকাশ করিয়াছেন।

পৃথিবীর সর্বস্থানে রামকৃষ্ণের নাম শ্রদ্ধার সহিত স্মরণ করা হয়। প্রকৃত শিষ্যের মূর্ত আদর্শ স্বামী বিবেকানন্দও সর্বত্র শ্রদ্ধাভাজন। রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ এবং তাঁহাদের মহিমাময় শিষ্যবর্গের নাম ভারতের ধর্মসংস্কৃতির ইতিহাসে এক স্মরণীয় অধ্যায় রচনা করিয়াছে। চিন্তায় গভীরতা -যাহা ভারতের বৈশিষ্ট্য—গুরুশিষ্যের মাধ্যমে তাহার সুন্দর অভিব্যক্তি সমস্ত বিশ্বকে মৌলিক আদর্শের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। যুগের পর যুগ .চলিয়া যায়, সভ্যতার পর সভ্যতার পরিবর্তন

হয়, কিন্তু অতিপ্রাচীন কাল হইতেই প্রতিষ্ঠিত ভারতে গুরুশিষ্যের মধ্যে সম্পর্ক একই প্রকার থাকিয়া যায়। লক্ষ লক্ষ যুগ আগের জ্ঞানের কথা ভারতে এখনও লিপিবদ্ধ আছে। আরও বহু বৎসর পূর্বে ইহা মুখে মুখে সংরক্ষিত ছিল। মুখের বচন কর্ণের মাধ্যমে শ্রবণদ্বারা সংরক্ষণের পবিত্র ব্যবস্থা সম্ভবতঃ সংরক্ষিত লিপিবদ্ধ দলিল অপেক্ষাও অধিকতর নিরাপদ। বিশুদ্ধ সংরক্ষণ নির্ভর করে জ্ঞানের সম্যক সমুন্নতির উপর এবং তাহারই ভিতর নিহিত রহিয়াছে অতীতের মূল্যবান ধাতুর প্রযুক্তিবিদ্যা এবং উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ রচনা।

মঙ্গলময় শিক্ষার অবিনশ্বর সমর্থনেই রামকৃষ্ণ ক্ষান্ত ছিলেন না, তিনি আমাদের জন্য বিশেষ করিয়াই যে এই শিক্ষার প্রয়োজন তাহা অবিসংবাদিত ভাবে প্রমাণ করিয়াছেন। প্রকৃত ধর্ম নীতি যখন কদর্য ও সংশয়পূর্ণ যুক্তিদ্বারা প্রায়ই নস্যাৎ করার চেষ্টা করা হয় তখন সমুজ্জ্বল দৃষ্টান্তসহ তাহাকে প্রতিষ্ঠা করার পথ প্রদর্শন বিশেষভাবে মূল্যবান। রামকৃষ্ণ মিশনের প্রকাশিত এই উপদেশাবলীর সংখ্যাতীত সংস্করণের কথা জানিলেই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়। বহু নগরেই প্রতিষ্ঠিত এই মিশনের শাখা সমূহের কথা স্মরণ রাখিলেই চলিবে। এই সংখ্যা অতিরঞ্জিত নহে। এই চিন্তা-উদ্দীপক সমাবেশের মধ্যে স্নায়ু উত্তেজনা বা গভীর ধ্যানমগ্নতার প্রয়োজন নাই। প্রত্যেক বিষয়ই গভীর অনুভূতি সম্ভূত—ভাব-বিহ্বলতা বা ভাবাবেগ নাই—উচ্চ পরিমিতি বোধ হইতেই ইহার উৎপত্তি।

রামকৃষ্ণ যে উদার মঙ্গলভাবনার শিক্ষা দিয়াছেন তাহাতে মানুষের হৃদয়ে শুভ ভাবসমূহেরই জাগরণ হওয়া উচিত। রামকৃষ্ণ সর্বদাই প্রত্যাখ্যান ও ধ্বংসনীতির বিরুদ্ধেই উপদেশ দিয়াছেন। তিনি সর্বতোভাবে মঙ্গলসৌধ নির্মাতা, তাঁহার ভক্তগণের নিজেদের হৃদয়ের গুপ্ত রত্নরাজির প্রকাশ দ্বারা তাঁহার দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করাই উচিত। এইরূপ হিতকর সৃষ্টিই অত্যন্ত সক্রিয়। এবং তাহাই স্বভাবতঃ জীবনপথে সর্বোত্তম কীর্তিরূপে পরিণত হয়। স্মরণীয় রামকৃষ্ণের জন্মোৎসবের দিনের জনসমাগম। অভিযাত্রীগণ পথের ধূলাকে ভয় পায় নাই, ক্লান্তিকর গরম আবহাওয়া

তাহাদের আতঙ্কিত করিতে পারে নাই। মঙ্গলভাবনা এবং মানব হিতকর কর্মচিন্তায় তাহাদের হৃদয় ছিল পূর্ণ। জীবে সেবা—রামকৃষ্ণের এই কার্য সত্যই মহৎ।

গুরুভক্তি!—

"আমার একজন সামান্য হিন্দু বালকের কথা মনে পড়ে। সে গুরু লাভ করিয়াছিল। আমরা তাহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম—'তুমি যদি গুরুর সাহায্য ছাড়া সূর্য দেখ, তবে ইহা কি সম্ভব যে সূর্য তাহার কিরণ তোমার নিকট প্রকাশ করিবে?'

"বালকটি হাসিয়া বলিয়াছিল—'সূর্য সূর্যের মতই থাকিবে, তবে গুরুর সম্মুখে আমার নিকট দ্বাদশ সূর্য প্রকাশিত হইবে।'

"ভারতের জ্ঞানসূর্য প্রকাশিত হইবেই, কারণ, নদীর তীরে উপবিষ্ট বালকটি গুরু চেনে।"

রামকৃষ্ণ এবং তাঁহার তাৎপর্য

বহুদিন পূর্ব হইতেই হিন্দুসাধক সম্বন্ধে আমার মনে গভীর কৌতূহল এবং ঐ বিষয়ে অধ্যয়নের প্রবল স্পৃহা জাগ্রত হইয়াছিল। মানব জাতির আধ্যাত্মিক উন্নতিতে যাঁহারা আগ্রহী তাঁহাদের জন্মলব্ধ ও অভিজ্ঞতা প্রসূত কর্মক্ষমতাকে পরিণত বয়সে সৃজনীমূলক কর্মে নিয়োজিত করিতে হয়। কিন্তু আমি যখন ১৯১১ হইতে ১৯১৪ খৃষ্টাব্দ এই সময়ের কথা স্মরণ করি, যে সময় ভারতীয় বিদ্যা আমার দৈনন্দিন চর্চার বিষয় ছিল, তখন দক্ষিণেশ্বরের সন্তের চিন্তায় আমার মন বিশেষভাবে অভিভূত হয়। তিনি বাস্তবিকই কোন এক চিরন্তন আদর্শের প্রতিভূ। সদয়তা, অপার্থিব শুভেচ্ছা ও সহনশীলতা ভক্তির ভিন্নরূপ এবং প্রকৃত খৃষ্টীয় ধর্মের নামান্তর কিন্তু পাশ্চাত্য জগত হইতে উহা প্রায় অন্তর্হিত হইয়াছে পাশ্চাত্যের বিশেষ ধরনের সত্যানুসন্ধানের ক্রমবর্দ্ধমান আক্রমণে। যুদ্ধোত্তর যুগে আমরা যে অবস্থায় জীবন যাপন করিতেছি সহস্রবৎসর ব্যাপিয়া প্রচলিত ভক্তিতত্ত্বের অনুশীলনে সম্ভবত এই পরিবেশ অনুকূল নহে। আরো যুদ্ধ, রক্তপাত এবং আরো হিংসাত্মক ঘটনা ঘটিবে। আজ হউক অথবা কাল হউক ভারতও একই আক্রমণাত্মক চিন্তা ধারার দ্বারা অভিভূত হইবে। বিশৃঙ্খল পৃথিবীতে এই প্রকৃতির ভালবাসার কেন্দ্রের স্থায়িত্ব ও প্রভাবের অস্তিত্ব একান্ত প্রয়োজন বলিয়া আমি মনে করি। মধ্যযুগের সূচনায় বর্বর জাতি সংঘটিত অভিযানের অনুরূপ অবস্থায় ইউরোপে মঠ সমূহের এক বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করিতে হইবে। রামকৃষ্ণের আদর্শে অনুপ্রাণিত সকল কর্মে আমার ঐকান্তিক কামনা ও শুভেচ্ছা সর্বসময়ে সহগমন করিবে।

রামকৃষ্ণ এবং সেবাব্রত

শুরুতে আমি ফিরিয়া যাইতেছি দুই হাজার বৎসর পূর্বে উপনিষদ যুগে। সেখানে আমরা এমন এক মতবাদের সন্ধান পাই যাহাতে আছে সমগ্র জগদ্ব্যাপী এক বিশ্বাত্মার কথা : তাঁহাকে ব্রহ্ম, নির্বিশেষ বিশ্বপ্রকৃতি, আত্মা, মানবের অধ্যাত্ম প্রকৃতি প্রভৃতি নামে অভিহিত করা হইলেও তিনি এক এবং অদ্বিতীয়। নির্বিশেষ ব্রহ্ম সকল পদার্থে—বৃক্ষ, প্রাণী ও মনুষ্যে—প্রকাশিত। জীবনের চরম লক্ষ্য হইল পূর্ণ জ্ঞানের মাধ্যমে বিশ্বাত্মার মধ্যে ব্যষ্টি আত্মার বিলয় সাধন।

এই মতবাদ সেই যুগ হইতে বর্তমান যুগ পর্যন্ত সকল ভারতীয় ধর্ম ও দর্শনকে প্রভাবিত করিয়াছে। এই 'সর্বেশ্বরবাদ' (উৎকৃষ্টতর সংজ্ঞার অভাবে এই সংজ্ঞা ব্যবহৃত হইল) সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞান না হইলে ভারতীয় ঋষিদের দেওয়া শিক্ষা উপলব্ধি করা যায় না। আমাদের পাশ্চাত্য কবিদের মধ্যে এই শিক্ষার কিছু কিছু পরিচয় পাওয়া যায়। যেমন, ওয়ার্ডসওয়ার্থ বলিয়াছেন,

"এ আমার একান্ত বিশ্বাস
প্রতিটি পুষ্পের প্রতিটি নিশ্বাস
পবনের মাঝে পায় আনন্দ অপার ॥"

আবার জর্জ হার্বার্ট বলিয়াছেন,

"একা তুমি সর্বময় সকল নিলয়
সর্বভূতে তুমি একা অসীম আলয় ॥"

এই ভাবধারার সঙ্গে আমরা ভগবদ্‌গীতার কয়েকটি অংশ তুলনামূলকভাবে বিচার করিয়া দেখিতে পারি। যেমন, গীতায় শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন,

"যে আমাকে সর্বভূতে দেখে সর্বময়
আমাকে দেখে যে সদা সর্বভূতালয়
তাহাকে করি না আমি কভু পরিত্যাগ

আমাকেও নাহি ত্যাজে সেই মহাভাগ—”

রামকৃষ্ণ প্রসংগে ফিরিয়া আসি।

এইবার তাঁহার অপেক্ষাকৃত অল্প পরিসর পঞ্চাশ বৎসরব্যাপী জীবনকালকে মানব জাতির সর্বপ্রকার কঠোর সাধনের এক ক্ষুদ্র সংস্করণ বলা হইয়াছে। চূড়ান্ত অর্থে, তাঁহার এই জীবন সত্যানুসন্ধানে এবং সত্যের উপলব্ধিতে নিয়ত নিরত ছিল বলাই সঙ্গত। সাধারণ দৃষ্টিতে তিনি তাঁহার জীবনের প্রায় প্রথম ১৭ বৎসর সাধারণ এক গ্রাম্য বালকের মত প্রাকৃতিক পরিবেশে মানুষ হইয়াছেন, তাহাতে পুঁথিগত বিদ্যার স্থান খুবই কম ছিল বলা যায়। কিন্তু বাল্যকাল হইতেই তাঁহার প্রাণে অজানাকে জানার এক অস্পষ্ট আকাংখা, এক অনির্বচনীয় আকুতি ছিল।

সতেরো বৎসর বয়সে তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা তাঁহাকে কলিকাতায় লইয়া আসেন এবং তখনই শুরু হয় তাহার জীবনের দ্বিতীয় অধ্যায়। কিছু কাল পর ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দে তিনি সদ্য প্রতিষ্ঠিত জগন্মাতাকালীর মন্দিরে পূজারী নিযুক্ত হন। এবং তখনই তিনি বুঝিতে পারিলেন কাহার জন্য তাঁহার এই আকুলতা। তাঁহার একমাত্র কামনা ঈশ্বর প্রাপ্তি। ইহার পরের বৎসরগুলিতে ঈশ্বর লাভের প্রবল ইচ্ছায় তাঁহার অন্তর্নিহিত সমস্ত আত্মিক শক্তির খেলা চলিতে শুরু করিল। তাঁহাকে এক দিব্য উন্মাদনাময় ভাব আসিয়া আশ্রয় করিল। এই ভাব তাঁহাকে লইয়া যাইত সমাধি রাজ্যে। এই দিব্য আনন্দময় ভাব সমাধিতে তিনি একাদিক্রমে সপ্তাহের পর সপ্তাহ, মাসের পর মাস কাটাইতেন। পরমোন্নত এই সমাধির প্রায়োগিক অর্থ হইল, নির্বিকল্প সমাধি —অর্থাৎ অসীমে অভিনিবেশ। এই চরম অবস্থালাভের পূর্বে প্রয়োজন হয়। (১) নির্দিষ্ট ইষ্ট দেবতার প্রতি ভক্তি, (২) সর্বভূতে ঈশ্বরানুভূতি, (৩) সবিকল্প সমাধি—এই সমাধিতে বাহ্য জগদ্জ্ঞান বিলুপ্ত হইলেও সাধকের চিন্ময় আনন্দে স্থিতি হয়। অবশেষে আসে শেষ স্তর। এখানে সকল জ্ঞান বিলুপ্ত হয়, থাকে শুধু নির্বাণ (সমাহিত ভাব)। এই অবস্থা মৃত্যুরই অনুরূপ, একমাত্র অতিমানবই এই অবস্থা হইতে নামরূপের রাজ্যে ফিরিয়া আসিতে পারেন।

এই কঠোর অধ্যাত্ম সাধানময় জীবনের পর রামকৃষ্ণ তাঁহার জীবনের তৃতীয় অধ্যায়ে আসিয়া পড়িলেন। ঈশ্বর বা পরমাত্মার সান্নিধ্য লাভ তাঁহার হইয়াছে। এই অবস্থার নাম যাহাই দেওয়া হউক না কেন তাহাতে কিছু যায় আসে না। এখন তিনি তাঁহার নবলব্ধ জ্ঞান মানব সমাজে বিতরণের জন্য প্রস্তুত। এই প্রসংগে আমরা আলোচনা করিব আমাদের মূল বিষয় সেবাব্রতের কথা। ইহা অতি কৌতূহল উদ্দীপক যে সেবা (serve) এই শব্দটি রক্ষা করা (save) ধাতু হইতে নিষ্পন্ন। সংস্কৃত ভাষায়ও হৃ এবং হৃতি গ্রহণ ও ধারণ অর্থে ব্যবহৃত হয়। যাহাকে রক্ষা করিতে চাই তাহাকেই আমরা সেবা করিয়া থাকি। আমাদের লক্ষ্য হওয়া উচিত জীবের রক্ষার দ্বারা শিবের সেবা করা। কিন্তু এই সেবা ধর্মে মুরুব্বিয়ানার ভাব থাকিলে চলিবে না। যিনি সেবা করিবেন বা যিনি রক্ষার কারণ হইবেন তাঁহার মনে গর্বের ভাব থাকিবে না। রক্ষা শব্দের অর্থই সংযোগ! এই সংযোগ (জলমগ্ন ব্যক্তিকে উদ্ধারের ন্যায়) শারীরিক সংযোগ অথবা আত্মিক সংযোগও হইতে পারে। হৃতি অর্থাৎ ধারণের সঙ্গে ইহার যথেষ্ট ভাবগত সাদৃশ্য আছে।

রামকৃষ্ণের এই আধ্যাত্মিক সংযোগ সাধনের ক্ষমতা ছিল। তাঁহাকে যাঁহারা জানিতেন তাঁহারা সকলেই স্বীকার করেন যে, তাঁহার অপরের মনোভাব বুঝিবার ক্ষমতা ও বোধশক্তি ছিল অদ্ভুত। তিনি কাহারও উপর তাঁহার ইচ্ছাশক্তিকে কখনও জোর করিয়া চাপাইয়া দেন নাই। তিনি সকলকে জানাইয়া দিতেন, তাহাদের অন্তরস্থ আত্মশক্তিকে জানিবার ক্ষমতা তাহাদের অন্তরেই নিহিত আছে। জীবনের শেষ পর্যায়ে যখন তাঁহার শিষ্য জুটিয়াছিল, তখনও তিনি ভক্তদের মধ্যে কোন দুই ব্যক্তিকে কখনও ঠিক একই পদ্ধতি শিক্ষা দিতেন না। তিনি অন্ততঃ পাশ্চাত্য পদ্ধতির নির্ধারিত বিধির দাসত্ব কখনও করেন নাই। তাঁহার অহংজ্ঞানের পরিপূর্ণ অভাব এবং পুঁথিগত বিদ্যার অভাবের জন্যই সম্ভবতঃ ঈশ্বরের পক্ষে তাঁহার মাধ্যমে কাজ করা সম্ভব হইয়াছিল। আত্ম-অভিনিবিষ্ট ভাব তাঁহার হৃদয়-বাঁশীর কোন ঘাটের গতিরুদ্ধ করে নাই। সুতরাং ঈশ্বর তাঁহার মাধ্যমে কাজ করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। এবং অবশ্যই ইহা

অলস কল্পনা নিশ্চয় নহে যে, যে কোন ব্যক্তি তাঁহার সংস্পর্শে আসিয়াছে তাহাকে তিনি তাহারই ভাবে গ্রহণ করিতে পারিয়াছেন। তিনি উপলব্ধি করিয়াছিলেন, বিভিন্ন মত ও বিভিন্ন পথ বিভিন্ন প্রকৃতি ও বিভিন্ন প্রবৃত্তির উপযোগী ; নিষ্ঠা সহকারে অনুসরণ করিলে সকল মত ও সকল পথেই ঈশ্বর প্রাপ্তি হইতে পারে। তাঁহার এই অনন্য সাধারণ উদারতার জন্য কেবল হিন্দু সম্প্রদায় নহে, মুসলমান ও খৃষ্টান সম্প্রদায়ের প্রতিও তাঁহার সহানুভূতি ছিল। তিনি এমন কথাও বলিয়াছেন যে, নানামত নানাপথ মঙ্গলের জন্যই হইয়াছে—ইহার ফলে এই বিশাল পটভূমিকায় প্রত্যেক ব্যক্তিই তাঁহার বিশ্বাস-অনুরূপ পথ ও মত গ্রহণের সুবিধা পাইয়াছে।

রামকৃষ্ণের ব্যষ্টিশিক্ষা পদ্ধতি ও শিক্ষাদানের যোগ্যতা ছিল তর্কের অতীত। তিনি কখনও আশা করেন নাই মানুষ সঙ্গে সঙ্গে পূর্ণতা লাভ করিবে। সুতরাং মানুষের দুর্বলতা দেখিলে তিনি কখনও হতাশ হইতেন না। সকল প্রাণীর মধ্যে ঈশ্বর দর্শনে স্তরে স্তরে কিভাবে জীবের জ্ঞানের বিকাশ হয় সেই উপদেশ ও নির্দেশ দানেই ছিল তাঁহার উৎসাহ। "সা রে গা মা" শিক্ষার পূর্বে রাগরাগিণী বাজাইতে কখনও কোন শিষ্যকে তিনি বলেন নাই। আর আমি মানসিক বা নৈতিক সমুন্নতির কথা বিবেচনা করিয়া দৈনন্দিন জীবন হইতে উপমা টানিয়া অত্যন্ত শ্রদ্ধার সহিত তাঁহাকে একজন বাসের কনডাকটরের সঙ্গে তুলনা করিতে চাহি। যাত্রীগণ জিজ্ঞাসা করিলে কনডাকটর কোথায় তাহাদের নামিতে হইবে তাহাই কেবল বলিয়া দিবে। কাহাকেও সে জোর করিয়া নামাইয়া দিবে না, তবে তাহাদের গাড়ীতে উঠিবার ও নামিবার সুযোগ দানের জন্য স্থানে স্থানে সে গাড়ী থামাইবে। অবশ্য ইচ্ছা করিলে অথবা যাত্রার সকল ক্লেশ সহ্য করিতে পারিলে তাহারই তত্ত্বাবধানে যাত্রার শেষ গন্তব্যস্থান পর্যন্ত যাওয়ার স্বাধীনতা তাহাদের থাকিবে। প্রকৃত সেবার অর্থ বিচারহীন অন্ধ ভক্তি নহে, ভক্তি বিচার দ্বারা অবশ্যই পণ্ডিত হওয়া প্রয়োজন। তাঁহার প্রধান শিষ্যের "বিবেকানন্দ" নামকরণ এই বিবেচনার ভিত্তিতেই হইয়াছে।

তাঁহার সেবাধর্মের দুই একটি উদাহরণ দিতেছি। একবার একটি যুবতী রমণী তাঁহার কাছে আসিয়া দুঃখে স্বীকারোক্তি করে যে, প্রার্থনার সময় সে মন একাগ্র করিতে পারে না। রামকৃষ্ণ তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "জগতে সবচেয়ে কি তুমি ভালবাস?" উত্তরে সে জানায় যে সে তাহার ভ্রাতুষ্পুত্রকে সবার চাইতে বেশী ভালবাসে। তিনি বলিলেন, "আচ্ছা বেশ, তাহা হইলে তুমি তোমার চিন্তাধারা তাহার উপরই নিবদ্ধ কর।" সে তাহাই করিল এবং ভ্রাতুষ্পুত্রের প্রতি অনুরাগের মাধ্যমে ঈশ্বর আরাধনা করিতে লাগিল। আর একবার রামকৃষ্ণ তাঁহার ধনী পৃষ্ঠপোষক মথুরবাবুর সঙ্গে ভ্রমণ যাত্রায় বাহির হইয়াছিলেন। ঘটনাক্রমে তাঁহারা একটি দুর্ভিক্ষপীড়িত স্থানের মধ্য দিয়া যাইতেছিলেন। কয়েকটি দুর্ভিক্ষপীড়িত ক্ষুধার্ত প্রাণী রাস্তার পার্শ্বে বসিয়াছিল। মথুরবাবুকে রামকৃষ্ণ জিজ্ঞাসা করিলেন, "ইহাদের তুমি খাইতে দেবে তো?" যখন প্রতিবাদ করিয়া মথুরবাবু বলিলেন যে, সকল জগৎকে খাইতে দেওয়ার মত সম্পদ তাহার নাই তখন সেই সন্ন্যাসী সেইখানে বসিয়া কাঁদিতে লাগিলেন এবং প্রতিজ্ঞা করিলেন তিনি সেইখানে থাকিয়া তাহাদের দুর্ভাগ্যের ভাগীদার হইবেন। কাজেই মথুরবাবুকে হার মানিতে হইল। শোনা যায়, এই মহাত্মার সর্বত্র ঈশ্বর দৃষ্টি এত উচ্চস্তরে উঠিয়াছিল যে, মৃত্তিকার আঘাত লাগিবে এই ভয়ে মৃত্তিকাকে পদদলিত করিয়া চলাও তিনি সহ্য করিতে পারিতেন না।

গরীব ও নিঃস্বদিগকে পার্থিব সাহায্য সকল সময় প্রদান করা তাঁহার পক্ষে সম্ভব হইত না। তিনি কিন্তু আধ্যাত্মিক সম্পদ তাহাদের প্রচুর পরিমাণেই দিতেন। তাঁহার শিষ্যগণ সম্পূর্ণ আত্মত্যাগের নিদর্শন পরিপূর্ণভাবে তাঁহার নিকট হইতেই পাইয়াছিলেন। প্রকৃতপক্ষে, তিনি সমাগত ধর্মপিপাসুদের ধর্মপ্রেরণাদানে অস্বীকার না করিয়া স্বেচ্ছায় স্বীয় জীবনকাল হ্রস্ব করিয়াছিলেন। একথা সুবিদিত যে, তিনি গলরোগে আক্রান্ত হন এবং তাহাই অবশেষে কর্কট রোগে পরিণত হওয়ায় তিনি মৃত্যুবরণ করেন। তিনি যদি কথা বন্ধ এবং আত্মিক শক্তির অপচয় বন্ধ রাখিতে রাজী হইতেন তাহা হইলে হয়ত তিনি রোগমুক্ত হইতে

পারিতেন। তাঁহারই প্রেরণায় তাঁহার শিষ্যগণ মহান বিবেকানন্দের নেতৃত্বে জগতে মানবজাতিকে পার্থিব এবং আধ্যাত্মিক দিক হইতে সেবা করিবার জন্য বাহির হইয়াছিলেন। পাশ্চাত্ত্যে আমরা ঈশ্বর ও মানবের যে দ্বিবিধ সেবার কথা বলিয়া থাকি তিনি তাহারই জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন। কিন্তু বেদান্তবাদীগণের মতে, এই দ্বিবিধ সেবা প্রকৃতপক্ষে একই,—যিনি সর্বভূতে বিরাজমান সেই ঈশ্বরের সেবা। আর একবার আমি আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে চাই কয়েকটি কথার প্রতি। অবশ্য ইহাও আমি জানি যে, কথা প্রতীক মাত্র সুতরাং তাহার দ্বারা আমাদের সত্যদৃষ্টি অস্পষ্ট হওয়া কখনই উচিত নহে। রামকৃষ্ণকে মহাভক্ত বা ভক্তিতত্ত্বের ব্যাখ্যাকারক বলা হয় যাহাকে সাধারণভাবে বলা হয় ঈশ্বরভক্তি। ভক্তি কথাটি ভজ ধাতুদ্বারা নিষ্পন্ন। ভজ ধাতুর অর্থ হইল ভাগ গ্রহণ করা বা ভাগাভাগি করা। ইহার দ্বারা ভগবান ও মানবের মধ্যে একটা চুক্তি সূচিত হয়—যাহার ফলে একে অপরের সহযোগী হয় পারস্পরিক মঙ্গলের জন্য। অংশ লওয়া—এই অর্থে ভক্তিকে হরতি অর্থাৎ গ্রহণের মাধ্যমে সেবার সঙ্গে যুক্ত করিতে পারি। যেহেতু সেবাই সংরক্ষণ এবং যেহেতু আত্মা ও প্রেরণা উভয়ের মধ্যে শ্বাসগ্রহণ ও বিস্তারের ভাব আছে অতএব রামকৃষ্ণের সেবাধর্মের মধ্যে আমরা মুক্তিলাভের অনুপ্রেরণা পাই।

আমাদের সকলের পক্ষে রামকৃষ্ণের মত হওয়া সম্ভব নহে। তিনি ছিলেন আলোকস্তম্ভস্বরূপ যাহা বিশাল জাহাজ সমূহকে সঠিক আলোক সংকেত দেখায়। কিন্তু আমরা আমাদের অন্তরে অন্ততঃ একটি দিয়াশলাই উৎপন্ন করিতে পারি যাহা মুহূর্তের জন্য অন্ধকারে আলোক প্রদর্শন করে। আর কিছুই যখন কখনও হারাইয়া যায় না তখন স্তিমিত-আলোকবিকীরণকারী দিয়াশলাই-এর আলো অনন্তের বুকে অবশ্যই উজ্জ্বল হইয়া থাকিবে।

রামকৃষ্ণের যুগ্ম বার্তা

এই ধরনের উপলক্ষে বক্তব্য রাখিতে হইলে এতাদৃশ উৎসবে* যোগদান করার সুযোগ লাভের বিষয় লইয়াই বক্তব্য শুরু করা চিরাচরিত প্রথা। আমিও এই রীতি অনুসরণ করিয়াই আমার বক্তব্য পেশ করিব, কেননা ইহা প্রকৃতই একটি সুযোগ। ইহাকে কেন সুযোগ বলিয়াছি তাহার কারণও আমি সঙ্গে সঙ্গে দেখাইতেছি। উৎসবে যোগদানের বিশেষ সুযোগলাভবোধ নির্ভর করে উৎসবের প্রকৃতি, প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্বের উপর। আমি যদি ব্রডওয়েতে পথচারীদের জন্য বাঁধানো রাস্তার প্রথম ভিত্তি স্থাপনের উৎসবে যোগদানের নিমন্ত্রণ পাইতাম তাহা হইলে তাহাকে হয়ত একটা বিশেষ সুযোগ বলিয়া মনে করিতাম কেননা এই জাতীয় পদচারীদের চলার পথ বহু সুযোগ-সুবিধা সম্বলিত।

কিন্তু জীবনের গভীরতম প্রয়োজনের দৃষ্টিভঙ্গীতে সড়কের ধারে বাঁধানো পায়ে চলা রাস্তার ব্যাপারে কাহারও পক্ষে আনন্দে উচ্ছ্বসিত হইয়া পড়ার কথা নয়। আমি জানিনা চতুর্থ এবং পঞ্চম শতাব্দীতে এথেনসের প্রধান প্রধান সড়কগুলির ধারে পায়ে চলা মানুষদিগের জন্য বাঁধানো রাস্তা ছিল কিনা, কিন্তু এইকথা আমি জানি যে, সেই সময়ে এথেনসে, পেরিক্লিস্, সক্রেটিস, প্লেটো এবং এরিস্টটল্ অনেক মূল্যবান কথা বলিয়াছেন এবং লিখিয়াছেন; আর সেই সকল চিন্তাধারা আজও অবধি মানব জাতির উপর প্রভাব বিস্তার করিয়া আছে। অতএব আমি যদি প্লেটোর আকাদমী অথবা এরিস্টটলের লাইসিঅ্যাম (মহাবিদ্যালয়) স্থাপন উপলক্ষে কোন উৎসবে যোগদান করিবার আমন্ত্রণ পাইতাম তাহা হইলে তাহাকে একটা বিশেষ সুযোগ মনে করিতাম।

অনুরূপভাবে মহান হিন্দু ঋষি ও মহাপুরুষ রামকৃষ্ণের জীবনী ও শিক্ষার স্মৃতিচারণ অনুষ্ঠানে যোগদান করাকে আমি একটা বিশেষ সুযোগই মনে করি। মানবজীবনে মানবাত্মার পুষ্টি দর্শন এবং ধর্মদ্বারা

* ১৯৩৬ সালে নিউইয়র্কে রামকৃষ্ণ জন্মশতবার্ষিকী অনুষ্ঠান—

যে পরিমাণে সাধিত হয় অন্য কোন শিক্ষাদ্বারা সেই পরিমাণ হয় না। এই রামকৃষ্ণ দর্শন ও ধর্মের সর্বোচ্চ শিখরে আরোহণ করিয়াছিলেন। এই মহামানবের অবদান সম্বন্ধে বিশদভাবে বর্ণনা করিবার কর্তব্য আমার নহে, কেননা তাঁহার শিষ্যবৃন্দ, যাঁহারা তাঁহারই ঐতিহ্যের ধারক ও বাহক ও যাঁহারা যোগ্য, তাঁহারা এইস্থানেই উপস্থিত আছেন।

এই মহাত্মার উপদেশ হইতে আমার মতে যে দুইটি উল্লেখযোগ্য মহৎ শিক্ষা পৃথিবীর এই প্রান্তস্থিত মানুষদিগকে আকর্ষণ করে আমি মাত্র তাহারই উল্লেখ করিতে চাই।

তাহাদের একটি হইল নিবৃত্তিমূলক যাহা খুবই গুরুত্বপূর্ণ, এবং অপরটি হইল প্রবৃত্তিমূলক—তাহাও অনুরূপভাবে গুরুত্বপূর্ণ। সর্বগ্রাসী ইন্দ্রিয়ের দাবী ও জৈব ক্ষুধার বিরুদ্ধে সেই হিন্দু মহাত্মার প্রতিবাদই হইল নিবৃত্তিমূলক শিক্ষা। এই উক্তিটি পুনরাবৃত্তি করিয়া আবারও বলিতেছি যে, এই নিবৃত্তি হইল সর্বগ্রাসী ইন্দ্রিয়ের দাবী ও জৈব ক্ষুধার বিরুদ্ধে একনিষ্ঠ যথার্থ প্রতিবাদ। পাশ্চাত্য সভ্যতা এখন সকল সমস্যার উপর একটি সমস্যা লইয়াই জর্জরিত—তাহা হইল মানব-সমাজের ক্রমবর্ধমান অভাব কিভাবে পূরণ করা যায়। কেমন করিয়া জীবনযাত্রার উপযোগী দ্রব্যাদি উৎপন্ন করা হইবে এবং কেমন করিয়াই বা তাহা বণ্টন করা হইবে সেই সমস্যা লইয়াই বর্তমানে আমাদের সকল চিন্তা কেন্দ্রীভূত। এই দ্রব্যাদির কিয়দংশকে আমরা বলি অপরিহার্য উপকরণ, কতকগুলিকে বলি স্বাচ্ছন্দ্য বিধায়ক এবং আরও কতকগুলিকে বিলাসোপকরণ।

এই মহান হিন্দু ভবিষ্যৎদ্রষ্টা এই সকলই নস্যাৎ করিয়া ইহাদের সকলের উপরে স্থান দিয়াছিলেন আত্মার দাবীকে। উহাই হইল তাঁহার নিবৃত্তিমূলক শিক্ষা। মানবজাতির ইতিহাসে এই শিক্ষা একেবারে যে নূতন তাহা বলা যায় না, তবে যাহা উল্লেখযোগ্য তাহা হইল আমাদের সমসাময়িক ব্যক্তিদের মধ্যে একজন তাঁহার জীবনে এমন একটি উৎকৃষ্ট পন্থা দেখাইয়াছেন যাহার দ্বারা মানব চিরকাল শারীরিক সুখ-সুবিধার উপকরণ না খুঁজিয়াও জীবনে প্রকৃত আনন্দ ও পরম শান্তি লাভ করিতে পারে।

পার্থিব পদার্থ তুচ্ছ করিয়া এত আনন্দলাভ করা তাঁহার মত মহাত্মার পক্ষেই অবশ্য সম্ভব। আমরা তাঁহার নিকট হইতে অন্ততঃ এইটুকু শিক্ষা লাভ করিতে পারি—কত বেশী তাহা নয়, কত কম তাহাই বলিতেছি—যে, জীবনে সামান্য সুখের সন্ধানে আমরা পার্থিব উপকরণ যতখানি চাহি ততখানি না হইলেও চলে। জীবনে সুখদান অথবা সুখলাভের জন্য বিশেষ পার্থিব উপকরণের প্রয়োজন হয় না। দুঃখের বিষয়, আমাদের মধ্যে এমন অনেকেই আছেন যাঁহারা মনে করেন যে, পার্থিব প্রায় সকল জিনিস না পাইলে জীবনে কিছুই পাওয়া হইল না।

আমি বলি আমরা অন্ততঃ এইটুকু শিক্ষা গ্রহণ করিতে পারি যে, জগতের বহু জিনিস আমাদের নিজেদের বলিয়া না পাইলেও জীবনে কিছু ভাল আমরা লাভ করিতে পারি।

এই শিক্ষার ব্যঞ্জনা কিন্তু ইহা অপেক্ষা আরও গভীর। আমরা যদি আমাদের ভিতরের ভুল বুঝাবুঝি এবং পরস্পর বিরোধিতার কথা চিন্তা করি তাহা হইলে সকলেই অনুভব করিতে পারিব যে এই প্রতিদ্বন্দ্বিতা বিষয়-আশয় লইয়া।

বর্তমানে আমাদের এই শহরে একটি ধর্মঘট চলিতেছে। ইহার মূলে কি আছে আর তাহার বিষয়বস্তুই বা কি? ইহার বিষয়বস্তু হইল স্বার্থের সংঘাত। অসন্তোষের মূলে আছে বিষয় ও সম্পত্তি লইয়া বিভাজন।—আর ধর্মঘটের ভিতর যে দ্বন্দ্ব তাহারও মূলে আছে মূলধন এবং শ্রমের বিপরীতমুখী স্বার্থের সংঘর্ষ।

এইভাবে আন্তর্জাতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতার ক্ষেত্রেও দেখা যায় স্থূল বস্তুর বাজারের উপর কে কতখানি প্রভাব বিস্তার করিতে পারে সেই বিষয় লইয়াই বিবাদ। মানব সমাজের চাঞ্চল্য, অতৃপ্তি ও যুদ্ধ-বিগ্রহের মূলে রহিয়াছে বাহ্যিক জগতের সিদ্ধি ও সমৃদ্ধির অগ্রাধিকার লাভ।

রামকৃষ্ণের উপদেশ হইতে আমরা যে দ্বিতীয় মহাশিক্ষা পাইতে পারি তাহা হইল বিশ্বজগতে অন্তর্নিহিত আত্মার ঐক্যসম্পর্কে তাহার দৃঢ় বিশ্বাস। এই দৃঢ় বিশ্বাসের সঙ্গে বিষয় নিবৃত্তি সম্পর্কযুক্ত। আমরা

যদি বস্তুগত দ্বন্দ্বের ঊর্ধ্বে উঠার শিক্ষা লাভ করিতে পারি তাহা হইলে পরস্পরের মধ্যে চিরমিলনের সেতু ছাড়া আর কিছুই দেখিতে পাইব না।

আপনারা এখন নিশ্চয়ই বুঝিতে পারিয়াছেন নিবৃত্তি ও প্রবৃত্তির কি সম্পর্ক, বাহ্য জাগতিক পদার্থের দ্বন্দ্বের মধ্যে যতকাল আমরা থাকিব ততকাল বিশ্বের একাত্মতা সম্ভব হইবে না।

ঐক্য সম্বন্ধে বহু ধারণা, বহুভাব এবং নীতি আছে। কিন্তু সকলের মূলে যে একতা আছে তাহা হইল চারিত্রিক মুক্তি। এই একতা হইল বহুমুখী-বিরোধী, বহু ভাববর্জিত অদ্বিতীয়ত্ব। এইরূপ একতা গড়িয়া উঠে সংখ্যাসূচক ধারণার মত।

ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যনীতিতে গড়িয়া উঠা একপ্রকার একতার কথা পণ্ডিত লেখকেরা বলিয়া থাকেন। আপন স্বাতন্ত্র্য দ্বারাই প্রত্যেক ব্যষ্টি বস্তু পৃথক, দেশ ও কালে তাহারা তাহাদের পৃথক অস্তিত্বে বর্তমান। যেখানে একটি পদার্থ আছে সেখানে সেইসময় অন্য পদার্থ থাকিতে পারে না, তাহার স্বতঃ উত্থিত প্রভাবদ্বারাই সে প্রভাবান্বিত। সুতরাং সেই পদার্থ স্বতন্ত্র সত্তারূপেই থাকিতে বাধ্য।

সাদৃশ্যমূলক আর একপ্রকার একতাও আছে। একই ছাঁচে গঠিত প্লাষ্টিক নির্মিত পদার্থের ন্যায় এই সাদৃশ্য। ইহাও একপ্রকার ঐক্য। যখন বাস্তব ছাঁচের বদলে শক্তিমান কোন মানুষের ইচ্ছাশক্তির প্রভাবে জনগণ একমত, একপথ এবং একই অভ্যাসের বশবর্তী হয় তখনও মানবের মধ্যে একপ্রকার সাদৃশ্য দেখা যায় যাহাকে আমরা বিকৃত ঐক্য বলিয়া অভিহিত করি। ইহার ফলে মানবিক আচরণে যে ভাবের উদ্ভব হয় তাহাকে বলা যায় সংহতি। অনেকেই সংহতির কথা বলেন, কিন্তু সংহতি বস্তুটি কি? ইহার স্বরূপ হইল দোষগুণ বিচার না করিয়া যৌথভাবে কোন মানব দলের বা কোন কার্যের কিংবা ব্যক্তিবিশেষের বিরোধিতা করা।

এই সকল মিথ্যা একতা। ইহা ছাড়াও আর একপ্রকার একতা দেখা যায় যাহা ইহাদের চেয়ে উচ্চতর হইলেও উচ্চতম নয়—ইহা শিল্পী-সুলভ ঐক্যবোধ।—সৃষ্টিধর্মী কবি, চিত্রকর বা ভাস্কর এক পদার্থ,

এক সুর, এক বর্ণ, একরূপ সৃষ্টি করে—বিভিন্ন বস্তুর সুখময় সামঞ্জস্য বিধানের মাধ্যমে। ইহাকেই প্রকৃত শিল্পের সৃজনীশক্তি বলা হয়। এই ঐক্য চারিত্রিক দিক হইতে শিল্পী সুলভ।

আমার মনে হয় কীট্‌স্‌ এইজন্যই বলিয়াছেন, সৌন্দর্যের বস্তু চিরকালই আনন্দ-দায়ক, কারণ সৌন্দর্যের এইরূপ প্রকাশে বস্তুর পৃথক সত্তা থাকিলেও ব্যষ্টি এক সুখময় পরিবেশে সমষ্টির সঙ্গে মিশিয়া যায়।

আর, সকল প্রকার সূক্ষ্ম ঐক্যবোধকে বিধৃত করিয়াছে যে সর্বশ্রেষ্ঠ ঐক্যবোধ তাহারই নাম আত্মিক ঐক্যবোধ। যে মহান হিন্দুধর্ম প্রবক্তার জীবন এবং স্মৃতিচারণ উৎসব পালনের জন্য আমরা এখানে সমবেত হইয়াছি তাঁহারই সর্বশ্রেষ্ঠ অবদান হইল এই ঐক্যবোধ। এই একতা হইল সর্বজনীন ও চিরন্তন। ইহা সেই একতা যাহা সকল পদার্থ ও আত্মায় সূক্ষ্মরূপে ব্যাপ্ত এবং পৃথিবী ঊর্ধ্বে স্বর্গ, পৃথিবী এবং পৃথিবীর নিম্নে জলকে এক সূত্রে গ্রথিত করিয়া রাখিয়াছে।

এমারসনের সঙ্গে আমরাও বলি "ঐ-তো সে! বড় ও ছোট কিছু নেই। ঐ ঐক্য-চিন্তায়ই সকল সৃষ্টি; সে যেখানে সকলেই সেখানে, এবং সবখানেই সে আসে।"

ঈশাইয়া এই ঐক্যকে আনন্দপূর্ণ ভাষায় এইরূপে প্রকাশ করিয়াছেন—"যদিও বলা হয় 'আমি সমুন্নত পবিত্র স্থানে থাকি তবুও একথা ঠিক আমি নীচতম এবং অনুতপ্ত ব্যক্তির নিকটও অবস্থান করি; আর অনুতাপদগ্ধ হৃদয় পাপমুক্ত এবং তার আত্মাকে সামগ্রিকভাবে উদ্ধার করার জন্যই তার কাছে আমি থাকি'।" অর্থাৎ ভালবাসার ঐক্যবন্ধনে উচ্চনীচ সকলের একাত্মভাব সম্পাদন। কোথায় সেই দুইটি নীতি যাহা রামকৃষ্ণ একটি বাণীর মাধ্যমে যুক্ত করিতে পারেন? একদিকে এক মহা নিবৃত্তি যাহাতে প্রয়োজনীয় দ্রব্যের অপরিহার্য দাবী এবং পার্থিব পদার্থ হইতে নিবৃত্ত হওয়ার নির্দেশ রহিয়াছে আর অন্যদিকে ঐক্যের দৃঢ় উক্তি—আত্মিক ঐক্য। আমার জিজ্ঞাসা—কোথায় একটি মাত্র উক্তির মাধ্যমে এই দুইটি নীতিই উচ্চারিত হইয়াছে? ইহার

উত্তর হইল—"ইহা আমাদের ধর্মগ্রন্থে আছে—প্রভু যেখানে স্মরণ করাইয়া দিয়াছেন যে, মানুষ কেবলমাত্র আহার গ্রহণ করিয়া জীবন ধারণ করে না, ঈশ্বরের মুখ-নিঃসৃত বাণীরও রহিয়াছে প্রয়োজন।" এইখানে এক কথায় নিবৃত্তি ও প্রবৃত্তির কথাই আমরা পাই।

এই প্রসংগে আমি আরও বলিতে চাহি যে, এই প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি-মূলক দুইটি নীতি শিক্ষা কেবলমাত্র হিন্দুদিগের এবং আমাদের শাস্ত্রেই সীমিত নহে। যে সকল ঋষি এবং মানব সর্বজনীন দৃষ্টি এবং অন্তর্দৃষ্টি লাভ করিয়াছেন তাঁহারাও এই দুইটি নীতি শিক্ষা দিয়াছেন। আমরা দেখি রামকৃষ্ণ তাঁহার জীবনে এই আদর্শগুলিকে চূড়ান্তরূপে সন্নিবিষ্ট করিয়াছিলেন এবং দেখাইয়াছেন কিরূপে পূর্ণ প্রত্যয়ের সঙ্গে আত্মিক সমস্যার সম্মুখীন হইতে হয়।

রামকৃষ্ণ

রামকৃষ্ণের (১৮৩৪* —১৮৮৬) প্রকৃত নাম ছিল গদাধর চ্যাটার্জী। তিনি ছিলেন বাংলা দেশের এক গরীব ব্রাহ্মণ ঘরের সন্তান। বাল্যকালেই তিনি মোহাবিষ্ট অবস্থা অনুভব করেন। কুড়ি বৎসর বয়সে তিনি কলিকাতার নিকটে মহাদেবী কালীর একটি মন্দিরে পূজারী নিযুক্ত হন। দশ বৎসর তিনি ঐ কাজ করেন। তাহার পর শুরু হয় তাঁহার পরিব্রাজক সন্ন্যাসী জীবন যাপন।

ব্রাহ্মণ বংশীয় একজন কুমারী তপস্বিনী এবং একজন বর্ষীয়ান যোগী তাঁহাকে প্রভুত প্রভাবিত করেন। যোগী তাঁহাকে বেদান্তধর্মে দীক্ষিত করেন। যে কৃষ্ণ দর্শনের জন্য তাঁহার ছিল প্রচণ্ড ব্যাকুলতা, ধ্যানে সেই কৃষ্ণের সঙ্গে মিলনের অনুভূতি তাঁহার হয়। পরবর্তীকালে তিনি ভক্তিধর্ম চর্চা করেন এবং পরিচিত হন ইসলাম ও খৃষ্টধর্মের সঙ্গেও। সেই সময় হইতে তিনি যীশু, কৃষ্ণ এবং বুদ্ধকে অবতাররূপে দেখেন। মোহাবিষ্ট অবস্থায় তাঁহার ঈশ্বরের সঙ্গেও মিলন হয়।

দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও দয়ানন্দ সরস্বতীর সঙ্গে তাঁহার পরিচয় থাকিলেও তাঁহাদের সঙ্গে তাঁহার নিবিড় কোন সম্পর্ক স্থাপিত হয় নাই। অপরপক্ষে কেশবচন্দ্র সেনের প্রতি তাঁহার ছিল প্রগাঢ় শ্রদ্ধা এবং অনুরূপ গভীর শ্রদ্ধা কেশবচন্দ্রেরও তাঁহার প্রতি ছিল। সংস্কৃতে অনভিজ্ঞতা এবং প্রায় নিরক্ষরতা সত্ত্বেও কেশবচন্দ্র তাঁহার মহত্ত্বের স্বীকৃতি দিয়াছিলেন এবং তাঁহার প্রচেষ্টায় তাঁহার বিশাল অনুগামী ভক্তবৃন্দ রামকৃষ্ণেরও প্রতি আকৃষ্ট হন। ইহার পূর্বে রামকৃষ্ণের পরিচয় খুব অল্প লোকই জানিত। এই দুই মহান ব্যক্তিত্ব পরস্পর হইতে একান্ত পৃথক হইলেও তাঁহাদের পরস্পরের মধ্যে আদানপ্রদান ছিল প্রচুর। রামকৃষ্ণ ব্রাহ্মসমাজের কর্মধারার প্রতি সহানুভূতিশীল ছিলেন।

মৃত্যুশয্যায় কেশবকে শেষ দর্শন করিতে যাঁহারা আসিয়াছিলেন

* ১৮৩৬ —সম্পাদক।

রামকৃষ্ণ ছিলেন তাঁহাদের মধ্যে অন্যতম। রামকৃষ্ণের শিশুসুলভ বিনয় আসিসির ফ্রান্সিসের সঙ্গে তুলনীয়। জাত্যাভিমান বন্ধনের শেষ তন্তু ছিন্ন করার জন্য যে কোন হীন কার্যও করিতে তিনি প্রস্তুত ছিলেন।

সমাধির পরমানন্দ উপলব্ধি করা সত্ত্বেও এই অতীন্দ্রিয়বাদী মানব-প্রেমের আদর্শে উদ্বুদ্ধ হইয়াছিলেন। যাঁহার প্রতি জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্যন্ত তাঁহার ছিল গভীর শ্রদ্ধা সেই দেবী কালীর নিকট তিনি আকুল প্রার্থনা করিয়া বলিতেন, "মা, আমাকে মানুষের সংস্পর্শে থাকতে দিও—আমাকে নীরস যোগী কোরো না।'

যুক্তিহীন নীতিবাদে তিনি বিশ্বাসী ছিলেন না। সগুণ ব্রহ্মরূপে আরোপ করিয়া পরমেশ্বরের আরাধনা করিতে হইবে কিনা এই প্রশ্নের সমাধানে তিনি বলিয়াছিলেন—মানুষ তাহার স্বভাবজাত প্রকৃতি অনুসারে পরমেশ্বরকে সগুণ বা নির্গুণভাবে উপাসনা করিবে।

তিনি সম্পূর্ণ হিন্দু প্রথা অনুসারে বিচার করিয়া বলিতেন—ভগবান স্বয়ংই যেমন করিয়া হউক প্রতিমার মধ্যে উপস্থিত থাকিয়া তাঁহাকে নিবেদিত পূজা --উপাসনা গ্রহণ করেন।

তিনি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, কেশবচন্দ্র সেন এবং দয়ানন্দ সরস্বতীর ন্যায় সকল ধর্ম লইয়া সর্বজনীন ধর্মের প্রশ্ন লইয়া মাথা ঘামাইতেন না। তিনি মনে করিতেন—মানুষ কি বিশ্বাস করে তাহা একেবারেই গৌণ—ঈশ্বরভক্তিই মুখ্য। মানুষ যদি ভগবদ্ প্রেমে আত্মোৎসর্গ করিয়া প্রতিবেশীদিগকে ভালবাসে ও সেবা করে তাহা হইলে মতবাদ নির্বিশেষে প্রত্যেক ধর্মই সত্যধর্মরূপে পরিণত হয়। সুতরাং ধর্মান্তর অর্থহীন। খৃষ্টানগণ খৃষ্টধর্মে, মুসলমানগণ ইসলাম ধর্মে এবং হিন্দুগণ হিন্দুধর্মের মাধ্যমে ঈশ্বরের সঙ্গে মিলনের চেষ্টা করিবে।

শ্রীরামকৃষ্ণের বাণী

শ্রীরামকৃষ্ণের বাণীর বিশেষত্ব ছিল কর্মের মাধ্যমে তাহার প্রকাশ। এই বাণী ছিল হিন্দু ধর্মের বাণী। ঐতিহাসিক উন্নত ধর্ম সমূহের মধ্যে হিন্দু ধর্ম অদ্বিতীয় কারণ ইহা স্বীকার করে যে হিন্দু ধর্ম অথবা অন্য কোন ধর্ম এককভাবে সত্যের প্রতিনিধিত্ব করে না অথবা মুক্তির একমাত্র পথ নহে। হিন্দুমতে প্রত্যেক ধর্মই সত্য এবং সঠিক পথ নির্দেশক। মানব জাতির নিকট ইহাদের প্রয়োজন অপরিহার্য কারণ প্রত্যেক ধর্মই একই সত্যের বিভিন্নরূপ প্রকাশ করে এবং বিভিন্ন পথের মাধ্যমে মানবজাতিকে চরম গন্তব্যস্থলে লইয়া যায়। প্রত্যেকের মধ্যেই নিজস্ব এমন আধ্যাত্মিক বৈশিষ্ট্য আছে যাহা অন্যের মধ্যে নাই।

ইহা জানা ভাল, কিন্তু এই জ্ঞানই যথেষ্ট নহে। ধর্ম কেবলমাত্র অধ্যয়নের বস্তু নহে; ইহাকে উপলব্ধি এবং জীবনে মূর্ত করিতে হইবে। এই ক্ষেত্রেই শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁহার বিশেষত্বের প্রকাশ করেন। তিনি নিজের জীবনে পর্যায়ক্রমে সকলপ্রকার ভারতীয় দর্শন ও ধর্ম এবং এমন কি ইসলাম ও খ্রীষ্টান ধর্মেরও অনুশীলনও করিয়াছেন। তাঁহার ধর্ম সাধনা এবং অভিজ্ঞতা এরূপ ব্যাপক ছিল যে সম্ভবতঃ অন্য কোন ধর্মীয় প্রতিভা ভারতে কিংবা অন্যত্র ইহা অর্জন করিতে সক্ষম হন নাই। ঈশ্বরের মূর্ত প্রতীক জগদম্বার প্রতি তাঁহার ভক্তি তাঁহার নিরাকার ব্রহ্ম জ্ঞান অর্জনের এবং চরম আধ্যাত্মিক সত্তার সহিত চূড়ান্ত মিলনের পথে কোন প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করে নাই।

যে সময়ে এবং যে দেশে শ্রীরামকৃষ্ণ আবির্ভূত হইয়াছিলেন এবং বাণী প্রচার করিয়াছিলেন সেই সময়ে এবং সেই দেশে তাঁহার এবং তাঁহার বাণীর প্রয়োজন ছিল। হিন্দু ধর্মীয় ঐতিহ্যে লালিত-পালিত না হইলে কাহারো পক্ষে হয়ত এইরূপ বাণী-প্রচার সম্ভব হইত না। শ্রীরামকৃষ্ণ ১৮৩৬ সালে বাংলা দেশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার জন্ম হইয়াছিল এমন এক সময়ে, যখন সর্বপ্রথম আক্ষরিক অর্থে পৃথিবী ঐক্য-

বন্ধ হয়। আজও আমরা পৃথিবীর ইতিহাসের যুগ-সন্ধিক্ষণে বাস করিতেছি কিন্তু ইহা স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে মানবজাতি যদি আত্ম-হননের মাধ্যমে নিশ্চিহ্ন হইবার কামনা না করে তাহা হইলে যে অধ্যায়ের সূত্রপাত পাশ্চাত্যে হইয়াছিল ভারতীয় ধারায় তাহার শেষ হইতে হইবে। পাশ্চাত্য প্রযুক্তিবিদ্যার উপর নির্ভরশীল জড়বাদের ভিত্তিতে বর্তমান পৃথিবী ঐক্যবন্ধ হইয়াছে। এই পাশ্চাত্য নৈপুণ্য কেবলমাত্র দূরত্বকেই ধ্বংস করে নাই ইহা জাতিগুলির হাতে তুলিয়া দিয়াছে বিধ্বংসী অস্ত্র এবং এমন এক সময়ে তাহারা পরস্পরের মুখোমুখী হইয়াছে যখন তাহারা পরস্পরকে জানিতে ও ভালবাসিতে শিখে নাই। মানবজাতির ইতিহাসের এই মহাসংকটময় মুহূর্তে ভারতীয় পথই পরিত্রাণের একমাত্র উপায়। সম্রাট অশোক এবং মহাত্মাগান্ধীর অহিংসার আদর্শ এবং শ্রীরামকৃষ্ণ অনুশীলিত সর্ব-ধর্ম সমন্বয়ের মধ্যেই রহিয়াছে সেই দৃষ্টিভঙ্গী ও চেতনা যাহা মানব জাতিকে এক পরিবার ভুক্ত করিয়া গড়িয়া তুলিতে সাহায্য করিতে পারে এবং এই আনবিক যুগে ধ্বংসের বিকল্প ইহাই একমাত্র পথ।

এই আনবিক যুগে সমগ্র মানবজাতির ভারতীয় পথ অনুসরণের পিছনে রহিয়াছে উপযোগবাদী অভিপ্রায়। কোন উপযোগবাদী অভিপ্রায়ই ইহা অপেক্ষা অধিক শক্তিশালী ও আত্ম-মর্যদা সম্পন্ন হইতে পারে না। সমগ্র মানবজাতির অস্তিত্ব আজ বিপন্ন। তথাপি সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী ও আত্মমর্যাদা-সম্পন্ন উপযোগবাদী অভিপ্রায় রামকৃষ্ণ ও গান্ধী এবং অশোকের শিক্ষা গ্রহণ ও কার্যে পরিণত করার তুলনায় নিতান্তই গৌণ। ইহার প্রাথমিক কারণ হইল এই শিক্ষা যথার্থ এবং ইহা যে সঠিক তাহার কারণ ইহার উৎস হইল আধ্যাত্মিক সত্তার প্রকৃতরূপ দর্শন।

রামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দ

রামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দ "নববেদান্তের" রূপকার। পার্থিব নিন্দাবাদ ও মিথ্যা স্তুতিবাদ উপেক্ষা করিয়া নিজেদের উপলব্ধ সত্যকে জীবনে অবলম্বন করার সৎ সাহস তাঁহাদের ছিল। নববেদান্ত কোন ধর্মমত নহে—সকল ধর্মের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গী তাহার উদার—তাহার সঙ্গে নাই পৃথিবীর কোন ধর্মমতের প্রতিদ্বন্দ্বিতা—আন্তর্জাতিক সালিসী বিচারালয়ের মত নববেদান্ত যেন সকল ধর্মের এক সাধারণ মিলন মঞ্চ। ভয় বা অনুগ্রহ উপেক্ষা করিয়া বিবদমান সম্প্রদায়ের ধর্মীয় বিরোধের মীমাংসা করার কার্যে সে যেন বিশেষ উপযুক্ত। প্রত্যেক সম্প্রদায়ের প্রত্যেক দলেরই প্রবৃত্তি হইল 'যুদ্ধং দেহি'ভাবে চীৎকার করা —আমার মতই সত্য—আমার ত্রাণকর্তাই একমাত্র ঈশ্বর। কিন্তু নববেদান্ত তাহার বিশ্বব্যাপী সহানুভূতি লইয়া স্পষ্ট করিয়া নির্দেশ দেয় সেই এক সম্ভাবনাময় দিব্য প্রাণশক্তির প্রতি যাহার অস্তিত্ব প্রচুর পরিমাণে প্রকাশিত হইয়াছে মুসা, মহম্মদ, বুদ্ধ ও যীশুর ন্যায় ঈশ্বর বার্তাবহদের ভিতর। রামকৃষ্ণও ভ্রান্ত পথে পরিচালিত মানবদিগকে অন্ধকার হইতে আলোয় আনার সেই একই উদার উদ্দেশ্য সাধন করিয়াছিলেন। সপ্ত সমুদ্রে চলমান অর্ণবযানের মত বাংলার এই দেব-মানব পিছনে রাখিয়া আসিয়াছেন এক দীর্ঘ ও জ্যোতির্ময় সঞ্চারপথ যাহা চঞ্চল মায়া-তরঙ্গ বা বিশ্বব্যাপী অজ্ঞানতা মুছিয়া ও নিশ্চিহ্ন করিয়া দিতে চেষ্টা করিতেছে। নাস্তিকতা ইহার তত বড় শত্রু নহে যত বড় শত্রু হইল রুগ্ন স্বতন্ত্রবাদ। এই স্বতন্ত্রবাদ বপন করিতেছে এবং চারিদিকে ছড়াইয়া দিতেছে অবিচার, বলপ্রয়োগ এবং অত্যাচারের বিষাক্ত বীজ। জাতিতে জাতিতে বিদ্বেষভাব এবং প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক রণসজ্জায় চতুর্দিক পরিব্যাপ্ত। নববেদান্তপন্থীগণ যে রামকৃষ্ণের মহান নীতির যোগ্য উত্তরাধিকারী তাহা তাঁহাদের দেখাইতে হইবে। তাঁহার উত্তরাধিকারীগণ স্বীয় সংস্কৃতির মাধ্যমে এক শ্রেণীহীন সমাজব্যবস্থার পত্তনকে সমর্থন জানাইতে বাধ্য—

আর বাধ্য ব্যক্তিগত ক্ষুদ্র স্বার্থের স্থানে সর্বসাধারণ গ্রাহ্য সমবেত কর্ম প্রেরণাকে সকলের সম্মুখে তুলিয়া ধরিতে। অর্জিত কার্যের পুরস্কার লইয়া সন্তুষ্ট থাকিলে তাহাদের চলিবে না, এক নূতন সংস্কৃতির সঙ্গে তাহাদের মিলিত হইতে হইবে। এই সংস্কৃতি সম্পূর্ণ সচেতন থাকিবে যে পরবর্তী অপরিহার্য ঐতিহাসিক পদক্ষেপ অনিত্য হইলেও তাহার দ্বারাই ধনতন্ত্র বিলোপ পাইবে এবং বিশ্বসাম্রাজ্যে এক সমাজতন্ত্রবাদ গড়িয়া উঠিবে। স্বামী বিবেকানন্দ প্রথমে তাঁহার এই আশা ন্যস্ত করিয়াছিলেন আমেরিকাকে ভিত্তি করিয়া তবে জীবনের শেষ প্রান্তে রাশিয়াকেই ইহার কেন্দ্র বলিয়া স্থির করেন। শ্রীরামকৃষ্ণ এক সময়ে ইঙ্গিত করিয়াছিলেন তিনি একবিংশতি খৃষ্টাব্দে উত্তর পশ্চিম অঞ্চলে রাশিয়ায় পুনরায় অবতীর্ণ হইবেন।[১] সোবিয়েত পরিকল্পনায় জাতীয়তাবাদ বা আস্তিকতাবাদ নাই, কিন্তু আর্য সমাজের সঙ্গে তাহার কিছু মিল আছে। লেনিন-সৃষ্ট নীতির সঙ্গে দয়ানন্দের মতবাদের কিছু মিল আছে। নববেদান্তের প্রতিষ্ঠাতা বিবেকানন্দ এবং নূতন রাশিয়ার প্রবর্তক লেনিনের ধমণীতে প্রবাহিত ছিল তাতারের মহান রক্ত। মঙ্গোলীয় উত্তরাধিকারের গর্বে গর্বিত বিবেকানন্দ একবার বলিয়াছিলেন— মানবজাতির সুধাসুরা হইল তাতার। ব্যক্তি স্বতন্ত্রবাদ হইল স্থিত জীবন ও শিল্পবাদের ফল; সার্বজনীনতা ইউরাল-আলটায়িক দস্যু, যাযাবর ও শিকারীদিগের চরিত্রের বৈশিষ্ট্য এবং ইহাকে আধ্যাত্মিকতামণ্ডিত করিয়াছে আর্য সংস্কৃতি।

গণতান্ত্রিক দেশসমূহ সোবিয়েত রাশিয়াকে নিরীশ্বরবাদী বলিয়া নিন্দা করে। সোবিয়েত রাশিয়া নিরীশ্বরবাদী ঠিকই, কিন্তু তাহার সঙ্গে তুলনা করা যায় বৌদ্ধধর্মের যাহা বহুঈশ্বরবাদ ও কঠোর এবং অনুদার ধর্মমতকে বর্জন করে। স্বর্গীয় গুটিপোকা মানবতারূপী প্রজাপতিতে পরিবর্তিত হইয়াছে। আত্মার উদ্যানে ইহাই হইল সুন্দরতম পুষ্প।

১। শ্রীরামকৃষ্ণ মাত্র উত্তর পশ্চিম অঞ্চলের কথাই বলেন, কোন দেশবিশেষের নাম উল্লেখ করেন নাই।—সম্পাদক

না আছে মন্দির মম নাই সম্প্রদায়
গৃহ্যকৃত্য উৎসবের নাহি মম দায়।
একমাত্র কাম্য মোর মানব হৃদয়
দিবারাত্র উপাসনা সেথা মম হয়।
মানবহৃদয় মাত্র মম প্রয়োজন
সেখানে পেয়েছি আমি ঈশ্বর দর্শন।
একমাত্র পন্থা মম প্রেম মহাধন
প্রার্থনা পবিত্রতম বন্ধুত্ব বন্ধন॥

বিবেকানন্দ বুর্জোয়াশ্রেণীকে ঘৃণার দৃষ্টিতে দেখিতেন, কিন্তু ভালবাসিতেন শ্রমজীবীদিগকে। বুর্জোয়া শ্রেণী অর্থলিপ্সু ও ভোগবিলাসে মত্ত এবং প্রকৃত উন্নয়নমূলক কার্যের অন্তরায়। ঘৃণ্য দালালগণ নিজেদের শিক্ষিত বলিয়া দাবী করে। কিন্তু কৃষক, মুচী, ঝাড়ুদারদিগের আত্ম-প্রত্যয় এবং কর্মক্ষমতা তাহাদিগের অপেক্ষা অনেক বেশী। হৃদয়হীন প্রভুদের প্রতি কোন অভিযোগ না করিয়া শ্রমজীবীগণ সুদীর্ঘ যুগ ধরিয়া নিঃশব্দে কার্য করিয়া জগতের সম্পদ বৃদ্ধি করিয়া চলিয়াছে। আধুনিক শিক্ষা অবদমিত শ্রেণীকে সম্মুখে তুলিয়া ধরিয়াছে আর প্রকাশ করিয়াছে নগর সভ্যতার হীনমন্যতাকে। অর্থ হইল অচল মূলধন। জাতির সচল সম্পদ হইল কঠিন ব্যক্তিগত শ্রম যাহা শরীর মন ও আত্মা গঠন করে। নব-বেদান্ত গীতার ন্যায় কর্মযোগ শিক্ষা দেয়। শীঘ্রই হউক অথবা সামান্য দেরীতেই হউক, শক্তিমান পরিশ্রমী শ্রমিকেরা সেই অপদার্থ ও সমাজের পরগাছা স্বরূপ দালালদিগের উপর স্থান অবশ্যই করিয়া লইবে। মূলধন তখন আসিয়া পড়িবে শ্রমিকদের হাতে, যে শ্রমিকদের নৈপুণ্যই হইল যোগ: কর্মকৌশলকেই যোগ বলা হয়। এই যোগী হইল বীর, সাহসী এবং মানবাকারে সিংহ। লক্ষ্মী তাহাকেই আশ্রয় করে।

খ্রীষ্টান পত্রিকায় শ্রীরামকৃষ্ণ

The Late Ramakrishna Paramahansha

(The Englishman, Friday, August 20, 1886)

Ramakrishna Bhuttacharji,* better known in the Hindu community as Paramhansha of Dukhinessur, was born on the 10th of Falgoon, 1834, at Sripore Kamar Puker, in the District of Burdwan. His father, Khuderam Bhuttacharji,* was a devout Brahmin, and in all respects a true Hindu. On the young Ramakrishna the qualities of his parents must have exercised more than usual influence. A peculiarly religious temper seems to have taken powerful hold of his mind, and it continued the ruling principle through life. In his twelfth year he came to Calcutta with his eldest brother, Ramessur Bhuttacharji, and lived in Jhamapukur, where the latter founded *Chutooshpaty* or a school for Brahminical learning. Here Paramhansha continued his studies in Sanskrit for some time. Parambansha always deprecated Brahminical learning, which, he said, instead of making a man religious, only secured him an oblation of rice and plantain But though not distinguished for scholarship, Paramhansha had a gift of strong common sense and quick apprehension. He could argue learnedly with the most erudite Pandits of the day, and understand and explain the most abstruse passages of the Sanskrit Scripture. In 1852 the stupendous temples of Dukhinessur were founded by the late Rani Rashmoni. Paramhansha's eldest brother Ramessur Bhuttacharji was appointed priest of the temple of Kali. After his death Paramhansha

* Chatterjee—Editor

succeeded to his office. He did not hold it for a long time, but resigned it for higher devotional exercises. The acquaintance which he here formed with Hindu ascetics of various denominations seems to have caused a considerable diversion in his religious opinions. The teachings of these Jogies had an abiding effect on his whole life. From this time he secluded himself entirely from the world and passed his days in prayer and contemplation in an obscure corner on the riverside of the temple garden. This place, known as *Puncho-butty*, is held in sacred veneration by many of his followers. Here

> "Remote from man, with God he passed his days
> Prayer all his business, all his pleasure praise."

The great doctrine of his religion was the renouncement of *Kamini-Kanchan*, that is, humanities** and wealth. The late Paramhansha was held in the highest respect by all sections of the Hindu community. The educated Hindus appreciated his teachings highly, and among his followers were many graduates and under-graduates of the University. The great Brahmo leader, the late Babu Keshab Chandra Sen, had profound love and respect for him. If faith, love, self-sacrifice, purity of character and entire resignation to the will of the Almighty be the chief qualifications of a religious man, they found their highest perfection in him, and the veneration of the people was not misplaced.

** Women—Editor

পরিশিষ্ট

শ্রীরামকৃষ্ণ ও মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ—সাক্ষাৎকারের বিবরণ*

ব্রাহ্মনেতা দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গেও শ্রীরামকৃষ্ণ সাক্ষাৎ করেন। ঐ সাক্ষাৎকারের বিবরণ হাস্যচ্ছলে একদা শ্রীরামকৃষ্ণ স্বয়ং বর্ণনা করিয়াছিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণকে একদা একব্যক্তি প্রশ্ন করেন—"সংসার ও ঈশ্বরের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করা কি সম্ভব? দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর সম্পর্কে আপনার কি মত?"

শ্রীরামকৃষ্ণ সবিনয়ে বারংবার উচ্চারণ করিলেন—"দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর.... দেবেন্দ্রনাথ...দেবেন্দ্র" এবং কয়েকবার মস্তক নত করিয়া নমস্কার করিলেন। তারপর তিনি বলিলেন—"তুমি জানো তিনি কি ধরনের মানুষ? একজনার বাড়ীতে খুব জাঁকজমক করে দুর্গোৎসব হতো। দিনরাত পাঁঠাবলি হতো। কয়েকবছর পর সে বলির ধুমধাম বন্ধ হ'য়ে গেল। কোন একজন তাঁকে জিজ্ঞেস করলে 'মশাই, বলির ধুমধাম এত কমে গেল কেন?' সে বললে 'আরে এখন যে আমার দাঁত পড়ে গেছে'।" অশ্রদ্ধাবান কাহিনীকার বলিয়া চলিলেন—"দেবেন্দ্রনাথ যে প্রৌঢ় বয়সে ধ্যান-ধারণায় মন দেবেন সে তো স্বাভাবিক।"

রামকৃষ্ণ চুপ করিয়া রহিলেন..."কিন্তু," আরো একবার নমস্কার করিয়া বলিলেন, "তিনি যে একজন মহৎ ব্যক্তি তাতে সন্দেহ নেই।"

অতঃপর তিনি সাক্ষাৎকারের বিবরণ দিলেন**—"প্রথমে আমি যখন তাঁকে দেখি তখন তাঁকে আমার দাম্ভিক বলে মনে হয়েছিল। আর তাই স্বাভাবিক। সংবংশ, সম্মান, সম্পদ এ সব সদ্গুণের ভারে তিনি আচ্ছন্ন...। হঠাৎ আমি নিজের সেই সত্তাকে খুঁজে পেলাম যার প্রভাবে

* Romain Rolland—The Life of Ramakrishna pp. 148—51 দ্রষ্টব্য—সম্পাদক।

** দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে রামকৃষ্ণের পরিচয় করিয়ে দেন তাঁর পৃষ্ঠপোষক মথুরবাবু, যিনি দেবেন্দ্রনাথের সহপাঠী ছিলেন। পরিচয় পর্ব শেষ হ'লে শ্রীরামকৃষ্ণ দেবেন্দ্রনাথকে পোষাক খুলে বুক দেখাতে বলেন। দেবেন্দ্রনাথ

আমি মানুষকে সঠিক বুঝতে পারি। তখন যদি আমি ভগবানের দেখা না পাই তখন সবচেয়ে মহৎ, ধনী ও পণ্ডিত মানুষকেও আমার তৃণ-সম তুচ্ছ মনে হয়। তাই আমি নিজের অজ্ঞানতে হাসলাম···কারণ দেখলাম এই লোকটি একই সঙ্গে পার্থিব জীবন উপভোগ করেছেন এবং ধর্মীয় জীবন ও যাপন করেছেন। তাঁর অনেক সন্তান—সবার অল্পবয়স। তাই তিনি জ্ঞানী হয়েও পার্থিব জগতের সঙ্গে আপস করেছেন। আমি তাঁকে বললাম—'আপনি একালের জনক রাজা। তিনি পার্থিব জগতের সঙ্গে জড়িত থাকা সত্ত্বেও উচ্চতম উপলব্ধির অধিকারী হয়েছিলেন। আপনিও জড়জগতের সঙ্গে যুক্ত অথচ আপনার মন পড়ে আছে ভগবানের সেই ঊর্ধ্বলোক। ভগবান সম্পর্কে আপনি আমায় কিছু শোনান'।"

দেবেন্দ্রনাথ বেদ হইতে কয়েকটি সুন্দর শ্লোক আবৃত্তি করিয়া শ্রীরামকৃষ্ণকে শুনাইলেন এবং উভয়ের মধ্যে আলাপ-আলোচনা ঘনিষ্ঠ ও বিনীতভাবে চলিতেছিল। দেবেন্দ্রনাথ তাঁহার অতিথির চক্ষের দীপ্তি দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছিলেন এবং পরদিন একটি ভোজে তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করিলেন। তবে সেই সঙ্গে তাঁহাকে সবিনয়ে অনুরোধ করিলেন যে তিনি যদি আসিতে চাহেন তবে যেন "তাঁহার দেহটা একটু ঢেকে আসেন"—কারণ শ্রীরামকৃষ্ণ পোষাক-পরিচ্ছদ পরিধানের দিকে বিশেষ দৃষ্টি দেন নাই। রামকৃষ্ণ দুষ্টামি করিয়া জবাব দিলেন, সে প্রতিশ্রুতি দিতে তিনি অপারগ। তিনি যেমন, তেমনভাবেই আছেন এবং ঐভাবে তিনি আসিবেন। এইভাবে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক অটুট রাখিয়াই তাঁহারা পরস্পরের নিকট হইতে বিদায় লইলেন। কিন্তু পরদিনই অতি প্রত্যুষে সেই অভিজাত ব্যক্তির নিকট হইতে একটি শিষ্টাচারপূর্ণ পত্র আসিল তাহাতে তিনি রামকৃষ্ণকে বৃথা কষ্ট করিতে নিষেধ করিলেন। এইভাবেই ব্যাপারটির নিষ্পত্তি ঘটিল।

বিস্ময় প্রকাশ না করে তাঁর কথা রাখলেন। বুকের রং ছিল লাল এবং শ্রীরামকৃষ্ণ তা পরীক্ষা করলেন। বুকের এই স্থায়ী লাল রং কোনো কোনো যোগাভ্যাসের অন্যতম বিশেষ চিহ্ন।—The Life of Ramakrishna p. 150 দ্রষ্টব্য।—সম্পাদক।

কেশবচন্দ্র সেনের উপর রামকৃষ্ণের প্রভাব

রামকৃষ্ণ ও কেশবচন্দ্র সেনের মধ্যে প্রকৃত সম্পর্ক কী ছিল তাহা লইয়া বড় দুঃখজনক ভুল বোঝাবুঝির সৃষ্টি হইয়াছে। শিষ্য বলিতে অনেক কিছু বোঝাইতে পারে, কিন্তু কেশবচন্দ্র সেন কাহাকেও তাহার ন্যায্য সম্মান দিতে কুণ্ঠিত বোধ করিতেন না এবং রামকৃষ্ণ বা অন্য কাহারো নিকট হইতে তিনি যে প্রেরণা, উৎসাহ ও উপদেশ লাভ করিয়াছেন তাঁহাকে গুরু এবং শিক্ষক বলিয়া গ্রহণ করিতে অস্বীকার করার মত মানুষ তিনি ছিলেন না। "সে যেই হোক না কেন", তিনি লিখেছেন, "আমি তার কাছ থেকে শিক্ষা পেতে ইচ্ছুক। আমি যদি একজন সাধারণ চারণ কবিকে দেখি আমার ইচ্ছে হয় তার পায়ের কাছে বসে শিখি। যদি কোন যোগী আমার বাড়ী আসেন, আমি মনে করবো এক লাখ টাকা আমার ঘরে এসেছে। তাঁর মন্ত্রোচ্চারণ শুনে আমি অনেক কিছু শিখবো···যখন কোন সন্ত আমার কাছ থেকে বিদায় নেন আমি স্পষ্ট বুঝতে পারি আমার হৃদয়ে তিনি তাঁর গুণগুলি ঢেলে দিয়ে গেলেন। আমি কিছুটা তাঁর মত হ'য়ে যাই!—আমি আজন্ম শিষ্য।" অপর পক্ষে রামকৃষ্ণের ন্যায় গুরু অথবা আচার্য পদবীকে অন্য কেহ এইরূপ দৃঢ়তার সঙ্গে বর্জন করেন নি। কেশবচন্দ্র সেন, মজুমদার এবং তাঁহার অন্য শিষ্যগণের উপর রামকৃষ্ণের প্রভাব সম্পর্কে আমি যাহা বলিয়াছি সে-সম্পর্কে কেশবচন্দ্র সেনের কোন এক আত্মীয় ভ্রান্ত ধারণার বশবর্তী হইয়া কেশবের অগ্রগণ্যতা প্রতিষ্ঠা করিতে অত্যন্ত উদগ্রীব—মনে হয় দার্শনিক ও ধর্মীয় সত্যের ক্ষেত্রেও যেন অগ্রাধিকার বলিয়া কোন ব্যাপার আছে। "কেশবচন্দ্রই", তাঁহার মতে, "রামকৃষ্ণকে জনসমক্ষে তুলে ধরেন।" ইহা সত্য হইতে পারে, কিন্তু এমন কত জন শিষ্য আছেন যাঁহারা তাঁহাদের গুরুকে জনপ্রিয় করিয়া তুলিতে সক্ষম হইয়াছেন? ইহার পর তিনি সত্য-মিথ্যা নানা অভিযোগ রামকৃষ্ণের বিরুদ্ধে আনিয়াছেন যাহার সঙ্গে কেশব ও রামকৃষ্ণ প্রসঙ্গের কোন

সম্পর্ক নাই। রামকৃষ্ণ নৈতিক দিক হইতে গণিকাদিগের প্রতি যথেষ্ট ঘৃণা প্রদর্শন করেন নাই। এই বক্তব্য, যেমন আমাদের বলা হইয়াছে, যদি সত্য হয় তাহা হইলে বলিতে হয় ধর্মপ্রবর্তকগণের মধ্যে এই বিষয়ে রামকৃষ্ণ একমাত্র ব্যতিক্রম নহেন। পাশ্চাত্য ধারণানুযায়ী মাদকবর্জন নীতিকে শ্রদ্ধা যদি তিনি না করিয়া থাকেন আমি যতদূর জানি তাঁহার বিরুদ্ধে অতিরিক্ত মদ্যপানের অভিযোগ কেহ করেন নাই। এই প্রকৃতির অকারণ ছিদ্রান্বেষণ এবং কলহের মনোবৃত্তি কেশবচন্দ্র সেন ও রামকৃষ্ণের নিকট অতি অরুচিকর বলিয়া মনে হইত। উভয় উভয়ের প্রতি প্রশংসা ও প্রীতির বাক্যই উচ্চারণ করিয়া গিয়াছেন। ইহা অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় যে তাঁহাদের এই পারস্পরিক সম্পর্ককে ঈর্ষার দৃষ্টিতে বিচার করিবার ফলে বিকৃত করা হইয়াছে। আমি জানি ভারতবর্ষে গুরু শিষ্যের মধ্যে একটি বিশেষ এবং সুস্পষ্ট সম্বন্ধ আছে এবং কেন কেশব চন্দ্রের একজন আত্মীয় রামকৃষ্ণকে কেশবের গুরু বলিয়া চিত্রিত করার বিরুদ্ধে আপত্তি করিয়াছেন। কেশবের কোন প্রকৃত গুরু ছিল না এবং রামকৃষ্ণের ন্যায় জন্মসূত্রে তিনি ব্রাহ্মণও ছিলেন না। কিন্তু তিনি যে রামকৃষ্ণের নিকট হইতে শিক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন এই কথা তিনি এবং মজুমদার পুনঃ পুনঃ স্বীকার করিয়াছেন। আমার তরফে এই কথা বলিতে পারি যে কেশবচন্দ্র সেনের স্মৃতি তাঁহার আত্মীয়বর্গের অপেক্ষা আমার নিকট অধিকতর অক্ষুণ্ণ। যখন তাঁহার নিকটতম বন্ধুবর্গ তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন বা তাঁহার বিরুদ্ধাচারণ করিয়াছিলেন আমি তাঁহার পক্ষে দাঁড়াইয়াছিলাম। আমার কথার ভুল ব্যাখ্যার সম্ভাবনা ভারতবর্ষে থাকায় আমি সানন্দে বলিতেছি যে রামকৃষ্ণও গুরুর ন্যায় আচরণ করেন নাই অথবা কেশবও শিষ্যের ন্যায় ব্যবহার করেন নাই। আমি যে বিষয় জানিতে আগ্রহী ছিলাম, যাহার ব্যাখ্যা এখনও পাওয়া যায় নাই, তাহা হইল কেশবচন্দ্রের আধ্যাত্মিক জীবনের ক্রমবিকাশে রামকৃষ্ণের প্রভাব কতদূর কার্যকরী হইয়াছিল। কেশবচন্দ্র সেনের মূল্যায়নে বিশেষ সহায়ক হইবে যদি আমরা অনুধাবন করিতে পারি মজুমদারের উক্তি—"রামকৃষ্ণের সঙ্গ লাভেই ঈশ্বরের মাতৃরূপের

ধারণা তাঁহার মনে সৃষ্টি হইয়াছিল” অথবা পুনরায়—“রামকৃষ্ণের আশ্চর্য উদার দৃষ্টিভঙ্গী কেশবের গুণ অবধারণে সমর্থ মনকে ইংগিত দিয়াছিল তাঁহার ধর্মান্দোলনের কাঠামোকে আরো উদার নীতির উপর প্রতিষ্ঠা করিতে।” জীবনের শেষ প্রান্তে কেশবের কথাবার্তায় যে অতীন্দ্রিয় ও মোহাবিষ্ট ভাব পরিলক্ষিত হইত এবং ঈশ্বরের মাতৃরূপ সম্পর্কে তাঁহার ধারণা রামকৃষ্ণের প্রভাবের ফল কিনা তাহার বিচারের দায়িত্ব আমি অন্যের উপর ছাড়িয়া দিলাম। ‘মিষ্টিক’ ও ‘এক্সট্যাটিক’ শব্দের অর্থ বাংলায় যাহাই হউক না কেন, ইংরাজীতে ইহার অর্থ সেই চেতনাকেই বুঝায় যাহার প্রকাশ ঘটিয়াছে নব-বিধানের অনেক কথায় এবং কেশবের ইউরোপীয় গুণমুগ্ধ ব্যক্তিরা যে বিষয়ে অতি কঠোর এবং অতি বেশী কঠোর সমালোচনা করিয়াছেন। মিষ্টিক শব্দটির অর্থ বাংলায় যতখানি ভয়াবহ ইংরাজীতে ততখানি নহে। সাধারণ মানুষ ‘মিষ্টিক’ শব্দটির সঙ্গে ‘মিস্ট্’ শব্দটির যোগ আছে বলিয়া অনুমান করে। স্বর্গীয়—বি. আর, রাজন আয়ার প্রবুদ্ধ ভারতে (পৃঃ ১২৩) এইরূপ লিখিয়াছেন— “বেদান্তের যদি উদ্দেশ্য হয় মানুষকে খাদ্য বিনা বাঁচাইয়া রাখা, যতদিন খুশী জীবন ধারণ করা অথবা অন্তরে ক্ষীণ প্রাণ স্পন্দন অক্ষুণ্ণ রাখিয়া বাহ্যিক মৃতবৎ হইয়া শবের ন্যায় নিশ্চল হওয়া তাহা হইলে বেদান্তকে অতীন্দ্রিয়বাদ বলিতে হইবে। বেদান্তকে অতীন্দ্রিয়বাদ বলা যাইবে যদি ইহা মানুষকে অলৌকিক কর্মে নিযুক্ত করে যেমন ইচ্ছামত শরীর ত্যাগ করিয়া শূন্যে উড়িয়া বেড়ান, প্রেতের ন্যায় শূন্যে ঘুরিযা বেডান, অন্যের দেহে প্রবেশ এবং প্রেতের ন্যায় ভর করিয়া নানা অপ্রাকৃতিক ক্রিয়া-কলাপ সংগঠন করা। বেদান্ত নিশ্চয়ই অতীন্দ্রিয়বাদ যদি ইহা মানুষকে অপরের অন্তরের চিন্তাধারা পাঠ করিতে সাহায্য করে এবং অনন্তকাল সমাধিস্থ থাকিতে শিক্ষা দান করে যখন সে নিজের এবং অপরের নিকট জীবন্ত অপেক্ষা অধিকতর মৃতবৎ বলিয়া প্রতীয়মান হয়।”

আমি এই উদ্ধৃতি দিয়াছি অংশতঃ মিষ্টিসিজ্‌ম্ শব্দটির ভ্রান্ত প্রয়োগ দেখাইবার জন্য, কারণ এই গুলি জালিয়াতি এবং যাদুবিদ্যা—ইহাকে মিষ্টিসিজম্ বলা সমীচীন নহে এবং অংশতঃ যাহা বেদান্ত নহে এবং

কেশবচন্দ্র সেন ও রামকৃষ্ণের দৃষ্টিতে যাহা কখনোই ছিল না। এই কথাগুলি উল্লেখের কারণ আমার দৃঢ় বিশ্বাস প্রকাশের জন্য যে কেশবের সরল ও মৌলিক শিক্ষার বিষয়ে, যাহার বিভিন্ন উৎস সন্ধানে আমি প্রয়াসী হইয়াছিলাম, তথা-কথিত নব-বিধানের পরবর্তী পর্যায় গুলি অপরিহার্য ছিল না। রামকৃষ্ণের অনুগামীগণের কেহ কেহ যদি আমার এই মন্তব্যগুলিকে মূলধন করিয়া থাকেন তাহা হইলে স্থানীয় ঈর্ষা ও অসাক্ষাতে নিন্দা বলিয়া স্বাচ্ছন্দ্যে উহা উপেক্ষা করা যায়। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মধ্যে প্রকৃত বোঝাপড়া যাহা কেশবের উচ্চতম আদর্শগুলির অন্যতম তাহার প্রসার কখনোই সম্ভব হইবে না কেশবের স্ব-নির্বাচিত সমর্থকগণের শিশু-সুলভ ভ্রান্ত ধারণার মাধ্যমে। যে উৎসাহ লইয়া কেশবের বন্ধু-বান্ধবগণ আবেগপূর্ণ, যদ্যপি, আমি বিশ্বাস করি, সৎ উদ্দেশ্য প্রণোদিত, ওকালতি করিতেছেন, তিনি নিজে কখনোই উহা অনুমোদন করিতেন না।

* Ramakrishna : His Life And Sayings—pp. 49-51—2nd edition, ed. by Nanda Mookerjee.

শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনে গুরুত্বপূর্ণ সালসমূহ

১৮৩৬	১৮ই ফেব্রুয়ারী কামারপুকুরে শ্রীরামকৃষ্ণের জন্ম।
১৮৪৩	শ্রীরামকৃষ্ণের পিতা ক্ষুদিরাম চট্টোপাধ্যায়ের মৃত্যু।
১৮৪৫	শ্রীরামকৃষ্ণের পবিত্র উপনয়ন।
১৮৫০	শ্রীরামকৃষ্ণের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রামকুমার কলিকাতায় চতুষ্পাঠী প্রতিষ্ঠা করেন।
১৮৫৩	২২-এ ডিসেম্বর শ্রীমা সারদা দেবীর জন্ম।
১৮৫৫	রাণী রাসমণি দক্ষিণেশ্বরে কালী মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। প্রথমে বিষ্ণুমন্দিরে ও পরে কালী মন্দিরে শ্রীরামকৃষ্ণকে পুরোহিত পদে নিয়োগ।
১৮৫৬	রামকুমারের মৃত্যু শ্রীরামকৃষ্ণের প্রথম ঈশ্বর উপলব্ধি এবং ভাবোন্মত্ত অবস্থা।
১৮৫৮	শ্রীরামকৃষ্ণের কামারপুকুর গমন।
১৮৫৯	শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে সারদা দেবীর বিবাহ।
১৮৬০	দক্ষিণেশ্বরে প্রত্যাগমন।
১৮৬১	রাণী রাসমণির মৃত্যু। ব্রাহ্মণীর নিকট তন্ত্র অভ্যাস। দ্বিতীয়বার ধর্মোন্মত্ততা।
১৮৬৩	তন্ত্র অভ্যাস সমাপ্ত। শ্রীরামকৃষ্ণের মাতা চন্দ্রাদেবীর সন্তানের সঙ্গে বাস করিবার জন্য দক্ষিণেশ্বরে আগমন।
১৮৬৪	বৈষ্ণব ধর্মচর্চা।
১৮৬৬	ইসলাম ধর্ম অভ্যাস।
১৮৬৭	শ্রীরামকৃষ্ণের পুনরায় কামারপুকুর গমন।
১৮৬৮	শ্রীরামকৃষ্ণের তীর্থযাত্রা।
১৮৭০	রাণী রাসমণির জামাই মথুরবাবুর সঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণের দেশভ্রমণ।

১৮৭১	মথুরবাবুর মৃত্যু।
১৮৭২	সারদা দেবীর প্রথমবার দক্ষিণেশ্বরে আগমন।
১৮৭৩	খ্রীষ্টধর্ম চর্চা।
১৮৭৫	কেশবচন্দ্র সেনের সহিত শ্রীরামকৃষ্ণের প্রথম সাক্ষাৎকার।
১৮৭৬	চন্দ্রাদেবীর মৃত্যু।
১৮৮০	নরেন্দ্রনাথের সহিত সাক্ষাৎ।
১৮৮২	পণ্ডিত বিদ্যাসাগরের নিকট গমন।
১৮৮৪	কেশবচন্দ্রের মৃত্যু।
১৮৮৫	অসুস্থতা ও শ্যামপুকুরে স্থানান্তরিত।
১৮৮৬	শিষ্য সমাবেশ। ১৬ আগস্ট রাত্র ১-০২ মিনিটে মহাপ্রয়াণ।